সফরনামা-১

মিসরে কয়েক দিন

গ্রন্থটি

.... কে

উপহার দিলাম।

উপহারদাতা: ....

তারিখ: ....

স্বত্বাধিকারী

নাম: ....

গ্রাম/মহল্লা: ....

থানা: ....

জেলা: ....

www.maktabatulabrar.com

সতর্কীকরণ

প্রতারণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য
মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন সাহেব–এর সব গ্রন্থ
যাচাই-বাছাই করে ক্রয় করুন।

সফরনামা

মিসরে কয়েকদিন

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
গ্রন্থকার, আহকামে যিন্দেগী, ফাযায়েলে যিন্দেগী,
ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, আহকামে হজ্জ,
ইসলামী মনোবিজ্ঞান ও বয়ান ও খুতবা
প্রভৃতি।

প্রকাশনায়:
ইতিহাস ও ভূগোল প্রকাশন

www.maktabatulabrar.com

সফরনামা: মিসরে কয়েকদিন
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

প্রকাশনায়
ইতিহাস ও ভূগোল প্রকাশন

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আবরার
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
জুন, ২০১৯

মূল্য: ৫৩০

সর্বস্বত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত

MISRE KAYEK DIN
(some days in Egypt)
Written by : Maolana Muhammad Hemayet uddin in bengali
Published by : Itihash o Bhugol Prokashon

সূচিপত্র

ভূমিকা ১০
মিসর-এর পরিচয় ১৩
মিসর নামকরণের হেতু ১৫
'মিসর' নামটি বিভিন্ন ভাষায় যেভাবে উচ্চারণ করা হয় ১৬
মিস্র না মাস্র? ১৬
মিসর না মিশর? ১৬
মিসর-এর কয়েকটি প্রাচীন নাম ১৭
মিসরকে ইজিপ্ট (Egypt) কেন বলা হয়? ১৮
ঐতিহ্যবাহী দেশ হিসেবে মিসর ১৯
মিসর: ফেরআউনের দেশ না কি মূসা ও হারূনের দেশ? ২০
মিসরের অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পের অবদান ২১
মিসর গমন ২১
নতুন ও পুরাতন কায়রো সমাচার ২২
মিসরীয়দের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য ২৩
উসামা আব্দুল আজীম দামাত বারাকাতুহুম-এর সাক্ষাতে ২৫
কুরআন তেলাওয়াতে মিসরীয়দের বৈশিষ্ট্য ২৬
মৃতের উদ্দেশ্যে কুরআন তেলাওয়াতের অদ্ভুত মজলিস ২৭
মৃতের জন্য কাঁদুনে নারীদের জড় হওয়ার প্রাচীন রীতি ২৮
কারাফা ও ফুছতাত এলাকাদ্বয়ের পরিচিতি ২৯
কারাফা: মৃতের নগরী ৩১
ফুছতাত ৩৫

কায়রোতে যা কিছু দেখা হল

মসজিদুল ইমাম আল-শাফিয়ী গমন ৩৭
ইমাম শাফিয়ী ও শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারীর কবর যিয়ারত ৩৮
ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৩৯
শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া আল-আনসারী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৪৩
ইবনে হাজার আল-আসকালানির কবর যিয়ারত ৪৬
ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪৮
মসজিদুল ইমাম আল-লাইছ এবং ইমাম লাইছ-এর কবর যিয়ারত ৫২
হযরত লাইছ ইবনে সা'দ (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৫৪
জামেয়ে আম্‌র ইবনুল আস (جامع عمرو بن العاص) গমন ৫৫

জাবালুল মুকাত্তাম (جبل المقطم) দর্শন ৫৭
কায়রোতে সুবহে সাদেকের পূর্বেই ফজরের আযান ৫৮
সালাহ উদ্দীন আইয়ুবির দূর্গ দর্শন ৫৯
একটি ফালতু মজার ব্যাপার ৬০
সাইয়্যেদা আয়েশা মসজিদে গমন ৬২
মিসরের ঐতিহ্যবাহী খাবার 'মুখ্ কিব্দা' ৬৩
জাদুঘর ও ফেরআউনদের মমি দর্শন ৬৪
হযরত মূসা (আ.)-এর ফেরআউন কে ছিল? ৬৬
ফেরআউন কে ছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ ৫টি মত ৬৬
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কয়েকটি কুরআনী উপাত্ত ৬৮
পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা ৭২
হযরত মূসা (আ.)-এর ফেরআউন র‍্যামেসিস-২ এই মত প্রাধান্য পাওয়ার কারণসমূহ ৭৩
নীল নদ দর্শন ৭৬
নীল নদের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার উৎস সম্বন্ধে কিছু কথা ৭৭
নীল নদ পরিচ্ছন্ন রাখার সযত্ন প্রয়াস ৮০
কায়রো টাওয়ার দর্শন ৮০
জামেয়া আযহারের মসজিদ ও জামেয়া আযহার দর্শন ৮২
মাদ্রাসাতুল আইনী ও আল্লামা আইনীর যিয়ারত ৮৮
আল্লামা আইনী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৯০
আল্লামা আহমদ কাসতাল্লানী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৯২
কিতাবের মার্কেট দর্শন ৯৩
মসজিদে হুসাইনে গমন ৯৫
মানশিয়াতুল বাক্কারিতে বয়ানের প্রোগ্রাম ৯৬
ড. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আবূ মূসা-এর বয়ান শ্রবণ ৯৮
মানইয়াল আর-রওযায় গমন ৯৮
ব্যবিলন দূর্গ দর্শন ১০২
হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.)-এর কবর যেয়ারত ১০৪
হযরত উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১০৫
মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া ও রাবেয়া আল-আদাবিয়ার তথাকথিত কবর ১০৫
মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া ও তার কবর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা ১০৬
রাবেয়া বসরিয়া ও তার কবর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা ১০৮

www.maktabatulabrar.com

হযরত ওকী ইবনুল জাররাহ (রহ.)-এর কবর যেয়ারত ১১০
ওকী ইবনুল জাররাহ (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১১২
ইমাম ত্বহাবীর কবর যেয়ারত ১১৩
ইমাম ত্বহাবী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১১৬
জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)-এর কবর যেয়ারত ১১৮
হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১১৯
জামেয়া আযহারের ছাত্রদের উদ্দেশে বয়ান ও একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ১২৩
ইবনুল হুমামের কবরে ১২৪
ইবনুল হুমাম (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১২৬

কায়রোতে আরও যা কিছু দেখার রয়েছে

- মসজিদুল হাকিম বি আমরিল্লাহ ১২৭
- মসজিদে ইবনে তূলূন ১২৮
- মসজিদ ও মাদরাসাতুস সুলতান আন-নাসের হাসান ১২৯
- সাক্কারাহ-এর পিরামিড ১৩০
- বাব যুবেইলাহ (باب زويلة/Bab Zuweila) ১৩০
- আল-ক্বারইয়াতুল ফিরআউনিয়্যাহ ১৩১
- মাতহাফু উম্মে কুলছুম ও মাতহাফুল কিবৃতী ১৩২
- হাদীকাতুল আযহার ১৩৩
- আল-হাদীকাতুদ দুওয়ালিয়্যা ১৩৩
- হাদীকাতু হাইওয়ানাতিল জীযা ১৩৪

গীযা এলাকায় যা কিছু দেখা হল

গীযা এলাকা ও পিরামিড ১৩৪
আবুল হাওল-এর ভাস্কর্য ১৩৫
আবুল হাওলের নাক ভাঙ্গা নিয়ে যত কথা ১৩৬
পিরামিড দর্শন ১৩৭
পিরামিড কি ও কেন ১৩৮
গীযার পিরামিডসমূহের বর্ণনা ১৪০

আলেকজান্দ্রিয়ায় যা কিছু দেখা হল

আলেক্জান্দ্রিয়া শহরের পরিচয় ১৪৩
আলেক্জান্দ্রিয়ার বাতিঘর ও কায়তবাই-এর দূর্গ ১৪৪
আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ১৪৭
আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন গ্রন্থাগার ১৪৭

www.maktabatulabrar.com

আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার ধ্বংস নিয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যাচার ১৪৯
আলেকজান্দ্রিয়ার বর্তমান গ্রন্থাগার ‘বিবলিওথেকা আলেকজান্দ্রিনা’ ১৫৪
কথিত দানিয়াল নবীর মসজিদ ও দানিয়াল নবীর কবর ১৫৬
হযরত দানিয়াল (আ.) ও তাঁর প্রকৃত কবর ১৫৭
হযরত লুকমান হাকীম ও তার প্রকৃত কবর প্রসঙ্গ ১৬০
কথিত হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর কবর ১৬১
হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৬২
মসজিদে আবুল আব্বাস আল-মুরসী গমন ১৬২
আবুল আব্বাস আল-মুরসী-র সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৬৩
বূসীরী-র মাজারে গমন ১৬৪
হযরত হুসাইন রা.-এর পুত্র যাইনুল আবেদীনের আওলাদের কয়েকটি কবর ১৬৬
ভূমধ্যসাগরের পাড়ে কিছুক্ষণ ১৬৬

আলেকজান্দ্রিয়ার আরও কিছু যা অনেকে দেখে থাকেন

- গ্রেইকো-রোমান মিউজিয়াম (Graeco roman museum) ১৬৭
- আমূদুস সিওয়ারী ১৬৮
- কূমুশ-শূকাফা-র কবরস্থান ১৬৯
- আলেকজান্দ্রিয়া জাতীয় জাদুঘর (Alexandria Natoinal Meuseum) ১৬৯
- মাত্হাফু কাফাফীস (متحف كفافيس/ Cavafy Museum) ১৭০
- রা’সুত্ তীন রাজ প্রাসাদ (قصر رأس التين/Ras el Tin Palace) ১৭০
- আলেকজান্দ্রিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রাচীন ইমারত ও ধ্বংসাবশেষ। ১৭১

আল-ফাইয়ূমে যা কিছু দেখা হল

বুহায়রা কারূন দর্শন ১৭১
কসরে কারূন দর্শন ১৭৩
ক্বারইয়াতু ইউসুফ প্রসঙ্গ ১৭৬
হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরের কোথায় বাস করতেন? ১৭৬

সিনাই এলাকায় যা কিছু দেখা হল

তূরে সাইনা গমন ১৭৮
মাজমাউল বাহরাইন ১৮০
সুয়েজ উপসাগর দর্শন ১৮৩
হযরত মূসা আ. ও বনী ইসরাঈলের সমুদ্র পার হওয়ার স্থান ১৮৩

দাহাব শহরের গিমি হোটেলে গমন ১৮৬
আকাবা উপসাগর দর্শন ১৮৭
তূর পর্বত ও সেন্ট ক্যাথরিন ১৮৮
তূর পাহাড় সম্বন্ধে দু'টো ভ্রান্তির অপনোদন ১৯০
সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারি, পবিত্র তুওয়া উপত্যকা ও উল্লিকা বৃক্ষ ১৯০
তূর পর্বতে আরোহণের প্রস্তুতি ১৯৪
তূর পর্বতে আরোহণ ১৯৫
তূর পর্বত থেকে সূর্য উদয়ের দৃশ্য অবলোকন ১৯৬
তূর পর্বত থেকে অবতরণ ও দু'জন ইয়াহুদীর সাক্ষাত ১৯৭
হযরত হারূন আলাইহিস সালাম-এর কবর যিয়ারত ১৯৮
হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের কবর যিয়ারত ১৯৯
সিনাই এলাকায় যায়তূনের বাগান ২০০
উয়ূনে মূসা ও বনী ইসরাঈলের সেই ১২টি ঝর্ণা ২০২

লুকসুরে যা কিছু দেখার রয়েছে

- মা'বাদুল কারনাক (معبد الكرنك/Karnak Temple Complex) ২০৭
- ওয়াদিল মুলূক (وادي الملوك/Valley of the Kings) ২০৮
- ওয়াদিল মালিকাত (وادي الملكات/ Valley of the Queens) ২০৮
- মা'বাদু হাবূ (معبد هابو/Medinet Habu) ২০৯
- মা'বাদু হাত্‌শেপ্‌সুত (معبد حتشبسوت/Temple of Hatshepsut) ২১০
- মা'বাদুল উকসুর (معبد الأقصر/Luxor Temple) ২১০
- মাত্‌হাফুল উকসুর (متحف الأقصر/ Luxor Museum) ২১১

আসওয়ানে যা কিছু দেখার রয়েছে

- মাতহাফুন্‌ নূবা (متحف النوبة/Nubian Museum) ২১১
- জাযীরাতু ইলেফ্যান্টিন (جزيرة الفنتين/Elephantine Island) ও মা'বাদুল আসওয়ান ২১২
- মাতহাফু আসওয়ান (متحف أسوان/ Aswan Museum) ২১৩
- দরীহুল আগাখান (ضريح الآغاخان/Mausoleum of Aga Khan) ২১৩
- মসজিদুত্‌ ত্বাবিয়া (مسجد الطابية/El Tabia Mosque) ২১৪
- মা'বাদু কোম ওমবু (معبد كوم امبو/Temple of Kom Ombo) ২১৪
- হযরত ইউসুফ (আ.)-এর খাদ্যগুদাম ২১৫

দেশে প্রত্যাবর্তন ২১৫
এ গ্রন্থে যতগুলো জায়গার নাম উল্লেখিত হয়েছে তার তালিকা ২১৫

সূচি সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد :

কুরআন-হাদীছে পৃথিবী ভ্রমণ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। পৃথিবী ভ্রমণ করে বিভিন্ন জাতির কী পরিণাম হয়েছে, কীভাবে এক জাতির প্রস্থান আরেক জাতির আগমন ঘটেছে, কীভাবে বিভিন্ন জাতিকে তাদের পাপাচারের কারণে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, তার নির্দশনাদি কোথায় কীভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের কী রহস্য স্বচক্ষে সেসব অবলোকন করে শিক্ষা অর্জন করার জন্যই মূলত পৃথিবী ভ্রমণের উৎসাহ প্রদান। এই ভ্রমণ হল দ্বীনী তা'লীমী সফর। অতএব ভ্রমণ তথা দ্বীনী তালীমী সফরের উদ্দেশ্য হওয়া চাই শিক্ষা অর্জন করা, বিনোদন নয়। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.

অর্থাৎ, তুমি বল, তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ করে দেখ মিথ্যাচারীদের পরিণাম কী হয়েছে। (সূরা আনআম: ১১)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ.

অর্থাৎ, তুমি বল, তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ করে দেখ কীভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন তারপর আবার পুনরুত্থান ঘটাবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যাকে চান শাস্তি দেন আর যাকে চান রহম করেন। আর তারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। (সূরা আনকাবূত: ২০-২১)

ভ্রমণ করা দ্বারা যেমন শিক্ষা অর্জন হয় তেমনি সরেজমিন প্রত্যক্ষণ দ্বারা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক জ্ঞান সমৃদ্ধ ও প্রস্ফুটিত হয়। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যাবলির অস্পষ্টতা কেটে যায়, সে ব্যাপারে মন বিকশিত হয়।

ভ্রমণের বিকল্প হচ্ছে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করা। যেমন বুযুর্গানে দ্বীনের সুহবতের বিকল্প হচ্ছে তাদের বাণী পাঠ করা, তাদের মজলিসের বৃত্তান্ত পাঠ করা। যারা কোন একজন বুযুর্গের সুহবতের কিছুটা হলেও স্বাদ গ্রহণ করতে চান, অথচ সেই বুযুর্গের সুহবত গ্রহণ সম্ভব নয়, তাদের জন্য বিকল্প হচ্ছে সেই বুযুর্গের বাণী ও মজলিস-বৃত্তান্ত পাঠ করা। তদ্রূপ ভ্রমণের বিকল্প হচ্ছে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করা। যারা ভ্রমণ করার সুযোগ করে উঠতে পারেন না, ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করা দ্বারাও তাদের ভ্রমণের ফায়দা কিছুটা হলেও লাভ হয়। এজন্যই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখার প্রয়াস নেয়া হয়। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করে ভূগোল

শাস্ত্রের জ্ঞানও সমৃদ্ধ হয়। একটা উপযুক্ত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ যুগপৎ একটা ইতিহাস গ্রন্থ ও ভূগোল গ্রন্থ পাঠ। তবে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অবশ্যই এমন হওয়া চাই যেন তা পাঠ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সবদিক পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এমনভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া চাই যেন পাঠক তা পাঠকালে স্বচক্ষে সবকিছু প্রত্যক্ষ করছে– এমন উপলব্ধিতে মণ্ডিত হতে পারে।

পাঠকদের ফায়দার প্রতি লক্ষ রেখে এই সফরনামায় বিশেষ কয়েকটি রীতি অবলম্বিত হয়েছে এবং বিশেষ কিছু বিষয় সংযোজিত হয়েছে। সেগুলো হল–

১. গ্রন্থের শুরুতে মিসর সম্বন্ধে যত ধরনের বিষয় জানার ঔৎসুক্য থাকতে পারে সেগুলো লিখে দেয়া হয়েছে। যেমন: মিসরের ভৌগোলিক অবস্থান, মিসর নামকরণের হেতু, মিসরের প্রাচীন নামসমূহ, মিসর নামটি বিভিন্ন দেশে কীভাবে উচ্চারিত হয়, মিসরকে ইজিপ্ট কেন বলা হয়, মিসরের ভাষা কেমন, মিসরের শাসন ব্যবস্থা কী ইত্যাদি।

২. প্রত্যেকটি জায়গার নাম বাংলায় লেখার পাশাপাশি আরবি ও ইংরেজিতেও লিখে দেয়া হয়েছে, যাতে বাংলা, আরবি ও ইংরেজিতে নামগুলোর উচ্চারণে কোন পার্থক্য থাকলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৩. কায়রোর দেখা বিষয়গুলো সব একসাথে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও তা একসাথে দেখা হয়নি, বরং ফাঁকে ফাঁকে অন্য জায়গার বিষয়াদিও দেখা হয়েছে। এরূপ করা হয়েছে এজন্য, যাতে কেউ এই সফরনামা দেখে কায়রো সফর করতে চাইলে কায়রোর সবকিছুর বর্ণনা পাশাপাশি থাকায় সুবিধা হয়।

৪. কায়রো, এমনিভাবে আলেকজান্দ্রিয়া এবং গোটা মিসরের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিশেষ যে বিষয়গুলো আমার দেখা হয়ে ওঠেনি, সেগুলোর কিছু বর্ণনাও সংক্ষিপ্তভাবে দিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে পাঠকগণ জানতেও পারেন, সাথে সাথে এই বর্ণনা দেখে সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোর দর্শনীয় বিষয়গুলোর তালিকাও তাদের সামনে এসে যায়। আবার মিসর ভ্রমণেও এটা উপকারে আসতে পারবে।

৫. ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির খুব বেশি বর্ণনা পরিহার করা হয়েছে, যাতে পাঠকদের বিরক্তি বোধ না হয়। তবে মাঝেমধ্যে একটু আধটু আবেগ-অনুভূতির বর্ণনা দিতেই হয়েছে, নইলে তো সফরনামাই হয় না, হয়ে যায় রসকষহীন তথ্যনামা। নিরেট ইতিহাস ভূগোলের বই আর সফরনামার পার্থক্য তো এখানেই যে, সফরনামাতে ইতিহাস ভূগোলের তথ্যাবলির সাথে কিছু এদিক সেদিকের কথা, কিছু আবেগ-অনুভূতি, কিছু রসকষ ইত্যাদিও থাকে যা নিরেট ইতিহাস ভূগোলের বইতে থাকে না।

৬. আলোচনা বুঝার সুবিধার জন্য বিশেষ বিশেষ স্থানে টীকা সংযোজন করা হয়েছে। টীকার কথাগুলো মূল টেক্সটে আনা হয়নি, কেননা তাতে বর্ণনার সাবলীলতা নষ্ট হতে পারত।

৭. আলোচনা বুঝার সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় মানচিত্র সংযোজন করা হয়েছে।

৮. প্রত্যেকটি দর্শনীয় বিষয়ের ছবি সংযোজন করে দেয়া হয়েছে, যাতে তা মনে অংকিত হয়ে থাকতে পারে।

৯. গ্রন্থটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন শুধু সফরের কাহিনীতে নয় বরং ভৌগোলিক জ্ঞানের সহায়ক গ্রন্থতে রূপ নেয়।

১০. গ্রন্থে যতগুলো জায়গার নাম উল্লেখিত হয়েছে গ্রন্থের শেষে একসঙ্গে সেগুলোর তালিকা কোন্ নামের বর্ণনা কোন্ পৃষ্ঠায় রয়েছে তার উল্লেখসহ পেশ করা হয়েছে, যাতে ভূগোল শাস্ত্রে আগ্রহী পাঠকগণ বারবার তা দেখে ভৌগোলিক ধারণাকে আত্মস্থ ও সমৃদ্ধ করে নিতে পারেন। বস্তুত ভৌগোলিক ধারণাকে সমৃদ্ধ করাই কোন সফরনামা পাঠের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

আল্লাহ আআলা আমাদের সবকিছু কবূল করুন, আমাদের সব প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। আমীন!

বিনীত
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
১০-৬-২০১৯

www.maktabatulabrar.com

মিসরের মানচিত্র

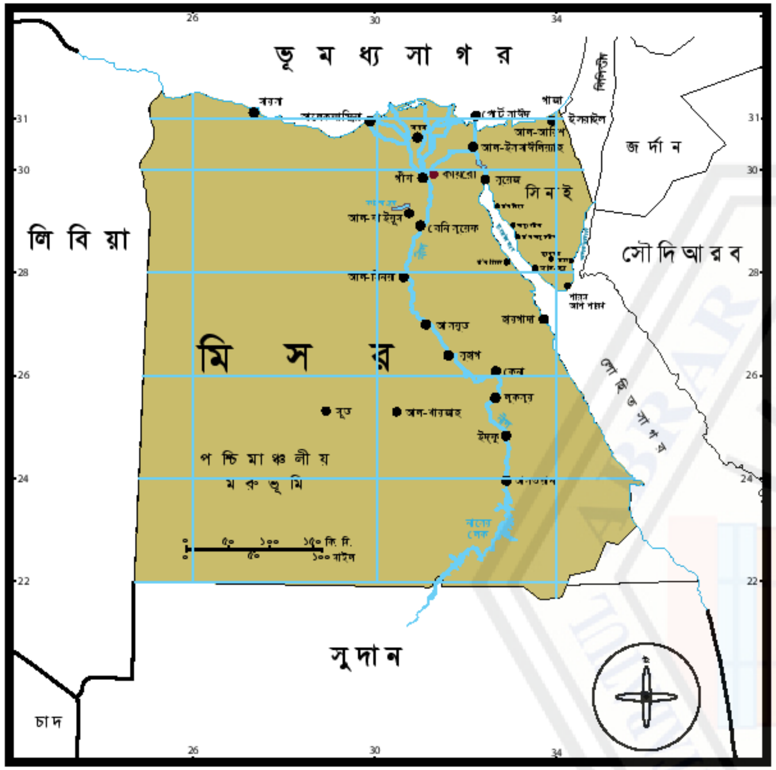

মিসর-এর পরিচয়

মিসর (□□□) আফিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্বের একটি রাষ্ট্র। এটি উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার একটি প্রাচীন রাষ্ট্র। মিসরকে ইংরেজি ভাষায় বলা হয় Egypt (ইজিপ্ট)। এর উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে সুদান, পূর্বে লোহিত সাগর এবং পশ্চিমে লিবিয়া। মিসর নামের মিসরীয় কথ্য উচ্চারণ হচ্ছে মাস্‌র। সরকারী নাম 'মিসর আরব প্রজাতন্ত্র' (جمهورية مصر العربية/the Arab Republic of Egypt)। দেশটির আয়তন ১,০১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা (২০১৯ সালে) প্রায় ১০ কোটি। তার মধ্যে ৯৫% মুসলমান, ৫% খ্রিস্টান এবং হাতে গোণা কিছু ইয়াহুদী, বাহায়ী ও শিআ। রাজধানী কায়রো (CAIRO)। আরবিতে বলা হয় ক্বাহেরা (قاهرة)। কায়রো দেশের রাজধানী হওয়ার সাথে সাথে দেশটির বৃহত্তম শহরও বটে।

www.maktabatulabrar.com

কায়রোর মানচিত্র (আংশিক)

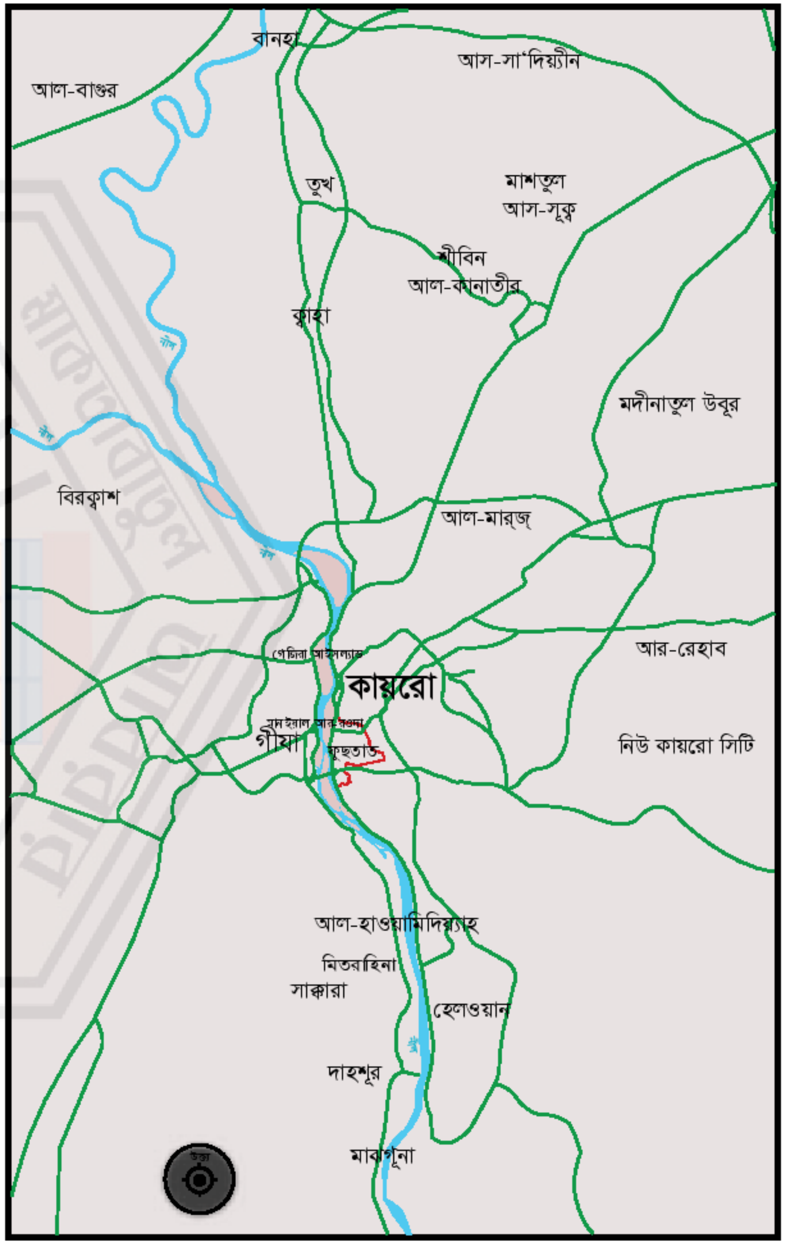

মিসরের সরকারি ভাষা আরবি। মিসরের জনগণের অধিকাংশই আরবি ভাষায় কথা বলে। তবে তাদের আরবি ভাষায় বেশ কিছু স্থানীয় কথ্য উপভাষা প্রচলিত আছে। তাছাড়া মিসরীয়দের আরবি উচ্চারণের স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্টও রয়েছে যে সম্বন্ধে পরে 'মিসরীয়দের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য' শিরোনামে আলোচনা আসছে। মিসরে জিপসি দোমারি ভাষা, আর্মেনীয় ভাষা, গ্রীক ভাষা এবং নীল নুবীয় ভাষারও কিছু প্রচলন রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পর্যটন শিল্পে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয়।

মিসরের অধিকাংশ এলাকা মরুময়। নীল নদ দেশটিকে দু'টি অসমান অংশে ভাগ করেছে। নীল নদের উপত্যকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলেই মিসরের বেশির ভাগ মানুষ বাস করে।

৬৪১ সালে আরব মুসলিমরা মিসরে আগমন করলে মিসরের মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তখন থেকেই মিসর মুসলিম ও আরব বিশ্বের একটি অংশ। আধুনিক মিসরের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মাদ আলী। দেশটি যখন উসমানীয় সাম্রাজ্যের একটি অংশ ছিল, তখন ১৮০৫ থেকে ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি দেশটির বড় লাট ছিলেন। ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ সেনারা মিসর দখল করে। এরপর প্রায় ৪০ বছর মিসর ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। ১৯২২ সালে দেশটি স্বাধীনতা অর্জন করলেও ব্রিটিশ সেনারা থেকে যায়। দেশটিতে রাজতান্ত্রিক ক্ষমতা চলতে থাকে। ১৯৫২ সালে জামাল আব্দেল নাসের-এর নেতৃত্বে একদল সামরিক অফিসার রাজতন্ত্র উৎখাত করে এবং একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে মিসর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জামাল আব্দেল নাসের ১৯৫৬ সালের মধ্যে মিসর থেকে সমস্ত ব্রিটিশ সেনাকে সরিয়ে দেন। ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রপতি আনোয়ার আস-সাদাতের নেতৃত্বে মিসর প্রথম জাতি হিসেবে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের সাথে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২০০৫ সালে দেশটিতে প্রথম বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

মিসর নামকরণের হেতু

মিসর (□□□) কে মিসর কেন বলা হয় এ নিয়ে অনেক কথা, অনেক উক্তি। মোটামুটি প্রসিদ্ধ উক্তিগুলো হচ্ছে:

১. নামটি مَصَرَ الناقة مَصْرًا (অর্থ তিন আঙ্গুলের অগ্রভাগ বা শুধু বৃদ্ধা ও তর্জনী দ্বারা উস্ট্রীর দুধ দোহন করা) থেকে উদ্ভূত।

২. নামটি تَمَصَّرَ (অর্থ অনুসন্ধান করা, ওলানে রয়ে যাওয়া অবশিষ্ট দুধ দোহন করা) থেকে উদ্ভূত।

www.maktabatulabrar.com

৩. নামটি মিসর ইবনে বাইসার ইবনে হাম ইবনে নূহ আ. (مصر بن بيصر بن حام بن نو عليه السلام)-এর দিকে সম্পৃক্ত। কেননা তিনিই এ শহরটি গড়ে তোলেন। কেউ কেউ মিসর ইবনে বাইসার-এর নাম বলেছেন, মিসরাইম (مصرايم/Misraim) ইবনে বাইসার। মিসরীয়রাই 'মিসরাইম'-এর উচ্চারণ করেছে মিসর।

'মিসর' নামটি বিভিন্ন ভাষায় যেভাবে উচ্চারণ করা হয়

মিসরকে আরামাইক (الآرامية/Aramaic) ভাষায় বলা হয় 'মিসরীন' (مصرين), হিব্রু (العبرية/Hebrew) ভাষায় 'মিসরাইম' (□□□□□□□), ফয়নিকিয়ান (الفينيقية/Phoenician) ভাষায় 'মিসুর' (مصور), প্রাচীন আরবি ভাষায় 'মিসরু' (مصرو), আক্কাদিয়ান (الأكّدية/Akkadian) ভাষায় 'মিসরী' (مصري) এবং আসিরিয়ান (الأشورية/Assyrian) ভাষায় 'মিশির' (مشر)।

মিস্‌র না মাস্‌র?

মিসরীয়রা মিসরকে বলে মাস্‌র। পূর্বের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, مِصر শব্দটি যদি ক্রিয়া (فعل) হয়ে থাকে তাহলে হবে মাসারা (مَصَرَ), (এরূপ উচ্চারণ কেউ করে না।) আর ক্রিয়ামূল (مصدر) হয়ে থাকলে হবে মাস্‌র (مَصْر)। আর মিসর ইবনে বাইসার-এর দিকে সম্পৃক্ত হয়ে থাকলে হবে মিস্‌র। তাহলে দেখা গেল একমাত্র শব্দটিকে ক্রিয়ামূল ধরলেই মাস্‌র উচ্চারণ হতে পারে। যেহেতু এই সিদ্ধান্ত প্রদান করা কঠিন যে, এটি ক্রিয়ামূল, তাই মাস্‌র উচ্চারণ নিশ্চিতভাবে সঠিক তা বলা যাবে না। তবে কুরআনে কারীমে যেহেত শব্দটি মিসর (مِصر) উল্লেখিত হয়েছে অর্থাৎ, মীমে যবর নয় বরং যের সহকারে, তাই মিসর উচ্চারণ করাই নিশ্চিতভাবে সঠিক। মাস্‌র উচ্চারণ মিসরীয়দের লোক-প্রচলন (عرف)য়ে অনুমোদিত হলেও একদিকে সেটা সঠিক কি না তা অনিশ্চিত, তদুপরি কুরআনের ব্যবহার-বিরোধী। অতএব সে উচ্চারণ অনুত্তম নিঃসন্দেহে।

মিসর না মিশর?

مصر শব্দটিকে প্রতিবর্ণায়ন করে বাংলায় 'মিসর' লেখা হবে না কি 'মিশর'? অর্থাৎ, দন্ত-স যোগে লেখা হবে না কি তালব্য-শ যোগে? বিভিন্ন মানচিত্র ও বইয়ে দেখা যায় কেউ লেখেন মিসর, কেউ লেখেন মিশর। কোনটি সঠিক? বস্তুত মূল আরবি শব্দটিতে রয়েছে সোয়াদ (ص), আর সোয়াদ-এর প্রতিবর্ণায়ন হয় দন্ত-স দ্বারা। অতএব 'মিস্‌র'ই সঠিক, 'মিশর' সঠিক নয়। সোয়াদ বর্ণযুক্ত যত আরবি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয় তার সবগু-

লাতে প্রতিবর্ণায়ন দন্ত-স দ্বারাই হয়ে থাকে, মাত্র দুই একটা শব্দ আছে যেখানে কেউ দন্ত-স লেখেন কেউ 'ছ' লেখেন, কিন্তু কেউই কোনো শব্দে সোয়াদ-এর প্রতিবর্ণায়ন তালব্য-শ দ্বারা করেন না। নিচের শব্দগুলোতে সোয়াদ-এর প্রতিবর্ণায়ন কীভাবে হয়েছে লক্ষ করুন।

শব্দের আরবি রূপ	শব্দের বাংলা রূপ
صلاة	সালাত
صيام	সিয়াম
صحيح	সহীহ
صالح	সালেহ
صديق	সিদ্দীক
صادق	সাদেক
صاحب	সাহেব
صابون	সাবান
صالون	সেলুন
صبر	সবর/ছবর
صوفي	সুফি/ছুফি
صورة	সুরত/ছুরত

উপরের তালিকায় দেখা গেল সোয়াদ বর্ণযুক্ত অধিকাংশ শব্দে সোয়াদ-এর প্রতিবর্ণায়ন হয়েছে দন্ত-স দ্বারা, অল্প সংখ্যক শব্দে যুগপৎ দন্ত-স ও ছ দ্বারা। এগুলোর কোনটিতেই কেউ সোয়াদ-এর প্রতিবর্ণায়ন তালব্য-শ দ্বারা করে না। অতএব মিশর নয় বরং আমাদের লেখা উচিত মিসর।

মিসর-এর কয়েকটি প্রাচীন নাম

বিভিন্ন যুগে মিসরের বিভিন্ন নাম ছিল। যেমন:

১. কেমিত: ফেরআউনী যুগে দেশটির একটি নাম ছিল 'কেমিত' (كيميت) বা কালো মাটির দেশ। নীল নদের বন্যার সাথে বয়ে আসা উর্বর কালো মাটি থেকেই এমন নামের উৎপত্তি হয়েছিল। নামের মধ্যে ইংগিত রাখা হয়েছে যে, মিসরীয়গণ কালো ভূমির মানুষ।

২. মিলামবুদিস: মিলামবুদিস (ميلامبوديس) অর্থ কালো ভূমি। কালো মাটি মিসরের বৈশিষ্ট্য ছিল বিধায় গ্রীকরা মিসরকে এই নাম দিয়েছিল।

৩. মিতযারাইম: তাওরাতের বর্ণনায় মিসরের নাম পাওয়া যায় মিতযারাইম (متزرايم)।

www.maktabatulabrar.com

৪. আল-আরদাইন: আল-আরদাইন (الأرضين) অর্থ দুই ভূ-খণ্ড। মিসরের দক্ষিণাঞ্চল উঁচু এবং উত্তরাংশ নিচু বিধায় মিসর দেশ দুই খণ্ডে বিভক্ত। এ হিসেবে তাকে আল-আরদাইন তথা দুই ভূ-খণ্ড আখ্যা দেয়া হয়েছিল।

৫. বাংকাইন: ইংরেজিতে বাংক অর্থ নদীর তীর। মিসরে নীল নদের পশ্চিম তীরকে বলা হত মৃতের শহর। কেননা পশ্চিম তীরে মৃতদেরকে কবর দেয়া হত। আর পূর্ব তীরে জীবিতরা বসবাস করত। এই দুই তীরের ভিত্তিতে বলা হত 'বাংকাইন'।

৬. ইজিপতুস: খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে নাম হয় ইজিপতুস।

৭. হাদইয়াতুন্ নীল: হাদইয়াতুন্ নীল (هدية النيل) কথাটি আরবি। এর অর্থ নীল নদের দান। এই নামকরণের হেতু হল নীল নদের অবদানেই তার দুই তীরে মিসরীয় সভ্যতা তথা মিসর গড়ে উঠেছে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (Herodotus) এই নামকরণ করেন।

৮. হিত কা বাতাহ: এই নামের ব্যাখ্যা পরবর্তী পরিচ্ছেদে প্রদান করা হয়েছে।

মিসরকে ইজিপ্ট (Egypt) কেন বলা হয়?

مصر (মিসর)কে ইংরেজিতে লেখা হয় Egypt (ইজিপ্ট)। অনেকে ভেবে থাকেন একটি দেশের যা নাম ইংরেজিতে তার ব্যতিক্রম হবে কেন? ইংরেজিতে প্রতিবর্ণায়ন হতে পারে মাত্র। সেমতে مصر (মিসর) কে ইংরেজিতে প্রতিবর্ণায়ন করে বলা যেতে পারে Misr। তা না করে Egypt (ইজিপ্ট) কেন লেখা হয়। বস্তুত Egypt (ইজিপ্ট) শব্দটি প্রাচীন মিসরীয় আরবি থেকেই উদ্ভূত। সে হিসেবে মিসর ও ইজিপ্ট একই দেশের দুটো নাম– একটা আধুনিক আরবি নাম, আরেকটা প্রাচীন আরবি থেকে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধনের পর গঠিত ইংরেজি নাম। Egypt (ইজিপ্ট) ইংরেজি নামটিও আরবি থেকেই উদ্ভূত। এমন নয় যে, Egypt (ইজিপ্ট) আরবি مصر -এর প্রতিবর্ণায়ন।

Egypt শব্দের মূল হল حت. كا. بتاح (হিত-কা-বাতাহ)। এর ব্যাখ্যা অনেকে অনেকভাবে করেছেন। একটি ব্যাখ্যা এরূপ– حت অর্থ ঘর, শহর, দেয়াল। كا অর্থ মর্যাদা। আর بتاح হচ্ছে গীযা (الجيزة/Giza) শহরের প্রাচীন দেবতা الفتاح। তাহলে নামটির মোটামুটি অর্থ দাঁড়ায় 'খোদার সম্মানিত ঘর' (بيت جاه الرب)। আর একটি ব্যাখ্যা এরূপ– حت অর্থ ঘর, শহর, দেয়াল। كا অর্থ প্রাচীন মিসরীয় ভাষায় শক্তি, আত্মা। আর بتاح অর্থাৎ, الفتاح শব্দটি

মূলত باب‌ফাতাহ এর সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রাচীন মিসরীয় বাকরীতি অনুসারে ب হয়ে গেছে ال। অতএব নামটির মোটামুটি অর্থ দাঁড়ায় ফাতাহ-এর শক্তিতে সংরক্ষিত শহর (المدينة المحصنة بقوة الفتاح), ভাবার্থ আল্লাহর শক্তিতে সংরক্ষিত শহর। এরূপ ভাবার্থকে সামনে রেখে মামলূক শাসনামলে কায়রোকে বলা হত مصر المحروسة অর্থাৎ, সংরক্ষিত মিসর। কিনআনীরা পুরো মিসরকেই 'মিসর' বলা শুরু করে। গ্রীকরা এই حت. كا. بتاح কে তাদের মতো করে পরিবর্তন করেছে। তারা حت কে বানিয়েছে E, كا কে বানিয়েছে G, আর بتاح বা فتاح কে বানিয়েছে yptus। এভাবে হয়ে গেছে egyptus (ইজিপতুস)। (এটা হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব আষ্টদশ শতকে।) এখান থেকে ইংরেজিতে হয়ে গেছে Egypt। ইটালী ভাষায় বলা হয় Egitto।

ঐতিহ্যবাহী দেশ হিসেবে মিসর

মিসর একটি প্রাচীন সভ্যতার দেশ। মিসর প্রায় ৩২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকেই একটি সংহত রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিদ্যমান। বড় মাপের রাজনৈতিক সংগঠনবিশিষ্ট ইতিহাসের প্রথম সভ্যতাগুলোর একটি এই মিসরের নীল নদের উপত্যকাতে গড়ে উঠেছিল। মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্যের পাশাপাশি মিসরের সঙ্গে জড়িত রয়েছে অতীতের খ্রিস্টান, গ্রীক-রোমান ও প্রাচীন আদিবাসী শক্তির ইতিহাস ও ঐতিহ্য। মিসর ভূমিতে চলেছে ফারাওদের শাসন, গ্রীক-রোমানদের শাসন, খ্রিস্টানদের শাসন, টলেমিদের শাসন ও মুসলমানদের শাসন। মিসরের দিকে দিকে বিশেষত লুকসুর-আসওয়ান, কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়াতে এসব বহুমুখী শাসনামলের বহুবিধ নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রয়েছে। মিসরে রয়েছে শত শত সাহাবীর কবর, যা তাদের এই এলাকায় আগমন ও বসবাসের প্রমাণ বহন করে। এক বাহান্সা (البهنسا) শহরেই শতাধিক সাহাবীর কবর রয়েছে। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) হুসনুল মুহাযারা (حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة) কিতাবে শত শত সাহাবী ও তাবিয়ীর তালিকা পেশ করেছেন যারা মিসরে এসেছেন বা মিসরে বাস করেছেন।

মিসর শুধু অমুসলিম ঐতিহ্যবাহী দেশ হিসেবেই খ্যাত নয়, ইসলামী ঐতিহ্যের দেশ হিসেবেও মিসর বিখ্যাত। যত দেশ ইসলামের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দেশ তার মধ্যে মিসর অন্যতম। এক হিসেবে সৌদী আরবের চেয়েও মিসরের পর্যটন স্পট সংখ্যায় বেশি হবে। মিসরে যে পরিমাণ পর্যটন স্পট রয়েছে, সৌদি আরবেও তার চেয়ে কোন অংশে কম থাকত না, যদি সৌদি আরবে শুধুমাত্র নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের

www.maktabatulabrar.com

স্মৃতি বিজড়িত স্থান ও বস্তুসমূহেরই যথাযথ সংরক্ষণ করা হত। সেই সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের স্মৃতি বিজড়িত স্থান ও বস্তুসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ করা হলে তো সৌদি আরবে এত বেশি পর্যটন স্পট হত যা মিসরকে পেছনে ফেলে দিত অনেক অনেক দূরে। কিন্তু সৌদী শাসকদের মাথায় কী ঢুকল, তারা নবী ও সাহাবীদের স্মৃতিবিজড়িত বস্তু ও স্থানসমূহ নিয়ে শিরক ঘটবে ভেবে নবী ও সাহাবীদের স্মৃতিবিজড়িত বস্তু ও স্থানসমূহের অনেক কিছুই ধ্বংস করে দিল। এরপর যদি কোনদিন তারা তাদের পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করতে চায় তখন তাদের পস্তানো ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না।

মিসর: ফেরআউনের দেশ না কি মূসা ও হারূনের দেশ?

মিসরের প্রধান মূল্যায়ন কিসের ভিত্তিতে হওয়া চাই– ইসলামী ঐতিহ্যের ভিত্তিতে না কি অনৈসলামিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে? সেমতে মিসরকে ফেরআউনের দেশ বলা হবে না কি মূসা ও হারূন প্রমুখ নবীর দেশ। নিঃসন্দেহে ফেরআউনরা মিসরের অধিবাসী ও শাসক ছিল এবং সে হিসেবে মিসরকে ফেরআউনদের দেশ বলা যেতে পারে। কিন্তু মিসরকে ফেরআউনদের দিকে সম্পৃক্ত করা উত্তম হবে না কি মূসা ও হারূন প্রমুখ নবীর দিকে? ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা ও ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতির বিচারে নিঃসন্দেহে দ্বিতীয়টি উত্তম হবে। কিন্তু বাস্তবে অনেকের মানসিকতা যেন এমন নয়। অনেকেই যেন মিসরকে ফেরআউনের দেশই মনে করে বসে আছে। তাই মিসর সফর থেকে ফিরে আসার পর অনেকেই প্রথমে যা জিজ্ঞাসা করেছেন তা হল মিসর সফরে গিয়েছিলেন তা ফেরআউনকে দেখেছেন তো? যেন ফেরআউনই মিসরের সব। এমনকি মিসরের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের অনেকে গর্বভরে নিজেদেরকে এভাবে পরিচয় দিয়ে থাকে– نحن ابناء الفراعنة অর্থাৎ, আমরা ফেরআউনদের উত্তরসূরী। দুঃখ লাগে এসব লোকদের এই ধর্মীয় আবেগ-বঞ্চিত মানসিকতা দেখে। তবে মিসরের সব লোক এমন নয়, এমনও অনেকে আছেন যারা ফেরআউনদের উত্তরসূরী বলে পরিচয় দিতে সংকোচবোধ করেন। একটা ঘটনা বলি। ১৯৯৪ বা ১৯৯৫ সনের ঘটনা হবে। হজ্জে গিয়েছিলাম। ১১ই যিলহজ্জ জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর মক্কায় যাওয়ার জন্য একটা গাড়িতে চড়েছি। ভিড়ের কারণে গাড়ি এগোতে পারছে না। দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ভট ভট করছে। অস্বস্তি লাগছিল। পাশের ছিটে একজন লোককে দেখে মনে হল আরব হবেন। ভাবলাম তার সঙ্গেই কথা বলে সময় পার করা যায়। আরবিতে জিজ্ঞাসা করলাম من أي بلاد (কোন্ দেশের লোক আপনি?) উত্তরে বললেন, من مَصر (মাস্‌রের অর্থাৎ, মিসরের) তিনি নিজের দেশকে

মিসর না বলে মাস্‌র বললেন। পূর্বে বলা হয়েছে, মিসরীয়রা তাদের দেশকে মিসর নয় বরং মাসর বলে থাকে। যাহোক লোকটি যখন নিজেকে মিসর দেশের লোক বলে পরিচয় দিলেন, আমি তখন বললাম, من بلاد فرعون! (ফেরআউনের দেশের লোক!) লোকটি তখন কিছুটা ভ্যাবাচেকা খেলেন। সংকোচবোধে আক্রান্ত হলেন বলে মনে হল। আমি তখন বললাম, يمكنك أن تقول : لا من بلاد فرعون ، بل من بلاد موسى وهارون (আপনি তো বলতে পারেন– না, ফেরআউনের দেশের নয় বরং মূসা ও হারূনের দেশের।) লোকটি তখন বেশ খুশি হয়ে আমাকে দুই হাতের দুই বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে ডবল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল দেখানো হচ্ছে আরবদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের একটা পদ্ধতি। সেমতে দুই হাতের দুই বৃদ্ধাঙ্গুল দেখানো হচ্ছে ডবল ধন্যবাদ জ্ঞাপন। আমাদের দেশে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখানো মানে কলা দেখানো অর্থাৎ, ইয়ে ... বুঝানো, অথচ এটিই আরবদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন। কথায় বলে, এক দেশের গালি আর এক দেশের বুলি।

মিসরের অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পের অবদান

মিসরের অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পের বিশেষ অবদান রয়েছে। মিসরের আয়ের একটি বড় উৎস হল তার পর্যটনস্পটগুলো, যেমন তার আয়ের আরেকটি বড় উৎস সুয়েজ খাল। মিসরের অনেক জায়গাতেই বিশেষত কায়রো, গীযা, সাক্কারা, লুকসুর, আসওয়ান, তূরে সাইনা ও আলেকজান্দ্রিয়ায় রয়েছে প্রচুর সংখ্যক ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান ও বস্তু, যেগুলো দর্শনের জন্য প্রতিদিন প্রতিটা স্পটে হাজার হাজার বিদেশী গমন করে থাকে, আর তাদের থেকে মিসরের উপার্জন হয় অকল্পনীয় পরিমাণ অর্থ। যদিও বিদেশীদের থেকে অনেকটা গলাকাটা অর্থই নেয়া হয়ে থাকে।

মিসর গমন

ঐতিহ্যবাহী দেশ হিসেবে মিসর ভ্রমণের ইচ্ছা মনে লালন করে আসছিলাম বহু বছর ধরে। বিশেষত ইসলামী ভূগোল ও ইসলামী ইতিহাসের কাজ শুরু করার পর এই ইচ্ছা উদগ্র হয়ে উঠেছিল। বারবার মনে হচ্ছিল ইসলামী ভূগোল ও ইসলামী ইতিহাসে মিসরের অনেক কিছু নিয়েই আলোচনা করতে হয়, যদি সেগুলো স্বচক্ষে সরেজমিনে দেখা নেয়া হত, তাহলে বুঝি লেখার বৈশিষ্ট্যই ভিন্ন হত। ২০১৮ সালে মিসরের ভিসা নেওয়ার পর মিসরে রাজনৈতিক গোলযোগ সৃষ্টি হওয়ার কারণে বিদেশীদের প্রবেশ বন্ধ হওয়ায় যেতে পারিনি। অবশেষে আল্লাহ পাক তাওফীক দিলেন। পরবর্তী বছর অর্থাৎ, ২০১৯ সালে ভিসাও হল মিসর ভ্রমণেও যাওয়া হল।

www.maktabatulabrar.com

১৩ এপ্রিল ২০১৯ ইং রাত ৩ টায় ঢাকা থেকে মিসরের উদ্দেশ্যে সাউদিয়া ফ্লাইট যোগে রওনা হলাম। সফরসঙ্গী ছিলেন জামেয়া আযহারের ফারেগ মাওলানা আব্দুল হালীম নুমানী আল-আযহারী। জেদ্দায় ২ ঘণ্টা ট্রানজিট। তারপর স্থানীয় সময় ৯ঃ ৫০ টায় কায়রোর উদ্দেশ্যে জেদ্দা ত্যাগ। দুপুর ১১ টায় কায়রো বিমান বন্দরে অবতরণ। আমার সঙ্গী মাওলানা আব্দুল হালীমের লাগেজে ছিল যেসব জিনিস নেওয়া নিষিদ্ধ এরকম অনেক কিছু। ছিল নানান রকম বাংলাদেশী সব্জি, বিভিন্ন রকমের তেল। এগুলো নেয়া নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু মাওলানা আব্দুল হালীম জামেয়া আযহারে অধ্যয়ন ও বিভিন্ন রকমের মাস্টার্স করা উপলক্ষে দীর্ঘ ১১ বছর কায়রো থেকেছেন, সেখানে তার বন্ধুদের সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যায় না, বন্ধু তো নয় সব ভাগ্নে। তারা সকলে মাওলানা আব্দুল হালীম মামা বলে ডাকে, সেই হিসেবে তারা সব ভাগ্নে। এরককম মামা-ডাকা ভাগ্নেদের সংখ্যা গণনা করে শেষ করা দায়। তাদের অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়েই কিংবা বলা যায় কিছুটা তাদের মনস্তুষ্টি করতে গিয়েই মাওলানাকে ওগুলো নিতে হয়েছিল। প্রবাদে আছে অনুরোধে ঢেকি গেলা। কিন্তু এটা ঠিক অনুরোধে একটা ঢেকি গেলা নয় রাজ্যের ঢেকি গেলা। যাহোক অনেক ঝক্কি-ঝামেলা পোহানোর পর এবং কিছু জরিমানা দেয়ার পর ইমিগ্রেশন পাস হতে পারলাম। মেজবান ছিলেন মাওলানা আখতারুজ্জামান আমীন। তিনি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কয়েকজন জামেয়া আযহারে অধ্যয়নরত আমার ছাত্রও উপস্থিত ছিল। মাওলানা আখতার ১৭ বছর মিসরে অবস্থান করছেন। তার বাসা সাক্‌র কুরাইশ (صقر قريش) এলাকার হাইয়াল কানাদি (حي الكندي) তে তথা কানাদী মহল্লায়। এটা ঐতিহাসিক জাবালুল মুকাত্তাম (جبل المقطم)-এর দক্ষিণে পুরাতন কায়রো এলাকায়। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা মাওলানা আখতারুজ্জামানের বাসায় যাওয়া হল।

নতুন ও পুরাতন কায়রো সমাচার

ঢাকার মত কায়রোতেও নতুন পুরাতন কায়রো রয়েছে। কায়রো শহর দু'টো রিং রোড রয়েছে । এই রিং রোডদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশটুকু হচ্ছে পুরাতন কায়রো। পুরাতন কায়রোর অনেক স্থানে বাড়িঘর তুলনামূলক ছোট ছোট, অধিকাংশ এক দুই তলা বা উর্দ্ধে ৩ চার তলা বিশিষ্ট। রাস্তাঘাটও সরু সরু। তবে কিছু কিছু স্থানে ব্যতিক্রমও রয়েছে। কিছু কিছু স্থানে বিভিন্ন ডেভলপার কোম্পানি বহুতল বিশিষ্ট বিল্ডিং বানানোও শুরু করেছে। ফলে এসব স্থানে কায়রোর পুরাতন চেহারা পাল্টাতে শুরু করেছে। পুরাতন

কায়রোতে পুরাতন স্টাইলের যানবাহনও রয়েছে। বাংলাদেশের ন্যায় সি-এন-জিও রয়েছে যার নাম টুকটুক। পুরাতন কায়রোয় এখনও ঘোড়া ও গাধার গাড়িতে মালামাল বহনের প্রথা চালু রেখে পুরাতনত্বের প্রমাণ ধরে রাখা হয়েছে। গাধার বোঝা টানা, বেশ ব্যতিক্রমী বটে। গাধা, বোঝা টানে গাদা গাদা। বাছুর সাইজের ছোট্ট প্রাণী গাধা, কিন্তু বোঝা টানার ক্ষেত্রে তার দ্বিগুণ বা তিনগুণ বড় সাইজের গরু মহিষের চেয়ে কম যায় না। গাধার বোঝা টানার ক্ষেত্রে একটা মজার কথা হল– গাধাকে যত বেশি বোঝা দেয়া হয় তত বেশি দ্রুত হাঁটে এবং ফূর্তির সাথে হাঁটে। আর বোঝার পরিমাণ কম হলে গাধার চলায় কোন ফূর্তি থাকে না। কারণ, গাধা নাকি বোঝা বেশি দেয়া হলে মনে করে তাকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে, তাই তার দেহ মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে, ফূর্তির সাথে চলতে থাকে। পক্ষান্তরে বোঝা কম দেয়া হলে চিন্তা করে তাকে কোনই মূল্য দেয়া হল না, মনমরা হয়ে যায়। আসলে গাধার ভাবনাও তো গাধার মতই! এ হল গাধার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট। গাধার আরেকটা বৈশিষ্ট হল গাধা সারাক্ষণ চিন্তায় ডুবে থাকে, যেন সারাক্ষণ গবেষণা করছে। আমরা যখন দেওবন্দ মাদরাসায় পড়তাম তখন দেওবন্দ মাদরাসার সদর গেটের পাশে অর্থাৎ প্রধান ফটকের পাশে এক লোকের বেশ কিছু গাধা থাকত। আমরা দেখতাম গাধাগুলো মাথা নিচু করে এবং একটু ঘাড় কাত করে অপলক নেত্রে একদিকে তাকিয়ে আছে, যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। আমাদের উস্তাদ হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ পালনপূরী দামাত বারাকাতুহু এখন দেওবন্দ মাদরাসার শাইখুল হাদীছ, তখন ছিলেন তিরমিযী শরীফের উস্তাদ। তিনি ঐ গাধাগুলোর ব্যাপারে রসিকতা করে বলতেন, "ইয়ে মুফাক্কিরীন কি জামাআত হায়।" অর্থাৎ, এ হল চিন্তাবিদদের দল।

যাহোক নতুন পুরাতন কায়রোর কথা বলছিলাম। যারা কায়রোর ঐতিহাসিক স্পটগুলো দর্শনে যাবেন তাদের জন্য পুরাতন কায়রোতে অবস্থান করাই শ্রেয় হবে। কারণ কায়রোর ঐতিহাসিক স্পটগুলোর প্রায় সবটাই পুরাতন কায়রোতে বা তার আশেপাশে।

মিসরীয়দের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য

মিসরে পৌঁছার পর জানতে ও বুঝতে পারলাম মিসরীয়দের বিশেষত কায়রো ও তার আশপাশের অধিবাসীদের আরবি উচ্চারণে বিশেষ দু'টো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। (১) আরবী জিম (ج) কে গ-এর ন্যায় উচ্চারণ করা। (২) ক্বাফ (ق) কে আলিফ বা হামযার ন্যায় উচ্চারণ করা। তাই তারা মাসজিদকে বলে মাসগিদ। জাবাল (অর্থ পাহাড়)কে বলে গাবাল। সেমতে জাবালে তূর

www.maktabatulabrar.com

বা জাবালে মূসাকে বলে গাবালে তূর, গাবালে মূসা। জামেয়াকে বলে গামেয়া। জামেয়া আযহারকে বলে গামেয়া আযহার। জুমআকে বলে গুমআ। জামাআতকে বলে গামাআত। জায়েযকে বলে গায়েয। জামবান্ নীল (جنب النيل/নীলের পাশে)কে বলে গামবান্ নীল। কায়রোর পার্শ্ববর্তী এলাকা জীযা (جيزه) কে বলে গীযা। এমনকি ইংরেজিতে লেখার সময়ও তারা সেভাবেই লেখে Giza। মিসরের মুদ্রার নাম পাউন্ড। মুদ্রার গায়ে আরবিতে লেখা আছে جُنَيْه (জুনায়হ) কিন্তু মুখে তারা উচ্চারণ করে গিনীহ। এই উচ্চারণে দু'টো ব্যতিক্রমতা ঘটে। ১. জীম-এর পেশকে যের উচ্চারণ। ২. জ- কে গ উচ্চারণ। কেউ একজন অন্য কারও অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, আপনি জিজ্ঞাসা করবেন আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? তখন তার শুদ্ধ আরবিতে উত্তর ছিল واحد جاء (ওয়াহিদ জাইন) অর্থাৎ, একজন লোক আসবে (তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি), কিন্তু জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি মিসরীয় হলে বলবে, "ওয়াহেদ গাই"। কোন একজন লোক আসেনি বুঝানোর জন্য শুদ্ধ আরবি হল মা জাআ (ما جاء) অর্থাৎ, সে আসেনি, কিন্তু মিসরীয়রা বলে 'মাগাশ'। এতে মা জাআ-কে বানানো হয়েছে মাগা, অর্থাৎ, জীমকে গ বানানো হয়েছে, আর তার সঙ্গে একটা শীন (ش) অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে। আরবদের মধ্যে অনেক শব্দের শেষে সীন (س) ও শীন (ش) যোগ করার প্রচলন রয়েছে। আরবদের বকর গোত্রে ওয়াক্‌ফের সময় কাফ (ك)-এর সঙ্গে সীন সাকিন যোগ করা হয়। যেমন أكرمتُكِ এর স্থলে أكْرَمْتُكِسْ বলা হয়। بِكِ এর স্থলে বলা হয় بكِسْ আর সম্বোধনের কাফ-এর স্থলে শীন ব্যবহার করা হয়। যেমন বনূ তামীম গোত্রে ما الذي جَاءَ بِكِ এর স্থলে বলা হয়, ما الذي جَاءَ بِشِ এক গোত্রের উচ্চারণে কুরআনের আয়াত قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا কে এভাবে বলা হয়– قَدْ جَعَلَ رَبُّشِ تَحْتَشِ سَرِيًّا। আল্লামা আবূ মানসূর ছাআলিবী 'ফিক্‌হুল লুগাহ ওয়া আসরারুল আরাবিয়্যাহ' (فقه اللغة وأسرار العربية) গ্রন্থে কাফ-এর সঙ্গে সীন যোগ করার এই রীতির নাম বলেছেন কাস্‌কাসাহ (كسكسة), আর কাফ-এর স্থলে শীন ব্যবহারের রীতির নাম বলেছেন কাশ্‌কাশাহ (كشكشة)। আমাদের দেশেও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শব্দের শেষে এটা সেটা যোগ করার রীতি রয়েছে। যেমন ময়মনসিংহ এলাকায় অনেক ক্রিয়ার শেষে 'ইন' যোগ করা হয়। সেমতে বলা হয়, খাইবাইন, যাইবাইন, করবাইন, করছুইন ইত্যাদি। আল্লামা ছাআলিবী জানতে পারলে হয়তো ময়মনসিংহের এই ব্যবহারের নাম দিতেন 'ইন্‌ইনাহ'।

এতক্ষণ মিসরীয়দের আরবি উচ্চারণের একটা বৈশিষ্ট্য –আরবি জিম (ج) কে গ-এর ন্যায় উচ্চারণের কিছু বিবরণ প্রদান করা হল। তাদের আরবি উচ্চারণের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল ক্বাফ (ق) কে আলিফ বা হামযার ন্যায় উচ্চারণ করা। যেমন: পূর্বে উল্লেখিত সাক্‌র কুরাইশ (صقر قريش) এলাকাকে তারা বলে সা'র উরাইশ। জাবালুল মুকাত্তাম (جبل المقطم) কে বলে গাবালুল মুআত্তাম। কাসরে কারূন (قصر قارون) কে বলে আসরে আরূন। বুহায়রা কারূন (بحيرة قارون) কে বলে বুহায়রা আরূন। ইত্যাদি।

উসামা আব্দুল আজীম দামাত বারাকাতুহুম-এর সাক্ষাতে

জোহরের নামাজের পর মেজবান আখতারুজ্জামানের বাসায় খাওয়া-দাওয়া ও কিছুটা বিশ্রাম সেরে বাদ আসর বের হলাম। এই যে বের হওয়া, এরপর শুধু বারবার মেজবানের ঘর থেকে বের হওয়া আর ফিরে আসা। এই বেরোচ্ছি এই ফিরে আসছি, এই যাচ্ছি এই আসছি। ১৩ দিন থাকা হয়েছিল, তার মধ্যে আসা আর যাওয়ার এরকম পালা চলছিল বিরতিহীনভাবে। এত ছুটাছুটির এনার্জি আমি কোত্থেকে পেয়েছিলাম জানি না। দেশে তো কোথাও যাওয়া-আসার এরকম এনার্জি পাই না বললেই চলে। মেজবান আখতারুজ্জামানও বিস্ময়ে বলেছিল, হুজূরের মা শাআল্লাহ অনেক এনার্জি, এতো অল্প সময়ে এতোকিছু দেখে সম্পন্ন করলেন!

সর্বপ্রথম গেলাম জামেয়া আযহারের বড় আলেম উসূলে ফেকাহ বিশেষজ্ঞ উসামা আব্দুল আজীম দামাত বারাকাতুহুম-এর সাক্ষাতে। তার বাসা হল আল ইমাম আশ-শাফিয়ী মহল্লায়। এটি বাসাতীন (بساتين) এলাকার দক্ষিণে প্রাচীন ক্বারাফা (قرافة)-র অন্তর্ভুক্ত একটি এলাকা। (ক্বারাফা ও ফুছতাত এলাকা দুটো সম্বন্ধে পরে আলোচনা আসছে।) উসামা আব্দুল আজীম সাহেবের বাসার নিচতলা নামাযের জন্য নির্ধারিত। দেখলাম পশুর বড় বড় চামড়া বিছানো, যেগুলোকে মুসল্লা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। দারুণ একটা প্রাচীনত্বের আমেজ বোধ হল। উসামা আব্দুল আজীম সাহেব প্রতিদিন ফরজ নামাজে ১০ পারা কুরআন তেলাওয়াত করেন। বাসাতেই জামাত হয়। এক এক নামাযের জামাত ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা লম্বা সময় নিয়ে হয়। এমনকি মাগরিবের নামাযও এক ঘণ্টার বেশি দীর্ঘ হয়। কিন্তু এতে যে

www.maktabatulabrar.com

মাগরিবের নামায মাকরূহ ওয়াক্তে চলে যায়[১], আর লম্বা তেলাওয়াত করতে গিয়ে নামাযকে মাকরূহ ওয়াক্তে টেনে নিয়ে যাওয়া মাসআলাগতভাবে কতটুকু সুন্দর সে ফয়সালা মুফতীগণই করবেন। যাহোক জামেয়া আযহারের ছাত্রদের বাচনিক শুনেছিলাম তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী পরহেযগার ও আমলী মানুষ। তাঁকে দেখেও মা শাআল্লাহ তেমনই পেলাম। জাহিরী সুরত, লেবাস-পোশাক, অবয়ব, আদা (অ্যাপ্রোচমেন্ট) সবই মাশাআল্লাহ তাকওয়া-পরহেযগারির অনুকূল। তাকে বললাম, আপনার যিয়ারতের মাধ্যমে মিসরের যিয়ারত শুরু করার নিয়ত করেছি। এখানে উল্লেখ্য যে, জামেয়া আযহারের অনেক শিক্ষকের আমল ও দ্বীনী কাইফিয়াত এখন ভাল নয়। অনেকের দাড়ি খসখসি কিংবা সমূলেই সেভ। অনেককে সালাফে সালেহীনের লেবাসের বিপরীতে প্যান্ট শার্ট বা ট্রাউজার পরিহিত দেখা যায়। এর মধ্যে উসামা আব্দুল আজীম সাহেবের লেবাস-পোশাক ও দ্বীনী কাইফিয়াত এতো ভাল দেখে বললাম, হযরত, আলহামদু লিল্লাহ! ব্যাপকভাবে না হলেও এখনও জামেয়া আযহারে এই রং অবশিষ্ট আছে। তিনি আপ্লুত হলেন বলেই মনে হল। তিনি ইফতার করছিলেন। আমাদেরকেও শরীক করলেন। এখানে মাগরিবের নামায দীর্ঘ হবে ভেবে উসামা আব্দুল আজীম সাহেব থেকে বিদায় নিয়ে পাশের মসজিদে গেলাম। সেখানে আমাদেরকে দেখে মুসাফির মনে করে এবং দীর্ঘ সময় হয়তো দিতে পারব না ভেবে একজন আমাদেরকে জানালেন সেখানেও নাকি মাগরিবের নামায আধা ঘণ্টা দীর্ঘ হয়। বুঝা গেল সেই মসজিদে উসামা আব্দুল আজীম সাহেবের আছর পড়েছে। যাহোক আমরা একটা টুকটুকে চড়ে দ্রুত চলে গেলাম মসজিদুল ইমাম আশ-শাফিয়ী-তে। সেখানে গিয়েই মাগরিবের নামায আদায় করলাম।

কুরআন তেলাওয়াতে মিসরীয়দের বৈশিষ্ট্য

উসামা আব্দুল আজীম সাহেবের দীর্ঘ তেলাওয়াত মূলত কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি মিসরীয়দের মনের টানেরই একটা নমূনা। বস্তুত কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি মিসরীয়দের আগ্রহ ও যত্নই আলাদা। কায়রোর একটি

১. আমাদের মযহাবে ইশতিবাকুন্নুজূম (اشتباك النجوم) হওয়ার পর মাগরিবের ওয়াক্ত মাকরূহ হয়ে যায়। আর ইশতিবাকুন্নুজূম হয় সূর্য অস্ত যাওয়ার ৪৫ মিনিট পর।

রেডিও চ্যানেল (إذاعة القرآن الكريم من القاهرة) থেকে ২৪ ঘণ্টা তিলাওয়াত প্রচারিত হয়। (মাঝে মধ্যে কুরআন থেকে শিক্ষা ও কুরআন তেলাওয়াতের নিয়ম-নীতি ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।) একটা জরিপে জানা গেছে মিসরীয়দের মধ্যে অন্যান্য চ্যানেলের তুলনায় এই চ্যানেলের শ্রোতাই বেশি। আমরাও অধিকাংশ গাড়িতে দেখেছি গানের পরিবর্তে এই চ্যানেলের কুরআন তেলাওয়াত শোনা হচ্ছে। বুঝ গেল ড্রাইভারদেরও তেলাওয়াত শোনার প্রতি আগ্রহ বেশি। মিসরীয়দের তেলাওয়াতের প্রতি আগ্রহ এত বেশি যে, কোন নামাযেই তারা ছোট কেরাত পড়ে তৃপ্তি বোধ করে না। এমনকি মাগরিবের নামাযেও আমাদের দেশের ফজরের নামাযের ন্যায় দীর্ঘ কেরাত পাঠ করা হয়। ছোট সূরা পাঠ করলেও দেখা যায় এক এক রাকআতে পাঁচ সাতটি সূরা পাঠ করা হয়। আর প্রতি সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম সশব্দে পাঠ করা হয়। কেননা তাদের নিকট বিসমিল্লাহ প্রতি সূরারই অংশ।

কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে মিসরীয়দের আগ্রহ ও যত্ন একটা ঐতিহাসিক সত্য বিষয়। এই উক্তি প্রসিদ্ধ আছে যে, কুরআন নাযেল হয়েছে হিজাযে, লেখা হয়েছে কুফায় আর তেলাওয়াত করা হয়েছে মিসরে।

মৃতের উদ্দেশ্যে কুরআন তেলাওয়াতের অদ্ভূত মজলিস

কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি মিসরীয়দের আগ্রহ ও যত্নের আর একটা নমুনা দেখলাম যখন আমরা হযরত উসামা আব্দুল আজীমের সাক্ষাতে যাচ্ছিলাম। তার সাক্ষাতে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে দেখলাম এক রাস্তায় মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন তেলাওয়াতের অদ্ভূত শানদার মজলিসের দৃশ্য। আমাদের দেশে যেমন ওয়াজ মাহফিলের জন্য প্যান্ডেল সাজানো হয় সেভাবে এক মজলিস সাজানো। বিস্তৃত জায়গা নিয়ে খুব শানদারভাবে সাজানো। নিচেয় দামী কার্পেট বিছানো। অসংখ্য চেয়ারে পুরো জায়গা ভরা। আসলে সেই মহল্লায় একজন লোক মারা গিয়েছে, তার জন্য ঈসালে ছওয়াব করতে কুরআন তেলাওয়াত করা হবে, এলাকার সব পুরুষ জড় হয়ে একত্রে বসে তেলাওয়াত করবে, তারই জন্য মজলিস সাজানো।

www.maktabatulabrar.com

উপরে বর্ণিত কুরআন তেলাওয়াতের একটি মজলিস

মৃতের জন্য কাঁদুনে নারীদের জড় হওয়ার প্রাচীন রীতি

কেউ মারা গেলে মিসরীয়রা মৃতের ঈসালে ছওয়াবের জন্য কুরআন তেলাওয়াত করতে কীভাবে জড় হয় তার কিছু বর্ণনা পূর্বের পরিচ্ছেদে দেয়া হয়েছে। আর একটা ব্যাপার হল পুরোনো কায়রোয় কেউ মারা গেলে মৃতের জন্য কাঁদতে এক শ্রেণীর নারীরা জড় হয়। মৃতের পরিবার না চাইলেও গায়ে পড়ে তারা জড় হয়ে কাঁদন জুড়ে দেয়। উদ্দেশ্য কিছু খাওন ও পাওন। এসব

নারীর অধিকাংশ বিভিন্ন কবরের পাহারা ও যত্নে নিয়োজিত, যারা সারা দিন রাত কবরের পাহারা ও যত্নে নিয়োজিত বেতনভুক্ত কর্মচারী। ক্বারাফা ও ফুছতাতের ব্যাপক এলাকা যে কবরস্তানে পরিণত হয়েছে (যার আলোচনা সামনে আসছে) সেই কবরস্তানে বিভিন্ন কবরে তারা পাহাদারি কাজ করে।

প্রাচীন আরবদের মধ্যে প্রচলন ছিল যে মৃতের জন্য যত বেশি কাঁদা হবে সেটা তত বেশি সেই মৃতের ব্যক্তিত্ব ও গুরুত্ব জ্ঞাপন করবে। তখন ভাবা হত লোকটির জন্য এতো যখন কাঁদা হল তখন নিশ্চয় সে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হবে, নইলে কেন তার জন্য এতো কাঁদা। তাই আপনজনদের কাঁদন ফুরিয়ে গেলে ভাড়া করা নারীদের আনা হত। তারা বাড়ির ছাদে বা আশেপাশে দীর্ঘ দিন যাবত মৃতের জন্য সুর করে করে বিলাপ করে করে কাঁদন চালিয়ে যেত। যত বেশি পয়সা ততবেশি কাঁদন–এই ছিল সোজা হিসাব। এই রীতি এখন আরবদের মধ্যে তেমন না থাকলেও পুরাতন কায়রোতে এখনও কিছুটা বহাল রয়েছে। তবে এখন আর কাঁদুনে নারীদের ভাড়া করে আনা হয় না, তারা নিজেরাই কিছু খাওন-পাওনের উদ্দেশ্যে গায়ে পড়ে এসে কাঁদন জুড়ে দেয়। অর্থাৎ, এরা এখন আর আহুত মেহমান নয় গায়ে পড়ে আসা মেহমান। 'মান ইয়া না মান হাম তেরা মেহমান'। এ হল গায়ে পড়ে মেহমান হল, কিছুক্ষণ কাঁদল, কিছু খাদ্য-খাবারের শ্রাদ্ধ করল, কিছু পকেটে পুরল, চলে গেল। এতো কাঁদা নয় কাঁদনের ভণিতা। একজন্যই ইসলাম এটা সমর্থন করে না। ইসলাম চাটুকারিতা, ভণিতা, লৌকিকতা ও ভাড়ামোকে পছন্দ করে না।

ক্বারাফা ও ফুছতাত এলাকাদ্বয়ের পরিচিতি

পুরাতন কায়রোর ঐতিহাসিক অনেক কিছুই ক্বারাফা (قرافة) ও ফুছতাত (فسطاط) এলাকায় অবস্থিত। পুরাতন কায়রোর অনেক ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনায় তাই ক্বারাফা ও ফুছতাত এলাকার নাম বারবার আসে। এক সময়তো ফুছতাত রাজধানীই ছিল, যে সম্বন্ধে পরে আলোচনা আসছে। এজন্য ক্বারাফা ও ফুছতাত এলাকাদ্বয়ের পরিচয় ও মানচিত্র জানা থাকলে অনেক কিছুর অবস্থান পরিষ্কার হবে। তাই আমরা নিম্নে ক্বারাফা ও ফুছতাত এলাকাদ্বয়ের পরিচিতি ও মানচিত্র পেশ করছি। প্রথমে মানচিত্র পরে পরিচিতি।

ক্বারাফা, ফুছতাত ও তার আশ-পাশের এলাকার মানচিত্র

www.maktabatulabrar.com

ক্বারাফা: মৃতের নগরী

ক্বারাফা (قرافة) মিসরীয়দের উচ্চারণে 'আরাফা' এলাকাটি মিসরের একটি প্রাচীন এলাকা। কায়রোর দক্ষিণ-পূর্ব পাশে দীর্ঘ এলাকা জুড়ে জাবালুল মুকাত্তাম (মিসরীয়দের উচ্চারণে গাবালুল মুআত্তাম।) বা মুকাত্তাম পাহাড়। এই পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে ঐতিহাসিক কেল্লা সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী বা সালাহ উদ্দীন আইয়ূবির দূর্গ (قلعة صلاح الدين الأيوبي/Salah El Din Al Ayouby Citadel)। ইদানিং একে কেল্লা মুহাম্মাদ আলীও বলা হয়। এই দূর্গের পশ্চিম পাশে পাহাড়ের পাদদেশে আস-সাইয়্যিদা আয়েশা এলাকা। এই আস-সাইয়্যিদা আয়েশা এলাকা থেকে শুরু করে দক্ষিণ দিকে ইমাম লাইছি সড়ক, ইমাম আশ-শাফিয়ী সড়ক হয়ে আরও দক্ষিণ দিকে উকবা ইবনে আমের সড়ক পর্যন্ত হল ক্বারাফা এলাকা। এই ক্বারাফা এলাকার মধ্যেই ইমাম শাফিয়ী ও যাকারিয়া আনসারীর মাজার, হযরত ওকী' ও ইমাম তাহাবীর মাজার, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর মাজার, লাইছ ইবনে সা'দের মাজার, হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.)-এর মাজার, রাবেআ আদবিয়া ও মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া প্রমুখের মাজার। একে বলা হয় ক্বারাফা আস-সুগরা (القرافة الصغرى)। এর মধ্যে ইমাম শাফিয়ীর মসজিদ ও মাজার এলাকা এবং তার আশ-পাশের ক্বারাফা অঞ্চলকে বলা হয় 'ক্বারাফাতুশ শাফিয়ী' (قرافة الشافعي)। আর ফুছতাত (আলোচনা পরে আসছে)-এর পূর্বে হল ক্বারাফা আল-কুবরা (القرافة الكبرى)। উল্লেখ্য, ক্বারাফা আস-সুগরা পূরো এলাকাই জাবালুল মুকাত্তামের পাদদেশ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এজন্য ইতিহাসে ক্বারাফা এলাকার অনেক কবর বা ক্বারাফা এলাকায় অবস্থিত অনেক কিছুর পরিচয় দেয়া হয় এই বলে যে, জাবালুল মুকাত্তামে বা জাবালুল মুকাত্তামের পাদদেশে অবস্থিত।

ক্বারাফা এলাকা শুধু জীবিত মানুষদের নগরী নয়। এক সময় একে বলা হত জীবিত ও মৃতদের নগরী (مدينة الموتى والأحياء), কিন্তু বর্তমানে এর সিংহভাগই মৃতদের নগরী। অর্থাৎ, বর্তমানে প্রায় পূরো এলাকাই কবরে পরিণত হয়েছে। তাই এখন একে জীবিত ও মৃতদের নগরী না বলে শুধুই মৃতদের নগরী বলা যেতে পারে। শুধু ক্বারাফা নয় সালাই উদ্দীন আইয়ূবির দূর্গের পূর্বে মানশিয়াতুন নাসির (منشية الناصر) এলাকাও প্রায় গোটাটাই কবরস্তান। তুন্সী এলাকা (منطقة التونسي)-র অনেকাংশও কবরস্তান।

এই কবরস্তান বলতে আমরা যেমন বুঝি বিশাল এক খোলা জায়গা, যাতে কবরের সাথে কবর লাগানো, শুধু কবর আর কবর– এমন নয়। বরং এ এক ভিন্ন স্টাইলের কবরস্তান। বস্তুত এক সময় এই এলাকাগুলো ছিল

www.maktabatulabrar.com

জমজমাট বসতবাড়ি সম্পন্ন এলাকা। যেগুলোতে রোড-ঘাট, মসজিদ-মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার ইত্যাদি সবই ছিল। কোন বাড়ির কারও মৃত্যু হয়েছে তো ঘরের কোন এক কামরায় তাকে দাফন করা হয়েছে, আরেকজনের মৃত্যু হয়েছে তাকেও ঐ বাড়িতেই দাফন করা হয়েছে। এভাবে ক্রমান্বয়ে সব কামরা যখন কবরে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তখন উত্তরসূরীগণ ঐ বাড়ি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে। এভাবে গোটা এলাকার এই অবস্থা হয়েছে। গোটা এলাকা হয়ে পড়েছে কবরস্তান। এলাকায় রোড-ঘাট আগের মতই রয়েছে, বিভিন্ন বাড়ির দেয়াল, গেট আগের মতই রয়েছে, বাড়ির মধ্যে বাথরুম, রান্নাঘর, বিভিন্ন রকম প্যাসেজ আগের মতই রয়েছে, কিন্তু বসতবাড়ি হিসেবে পরিত্যাক্ত হয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে এক একটা জীবন্ত জনবসতি, কিন্তু তার সব বাড়িই জীবনস্পন্দনহীন কবরস্তান। মসজিদ-মাদ্রাসাগুলো পরিত্যাক্ত ও জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে, অনেক বাড়ির ছাদ দেয়াল ইত্যাদিও ভেঙ্গে পড়েছে। মাঝে মধ্যে দুই একটা বাড়ির অবস্থা এমন যে, দু' একজন লোকের থাকার জায়গা এখনও অবশিষ্ট রয়েছে বিধায় সেখানে দু' একজন লোক বসবাসও করছে– চতুর্দিকে ছড়ানো ছিটানো কবর তার মাঝেই তারা বসবাস করে চলেছে। এরকম স্থানে এমন একটি দৃশ্য আমার চোখে পড়েছে যে, চতুর্দিকে ছড়ানো ছিটানো কবরের মাঝে কয়জন লোক বসে দিব্যি চা নাস্তা করছে, গল্প-গুজব করছে। এক জায়গায় তো দেখলাম এরকম বহু কবরের মধ্যে বসে কয়েকজন দাবা খেলছে। অর্থাৎ, এই পরিবেশ তাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। দু' একটি বাড়ি এমনও রয়েছে যা দুই বা তিন তলা বিশিষ্ট। দ্বিতীয় বা তৃতীয় তলায় কোন কবর নেই, সেখানে কেউ বসবাসও করে না। সপ্তাহে ছুটির দিন নিচ তলার কবরবাসীদের আপনজন খাদ্য-খাবার নিয়ে এসে সারাদিন উপর তলায় অবস্থান করে মৃতদের জন্য ছওয়াব রেসানী করে।

এসব এলাকা এভাবে কবরস্থানে পরিণত হল কেন? তার একটা স্বাভাবিক কারণ এই হতে পারে যে, এসব এলাকায় পাবলিক গোরস্তান না থাকায় মানুষ এভাবে মৃতদেরকে নিজেদের বাড়িতে দাফন করতে বাধ্য হয়েছে। ফলে বিশাল বিশাল এই এলাকাগুলো কবরস্তানে পরিণত হয়েছে। আর একটা কারণ এ-ও উল্লেখ করা হয় যে, একটি রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায়, জাবাতুল মুকাত্তাম একটি পবিত্র পাহাড়। হযরত মূসা আলাইহিস

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এই পাহাড়ে ইবাদত করতেন।[১] একটি ঐতিহাসিক বর্ণনায় হযরত লাইছ ইবনে সাআদ (রহ.) থেকে উল্লেখ এসেছে যে, হযরত আম্র ইবনুল আস (রা.) যখন এই অঞ্চল জয় করেন তখন মিসরের সাবেক বাদশাহ মুকাওকিস হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর নিকট ৭০ হাজার দীনারের বিনিময়ে এই পাহাড়টি ক্রয় করার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন, আমাদের কিতাবে এই পাহাড়ের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আমাদের কিতাবে আরও লেখা হয়– এই পাহাড়ে জান্নাতের গাছ উদ্গত হবে। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এ মর্মে পরামর্শ চেয়ে পত্র লেখেন। হযরত ওমর (রা.) জবাব পাঠান– মুসলমানরা জান্নাতের বেশি হকদার। অতএব এখানে মুসলমানদের কবরস্থান বানাও। সেমতে এলাকাটিকে কবরস্থান বানানো হয়।[২] অনেকেই এই এলাকায় কবরস্থ হতে আগ্রহী থাকায় এই এলাকাটি এভাবে কবরস্থানে পরিণত হয়েছে। পূর্বেই বলেছি, ক্বারাফা আস-সুগরা পুরো এলাকাই জাবালুল মুকাত্তামের পাদদেশ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

নিচের ছবিগুলো দেখুন তাহলে স্পষ্ট হবে যে, ক্বারাফা এলাকা কীভাবে কবরস্থানে পরিণত হয়েছে এবং করবস্থান বলতে কেমন কবরস্থান।

ক্বারাফা এলাকার কবরসমূহের চিত্র

১. الخطط المقريزية ج/٢ صفحہ/٢٢٠

২. الخطط المقريزية وحسن المحاضرة. قال تقي العثماني : إسناده ليس بالقوي

www.maktabatulabrar.com

মানশিয়াতুন নাসির এলাকার কবরসমূহের চিত্র

তুনসী এলাকার কবরসমূহের চিত্র

মিসরের সরকারও এসব এলাকা নিয়ে বিব্রত অবস্থায় রয়েছে। এগুলো ভেঙ্গে নতুন করে জনবসতি এলাকায় পরিণত করতে পারছে না। কারণ, সব জায়গা ব্যক্তি মালিকানাধীন। তবে ইদানিং দেখা যাচ্ছে কোথাও কোথাও রাস্তার পাশে হলে অতি পুরাতন কবর বিশিষ্ট বাড়ি ভেঙ্গে সেখানে দোকানপাট বা বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠান বানানো হচ্ছে। এভাবে হয়তো এক সময় কবরস্তানে পরিণত হওয়া এই এলাকাগুলোর চিত্র পাল্টে যাবে। তাছাড়া মিসর সরকার কায়রোর বাইরে এত বিশাল এলাকা জুড়ে পাবলিক গোরস্তান বানিয়েছে আমাদের দেশে যত বিশাল কবরস্তানের কল্পনাও করা যায় না। কায়রো থেকে গীযা এলাকার দিকে যাওয়ার সময় এ কবরস্তান নজরে পড়ে।

ফুছতাত

'ফুছতাত' মিসরের প্রাচীন একটি নগরী। শুধু প্রাচীন নগরী নয় প্রাচীন মিসরের এক সময়ের রাজধানীও। ফারাওদের আমলে প্রথম রাজবংশ থেকে অষ্টম রাজবংশ পর্যন্ত মিসরের রাজধানী ছিল মেনেফ এলাকা[1]। নবম ও দশম রাজবংশের সময় ছিল এহ্নাসিয়া (اهناسيا/Ehnasia) এলাকা[2]। একাদশ রাজবংশের সময় ছিল উকসুরে[3]। দ্বাদশ রাজবংশের সময় ছিল লিশ্ত (اللشت/Al List) অঞ্চলে[4]। ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ রাজবংশের সময় ছিল আভারিস (أواريس/Avaris) এলাকায়[5]।

১. মেনেফ (منف)কে মেমফিস (ممفيس/Memphis)ও বলা হয়। মেনেফ বা মেমফিস গীযা থেকে ২০ কিলোমিটার এবং কায়রো থেকে ১৯ কিলোমিটার দক্ষিণে একটি প্রাচীন নিচু এলাকা। শত শত বছর মেনেফ শহর আবাদ ছিল। বুখতে নাসসার-এর আক্রমণে শহরটি ধ্বংস হয়ে যায়। মিত রাহিনা (ميت رهينة/Mit Rahina) শহরের পাশে এখনও মেনেফ বা মেমফিসের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। মেনেফ 'মেন নেফের' (منفر/من نفر) নামেও পরিচিত।

২. এহ্নাসিয়া এলাকা বেনি সুয়েফ (بني سويف/Beni Suef) মুহাফাজার অন্তর্গত। মুহাফাজাটি মিসরের মধ্যভাগে কায়রো থেকে দক্ষিণে কায়রো ও আল-মিন্‌ইয়া (المنيا/Minya)-এর মাঝে অবস্থিত। এহ্নাসিয়ার প্রাচীন নাম ছিল হেরাক্লিয়োপোলিস (هيركليوبوليس/Heracleopolis)।

৩. উকসুরকে লুকসুর (لقصر/Luxor)ও বলা হয়। এর প্রাচীন নাম ছিল তাইবা (طيبة)। লুকসুর বা উকসুর মিসরের দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি গভর্ণরশাসিত এলাকা (মুহাফাজা)।

৪. লিশ্ত গীযা (الجيزة) এলাকার আল-আইয়াত (العياط/Al Ayat) কেন্দ্রের একটি গ্রাম।

৫. আভারিস বর্তমান আশ-শারকিয়্যাহ মুহাফাজার তেল্লুয যাবআ এলাকার কাছে নীল ব-দ্বীপ (دلتا النيل/Nile Delta)-এর পূর্বে।

www.maktabatulabrar.com

১৭, ১৮ ও ১৯তম রাজবংশের সময় ছিল আবার উকসূরে। এটা ছিল র‍্যামেসিস-২ এর সময় পর্যন্ত। র‍্যামেসিস-২ রাজধানী বের-র‍্যামেসিস বা পি র‍্যামেসিস[1] এলাকায় স্থানান্তর করেন। ২১তম রাজবংশের সময় প্রশাসনিক বিষয়ের রাজধানী থাকে আশ-শারকিয়্যাহ মুহাফাজার তানিস[2] (تانيس/Tanis) এলাকায়, আর ধর্মীয় বিষয়ে রাজধানী থাকে উকসূরে। ২২ ও ২৩তম রাজবংশের সময় রাজধানী ছিল তেল্লুদ দাবআ (تل الضبعة/Tell el-Dab'a) এলাকায়।[3] ২৪তম রাজবংশের সময় ছিল পশ্চিমাঞ্চলীয় নীলের ব-দ্বীপ (دلتا النيل/ Nile Delta)-এর শহর সান আল-হাগার (صان الحجر/San Al Hagar)য়ে। ২৫তম রাজবংশের সময় আবার মেনেফে। ২৬তম রাজবংশের সময় আবার সান আল-হাগারে। ২৭তম রাজবংশের সময় আবার মেনেফে। ২৮তম রাজবংশের সময় বর্তমান আল-মানসুরা (المنصورة) শহরের তেল্লুর রোবা' (تل الربع/Tell el Roba) অঞ্চলে।[4] ২৯তম রাজবংশের সময় মেনদেস (منديس/Mendes) অঞ্চলে।[5] ৩০তম রাজবংশের সময় সেবেন্নিতোস (سبينيتوس/Sebennytos) অঞ্চলে।[6] তারপর আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট (الإسكندر المقدوني) মিসর দখল করার পর রাজধানী বানান আলেকজান্দ্রিয়াকে। রোমান ও গ্রীক শাসনামলে আলেকজান্দ্রিয়াই রাজধানী থাকে। তারপর ৬৪১ খ্রীস্টাব্দ মোতাবেক ২০ হিজরিতে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলমানরা মিসর জয় করলে রাজধানী বানানো হয় এই ফুছতাতকে। তখন পর্যন্ত কায়রোতে বড় ধরনের কোন শহরের অস্তিত্ব ছিল না। তারপর কায়রো শহর গঠিত হয়। এবং ফুছতাত পরে কায়রোর মধ্যে মিশে যায়। তারপর তুলুনী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ ইবনে তুলুন কায়রোর আল-কাতায়ে' (القطائع)

১. বের-র‍্যামেসিস (بر رمسيس) বা পি র‍্যামেসিস (Pi Ramesses) আশ-শারকিয়্যাহ গভর্ণরেট (محافظة الشرقية/Ash Sharqia Governorate)-এর একটি এলাকা।

২. তানীস মিসরের উত্তর-পূর্ব এলাকার নীল ব-দ্বীপের নিকটবর্তী একটি শহর।

৩. তেল্লুদ দাবআ এলাকা আশ-শারকিয়্যাহ মুহাফাজায় নীল ব-দ্বীপের পূর্ব পাশে অবস্থিত।

৪. তেল্লুর রোবা' এলাকাটি আল-মানসূরা শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে। আর আল-মানসূরা শহরটি দাকাহলিয়া (الدقهلية/Dakahlia) মুহাফাজার অন্তর্ভুক্ত। তেল্লুর রোবা'র প্রাচীন নাম ছিল মেনদেস (منديس/Mendes)।

৫. মেনদেস-এর বর্তমান নাম তেল্লুর রোবা'। দেখুন পূর্বের টীকা।

৬. সেবেন্নিতোস বর্তমান আল-গারবিয়্যাহ মুহাফাজার সামান্নৌদ (سمنود/Samannoud) শহর।

শহরকে[১] রাজধানী বানান। তারপর ফাতিমী আমলের ২য় ফাতিমী খলীফা আল-মুইয লি দ্বীনিল্লাহ কায়রোকে রাজধানী বানান।

বস্তুত হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) যখন মিসর জয় করেন তখন এখানে ফুছতাত নগরী বলেও কিছু ছিল না। শুধু ছিল বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সেনা-দূর্গ। আশেপাশে ছিল ছোটখাট কিছু জনবসতি। দূর্গের পতন হয় হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর হাতে। বিজয়ের পর হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করেন, যাকে বলা হয় জামেউ আমর ইবনুল আস (جامع عمرو بن العاص)। এই মসজিদের পাশেই তিনি নিজের জন্য পশমের তৈরি তাঁবু দিয়ে একটি বাড়ি বানান। তার সঙ্গী অনেকেরও বাড়ি বানানো হয়। আর পশমের তৈরি তাঁবু দিয়ে বানানো ঘরকেই বলা হয় ফুছতাত (فسطاط)। এখান থেকেই ফুছতাত নগরী ও তার নামের উৎপত্তি।

ক্বারাফার পশ্চিমে ফুছতাত এলাকা অবস্থিত। উত্তরে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর মসজিদ (جامع عمرو بن العاص) থেকে কিছু উত্তর পর্যন্ত, দক্ষিণে মার গিরগিস মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন ও ব্যবিলন দূর্গের আশপাশ পর্যন্ত এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর মসজিদ থেকে পূর্ব দিকে কিছুদূর পর্যন্ত এরিয়া নিয়ে ফুছতাত এলাকা অবস্থিত।

কায়রোতে যা কিছু দেখা হল

মসজিদুল ইমাম আল-শাফিয়ী গমন

পূর্বে উল্লেখ করেছি হযরত উসামা আব্দুল আজীম সাহেবের সাথে সাক্ষাতের পর আমরা মসজিদুল ইমাম আশ-শাফিয়ীতে মাগরিবের নামাজ আদায় করি। মসজিদের নামকরণ হয়েছে ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর দিকে সম্পৃক্ত করে। যে সড়কের পাশে এ মসজিদ সেই সড়কের নামও ইমাম শাফিয়ী সড়ক (شارع الإمام الشافعي)। মহল্লাকেও ইমাম শাফিয়ী মহল্লা বলা হয়। এলাকাটি প্রাচীন ক্বারাফা (القرافة الصغرى)-এর অন্তর্ভূক্ত।

নামাযের পর দেখলাম বেশ কয়েকজন লোক কুরআনে কারীম নিয়ে গোল হয়ে বসেছেন। একজন তেলাওয়াত করছেন আর বাকিরা শুনছেন, ভুল হলে অন্যরা শুধরে দিচ্ছেন। এভাবে ঘুরে ঘুরে সকলেই তেলাওয়াত করছেন এবং ভুল-ত্রুটি থাকলে সংশোধন করে নিচ্ছেন। মেজবান জানালেন মিসরের বহু মসজিদেই এরকম ধারা চালু রয়েছে। পূর্বেই বলেছি কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআন তেলাওয়াত শুদ্ধকরণের প্রতি মিসরীয়দের যত্নই আলাদা।

১. আল-কাতায়ে' বর্তমানে কিলআতুল কাব্‌শ (قلعة الكبش) নামে পরিচিত। এটি আস-সাইয়্যেদা যয়নাব এলাকায়।

www.maktabatulabrar.com

এই মসজিদুল ইমাম আশ-শাফিয়ীর পাশেই ছিল হযরত ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর ঐতিহাসিক দরসগাহ। যেখানে তিনি বহু বছর দরস প্রদান করেছেন। ইমাম শাফিয়ীর ওফাতের পর হযরত যাকারিয়া আল-আনসারী (রাহ.) এখানে দরস প্রদান করেছেন। এটা ছিল একটা ইতিহাসখ্যাত দরসগাহ। অত্যন্ত বড় মাপের আলেমগণই এখানে দরস দানের যোগ্য বিবেচিত হতেন। কিন্তু এখন সেখানে দরস-তাদরীসের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

মসজিদুল ইমাম আশ-শাফিয়ী

ইমাম শাফিয়ী ও শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারীর কবর যিয়ারত

ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর যে মসজিদ –মসজিদুল ইমাম আশ-শাফিয়ী (مسجد الإمام الشافعي)– তারই কেবলার দিকে ইমাম শাফিয়ীর মাজার। মাজারটি একটি সুন্দর গম্বুজ বিশিষ্ট শানদার ইমারতের মধ্যে। (বর্তমানে ২০১৯ সালে ইমারতটির অভ্যন্তরে সংস্কার কাজ চলছে।) আইয়ুবী সুলতান আল-কামেল ৬০৮ হিজরি মোতাবেক ১২১১ খ্রীস্টাব্দে ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর সম্মানে ইমারতটি নির্মাণ করেছিলেন। ইমারতটিকে বলা হয় কুব্বাতুল ইমাম আশ-শাফিয়ী (قبة الإمام الشافعي)। মিসরের মধ্যযুগে এটি ছিল সুন্দরতম একটি ইমারত। পরবর্তীতে ৮৮৫ হিজরি মোতাবেক ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে মামলূক রাজ সুলতান আশরাফ কায়তবাই এটির সংস্কার করেন। সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীও এর সংস্কার করেন। এর মধ্যে রয়েছে ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ও শাইখুল ইসলাম হযরত যাকারিয়া আনসারী (রহ.)-এর কবর। এর মধ্যে সুলতান আল-কামেলের কবরও রয়েছে। আরও রয়েছে সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়্যুবির স্ত্রী ও তার পুত্রের কবর। এছাড়া শাফিয়ী মাযহাবের বেশ কিছু সংখ্যক মাশায়েখের কবরও এখানে রয়েছে।

উল্লেখ্য, হযরত তাকী উছমানী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম তার সফরনামা 'জাহানে দীদাহ' তে কুব্বাতুল ইমাম শাফিয়ীর মধ্যেই হযরত লাইছ ইবনে সা'দ-এর কবর থাকার কথা বলেছেন। আর যাকারিয়া আনসারীর মাজার অন্য জায়গায় বলে তিনি বর্ণনা দিয়েছেন। এটা ভুল। মূলত যাকারিয়া আনসারীর কবর ইমাম শাফিয়ীর কবরের কাছে একই ইমারতের মধ্যে আর হযরত লাইছ ইবনে সা'দের মাজার অন্যত্র। হযরত লাইছ ইবনে সা'দের মাজার সম্বন্ধে পরে বর্ণনা আসছে।

কুব্বাতুল ইমাম আশ-শাফিয়ী

ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়
(১৫০–২০৪ হি.)

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ফিকহের চার ইমামের একজন। হানাফী ফিকহের পরেই তাঁর ফিকহ দুনিয়াতে বেশি চালু। তার বংশতালিকা নিম্নরূপ: মুহাম্মাদ ইবনে ইদ্রীস ইবনে আব্বাস ইবনে উছমান আল-কুরাশী আশ-শাফিয়ী আল-মক্কী। তিনি বংশগতভাবে কুরায়শী এবং মক্কায় প্রতিপালিত হওয়ায় মক্কী বলে পরিচিতি লাভ করেন।

www.maktabatulabrar.com

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ১৫০ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন, যে সনে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ইন্তেকাল করেন।

কেউ কেউ বলেছেন ইমাম শাফিয়ীর জন্মস্থান গাযা, আবার কেউ কেউ বলেছেন আসকালান। বস্তুত গাযা ও আসকালান পাশাপাশি, তদুপরি সেযুগে আসকালান গাযা-রই অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই বর্ণনায় এই পার্থক্য দেখা দিয়েছে। ইমাম শাফিয়ী-র মা ছিলেন ইয়ামানের। তাই জন্মের দু'বছর পর ইমাম শাফিয়ী-র পিতা ইন্তেকাল করলে মা ছেলেকে নিয়ে পিতৃকুল ইয়ামানে চলে যান। কয়েক বছর পরে কুরাইশ বংশের সম্পর্ক দৃঢ় করার লক্ষ্যে মক্কায় চলে আসেন।

সাত বছর বয়সেই তিনি সম্পূর্ণ কুরআন হেফজ করেন। দশ বছর বয়সে তিনি ইমাম মালিকের সংকলিত হাদীছ গ্রন্থ মুয়াত্তা মুখস্থ করেন। অল্প বয়সেই তিনি মক্কায় আরবী পণ্ডিতদের কাছে আরবী কবিতা ও ভাষা জ্ঞানে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ইলম শিক্ষার জন্য তিনি বহু দেশ সফর করেছেন। সর্বপ্রথম তিনি মদীনা সফর করেন এবং মদীনার ইমাম– ইমাম মালিকের সাহচর্যে যান। ইমাম মালিক (রহ.) যতদিন বেঁচে ছিলেন ইমাম শাফিয়ী (রহ.) তাঁর সঙ্গ ছাড়েননি। তাই মুয়াত্তা ছাড়াও আরো অনেক কিছু তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেন। মদীনার পর তিনি ইয়ামানে শিক্ষার উদ্দেশ্যে বের হন। সেখানে শিক্ষাও লাভ করেন, জ্ঞান বিস্তারেও আত্মনিয়োগ করেন। সেখানে একটা সরকারী পদে চাকুরিও করেন। জনসমাজে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে তিনি বিদ্বেষীদের রোষানলে পড়েন, ফলে তার ইয়ামানে আর থাকা হল না। তার ইয়ামান ত্যাগের সেই ঘটনা হল– তখনকার খলীফা হারুনুর রশীদ এই মর্মে অবগত হন যে, ইয়ামানে আলী বংশীয় ও তার অনুসারী কিছু লোক কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই সুযোগে ইমাম শাফিয়ী-র প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন নাজরানের গভর্ণর ইমাম শাফিয়ী-র বিরুদ্ধেও মিথ্যা রটায় যে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইমাম শাফিয়ী-রও যোগসাজশ রয়েছে। বাদশাহ হারুনুর রশীদ ইমামের প্রতি সন্দিহান হয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাকেও বন্দী করে বাগদাদ নিয়ে আসেন। তখন বাদশাহর দরবারে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর খাস শাগরেদ ইমাম মুহাম্মাদের বিশেষ প্রভাব ছিল। ইমাম শাফিয়ী যখন বন্দী হয়ে বাদশাহর দরবারে আসেন তখন তিনি ইমাম মুহাম্মাদের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, আমার সম্বন্ধে তার ভাল জানা আছে। বাদশাহ হারুনুর রশীদ ইমাম মুহাম্মাদের কাছে ইমাম শাফিয়ী সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাকে আমি জানি, তিনি একজন বড় মাপের আলেম,

তার ব্যাপারে যা রটানো হয়েছে তার ন্যায় ব্যক্তি থেকে তেমন কিছু ঘটতে পারে না। এ কথা শুনে বাদশাহ হারুনুর রশীদ ইমাম মুহাম্মাদকে বলেন, তাকে আপনার কাছে রাখুন, যাতে আমি তার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে পারি। এভাবে বিদ্রোহের অভিযোগ থেকে ইমাম শাফিয়ী নিষ্কৃতি লাভ করেন। এটা ছিল ১৮৪ হিজরির ঘটনা, যখন ইমাম শাফিয়ীর বয়স ছিল ৩৪ বছর। ইমাম শাফিয়ী ইমাম মুহাম্মাদের দরসে বসার সুযোগ পান এবং তার মাধ্যমে ইরাকীদের ইলমও লাভ করেন। তিনি হেজায ও ইরাক উভয় অঞ্চলের ইলমের অধিকারী হয়ে ওঠেন। এ সময় তিনি উসূলে ফিকহ বিষয়ে কিতাব রচনার চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এভাবে প্রায় ২ বছর বাগদাদে থেকে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর কাছে ইলম হাসেল করার পর তিনি মক্কায় ফিরে যান এবং মক্কাতেই দরস-তাদরীসের কাজে একটানা ৯ বছর নিয়োজিত থাকেন। অতঃপর ১৯৫ হিজরিতে আবার ইরাক সফর করেন। এ সফরেই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ইমাম শাফিয়ী-র সাক্ষাৎ করেন। এসময় তিনি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আর-রিসালাহ' সংকলন করেন। ইরাকেও তার বেশি দিন থাকা হয়নি। তখন মুতাযিলা আলেমরা রাজনৈতিক প্রাঙ্গণ দখল করে রেখেছি-ল। খলীফা হারুনুর রশীদসহ সে সময়ের আব্বাসীয় খলীফাগণ মুতাযিলী আলেমদের উপস্থাপিত দর্শন ও তর্কবিদ্যায় প্রভাবিত হয়ে কুরআন মাখলূক (সৃষ্ট)–এই ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইমাম –ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম শাফিয়ী এবং যারা বিদআতমুক্ত সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের ধারক-বাহক ছিলেন তাদের উপর নির্যাতন শুরু করে, যার ফলে বাধ্য হয়ে ইমাম শাফিয়ী ইরাক ত্যাগ করে মিসর গমন করেন। মিসরবাসী তার আগমনে সন্তুষ্ট হন। তারা বুঝতে পারেন, মিসরের বুকে এমন প্রতিভাবান ব্যক্তির আগমন আর ঘটেনি। ইমাম শাফিয়ী জীবনের শেষ পর্যন্ত মিসরেই অবস্থান করেন এবং তাঁর মূল্যবান গ্রন্থসমূহ সেখানেই সংকলন করেন।

ইমাম শাফিয়ী বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রসিদ্ধ চার ইমামের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর গ্রন্থাবলী সর্বাধিক, অতঃপর ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর। ইমাম শাফিয়ী রচিত ও সংকলিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম্নরূপ–

- كتاب الرسالة القديمة (كتبه في بغداد)
- كتاب الرسالة الجديدة (كتبه في مصر)

www.maktabatulabrar.com

- كتاب اختلاف الأحاديث
- كتاب جمّاع العلم
- كتاب إبطال الاستحسان
- كتاب أحكام القرآن
- كتاب بيان فرض الله عز وجل
- كتاب صفة الأمر والنهي
- كتاب اختلاف مالك والشافعي
- كتاب اختلاف العراقيين
- كتاب علي وعبد الله
- كتاب فضائل قريش
- كتاب الإملاء

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বহু প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরাম থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। তার প্রসিদ্ধ কয়েকজন উস্তাদ:

(১) ইমাম সুফইয়ান ইবনে উয়ায়নাহ মক্কী (মৃত: ১৯৮ হি.)
(২) ইমাম ইসমাঈল ইবনে আব্দুল্লাহ মক্কী (মৃত: ১৭০ হি.)
(৩) ইমাম মুসলিম ইবনে খালিদ মক্কী (মৃত: ১৭৯ হি.)
(৪) ইমাম মালিক ইবনে আনাস মাদানী (মৃত: ১৭৯ হি.)
(৫) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল মাদানী (মৃত: ২০০ হি.)
(৬) ইমাম হিশাম ইবনে ইউসুফ ইয়ামানী (মৃত: ১৯৭ হি.)
(৭) ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ্ কূফী (মৃত: ১৯৭ হি.)

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) থেকে বহু ব্যক্তি শিক্ষা লাভ করেছেন। তার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র:

(১) ইমাম রাবী ইবনে সুলায়মান আল-মাসরী।
(২) ইমাম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া আল-মুযানী আল-মাসরী।
(৩) ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ আল-ফাকীহ আল-মাসরী।
(৪) ইমাম আবূ ইয়াকূব ইউসুফ ইবনে ইয়াহইয়া আল-মাসরী।
(৫) ইমাম আবুল হাসান ইবনে মুহাম্মদ আয-যা'ফরানী।

মিসরে থাকা অবস্থায় ২০৪ হিজরির রজব মাসে এই মহান ইমাম ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উঁচু মাকাম দান করুন। আমীন!

শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া আল-আনসারী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
(৮২৩–৯২৬ হি.)

হযরত শায়খুল ইসলাম আবূ ইয়াহইয়া যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া আল-আনসারী, আস-সুনাইকী, আল-আযহারী, আশ-শাফিয়ী। তিনি ৮২৩ (মতান্তরে ৮২৪ বা ৮২৬) হিজরি মোতাবেক ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে মিসরের রাজধানী কায়রোর আল-হিলমিয়্যা (الحلمية/Al-helmiya) মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি হেফজে কুরআন সম্পন্ন করার পর কিছু প্রাথমিক ফিকহের কিতাবাদি পাঠ করেন তারপর ৮৪১ হিজরীতে জামেয়া আযহারে ভর্তি হন। তিনি الشاطبية , الألفية , المنهاج প্রভৃতি কিতাব মুখস্থ করেন। তিনি ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনে হুমাম, জালালুদ্দীন মহল্লী, বদরুদ্দীন কারখী প্রমুখ উলামা থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। ইবনে হাজার হাইছামী ও আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী-র মত ব্যক্তি তার ছাত্র। তিনি একাধারে হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ, উসূলে ফিকহ ও আরবি সাহিত্যসহ ইসলামী বহু শাস্ত্রে বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। সেই সঙ্গে ছিলেন সুফী বুযুর্গ ব্যক্তি। কেউ কেউ তাকে যুগের মুজাদ্দিদ বলেও আখ্যায়িত করেছেন। মিসরবাসী তাকে নিয়ে গর্ব করে।

তিনি ছাত্র জীবনে খুব অভাবের মধ্যে থেকে লেখা-পড়া করেছেন। তিনি নিজে বলেছেন, জামেয়া আযহারে পড়ার সময় অভাবে এমনও অবস্থা হয়েছে যে, খাবারের জন্য কোন কিছু না পেয়ে অগত্যা উযু খানার পাশে পড়ে থাকা তরমুজের ছাল নিয়ে ধুয়ে তা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেছি। পরে এক আল্লাহর ওলী আমার অবস্থা জানতে পেরে আমার খোঁজ-খবর রাখা শুরু করেন। তিনি সব খরচপাতি দেয়া শুরু করেন। সেসময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি ইনশাআল্লাহ অনেক দিন বেঁচে থাকবে, শাইখুল ইসলাম হবে, তোমার শাগরেদদের মধ্যেও শাইখুল ইসলাম হবে। আল্লাহ তাআলা হযরতের অভাবও মোচন করে দিয়েছিলেন, একটা সময় এমন এসেছিল যখন হযরতের দৈনন্দিন আয় ছিল তিন হাজার দেরহাম। তখন তিনি বহু সদকা করতেন এবং তা করতেন অতি গোপনে।

সুলতান আশরাফ কায়তবাই-এর উপর্যুপরি অনুরোধের মুখে তিনি প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণের পর সুলতানের বে-ইনসাফির বিরুদ্ধে তাকে তিরস্কার করার কারণে সুলতান এক পর্যায়ে তাকে পদচ্যুত করেন। তিনি আবার ইলমী লিপ্ততায় ফিরে আসেন।

www.maktabatulabrar.com

হযরত শাইখুল ইসলাম একশ বছরের বেশি হায়াত পেয়েছেন। শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে অবস্থায়ও দরস প্রদান ও রচনা-সংকলনের কাজ অব্যাহত রাখেন। ৯২৬ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে বহু কিতাব রচনা করেছেন। যার তালিকা নিম্নরূপ:

- إعراب القرآن العظيم.
- أحكام الدلالة على تحرير الرسالة (شرح الرسالة القشيرية في التصوف).
- أدب القاضي على مذهب الإمام الشافعي.
- أضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة (شرح على القصيدة المنفرجة).
- تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية للزركشي.
- تلخيص أسئلة القرآن وأجوبتها لأبي بكر الرازي صاحب مختار الصحاح.
- أسباب الموجودات.
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب (في الفقه).
- التحفة السنية في الخطب المنبرية.
- الدرة السنية على شرح الألفية.
- الدرر السنية على شرح الألفية (حاشية على شرح ألفية ابن مالك).
- الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية.
- الزبدة الرائقة في شرح البردة الفائقة.
- الغرر البهية شرح البهجة الوردية (في الفقه).
- الفتحة الأنسية لغلق التحفة القدسية (في الفرائض).
- الفتوحات الإلهية في نفع أرواح الذوات الإنسانية.
- الفتوحات الإلهية في نفع أرواح الذوات العلية.
- اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم (رسالة).
- المطلع شرح إيساغوجي (في المنطق).
- المقصد لتلخيص ما في المرشد (في القراءات).
- بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب (شرح على متن شذور الذهب في النحو لابن هشام).
- بهجة الحاوي (شرح على "الحاوي الصغير" للقزويني في الفقه).
- تحرير تنقيح اللباب (في فقه الإمام الشافعي) اختصار لـ "تنقيح اللباب" في الفقه.
- تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر (في التجويد).
- مختصر أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر.
- تلخيص تقريب النشر.

- حاشية على شرح البهجة لولي الدين بن العراقي.
- حاشية على شرح ابن المصنف على ألفية ابن مالك في النحو.
- حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلى على جمع الجوامع.
- خلاصة الفوائد المحمدية في شرح البهجة الوردية.
- رسالة في التعريف بمصطلحات الصوفية.
- رسالة نص فتوى في جواز استعمال خرق الصوفية لكل طريقة أن تستعمل علامة غيرها.
- الدقائق المحكمة (في القراءات).
- شرح طوالع الأنوار للبيضاوي في علم الكلام.
- شرح تحرير اللباب.
- شرح صحيح مسلم.
- تحفة الباري بشرح صحيح البخاري (شرح الجامع الصحيح للبخاري).
- شرح الشمسية في المنطق.
- شرح الروض لابن المقريء.
- شرح مختصر المزني.
- شرح المقدمة الجزرية.
- شرح المنهاج للبيضاوي (في أصول الفقه).
- شرح زكريا الأنصاري على الأربعين النووية.
- شرح زكريا الأنصاري على المقنع لابن الهائم.
- شرح شذور الذهب (في النحو).
- شرح البسملة والحمدلة.
- مقدمة شيخ الإسلام على البسملة.
- مقدمة على البسملة والحمدلة.
- مقدمة في الكلام على البسملة والحمدلة.
- مقدمة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على البسملة (وهى غير رسالته على البسملة).
- مقدمة في أصول الفقه.
- ملخص تلخيص المفتاح.
- نَهج الطلاب في منهاج الطالبين للنووي (في الفقه).
- منهج الطلاب.
- منهج الوصول إلى تخريج الفصول (في الفرائض).
- نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية (في الفرائض).

www.maktabatulabrar.com

- مناهج الكافية في شرح الشافية (في الصرف).
- عماد الرضى بيان آدب القضاء.
- غاية الوصول إلى شرح الفصول (في أصول الفقه).
- غاية الوصول إلى شرح لب الأصول.
- فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (في علوم الحديث).
- فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل (تعليق على تفسير البيضاوي).
- فتح الإله الماجد بإيضاح شرح العقائد (حاشية على شرح العقائد النسفية).
- فتح الدايم بشرح وسيلة ابن الهايم.
- فتح الرحمن بشرح رسالة الولي رسلان (في التوحيد).
- فتح الرحمن بشرح لقطة العجلان وبلة الظمآن (في الفقه للزركشي).
- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن (في التفسير).
- فتح المبدع في شرح المقنع.
- فتح الوهاب بشرح الآداب (آداب البحث والمناظرة).
- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب.
- فتح رب البرية بشرح القصيدة الخزرجية (في علم العروض).
- فتح مفرج الكرب.
- فتح منزل المثاني بشرح أقصى الأماني.
- فتح العلام بشرح أحاديث الأحكام.
- لب الأصول مختصر من جمع الجوامع.

ইবনে হাজার আল-আসকালানির কবর যিয়ারত

হযরত ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ও যাকারিয়া আনসারী (রহ.)-এর কবর জিয়ারত করার পর হযরত ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.)-এর কবর যিয়ারতে গেলাম। তার কবর ক্বারাফা এলাকায়। অনেকেই চেনে না। এক টুকটুকওয়ালার সাথে কথা বললে সে চেনে বলে জানায়। কিন্তু আসলে সে চেনে না। ভিন্নদিকে গাড়ি নিয়ে চলছিল। আমাদের সঙ্গে ছিলেন মাওলানা আব্দুল হালীম। তিনি আগেও এ কবর জিয়ারত করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন, এদিকে নয় বরং এদিকে। পরে মাওলানা আব্দুল হালীমের কথাই সঠিক প্রমাণিত হল। আসলে মসজিদুল ইমাম আশ-শাফিয়ীকে ডান হাতে রেখে ইমাম শাফিয়ী সড়ক (شارع الإمام الشافعي) দিয়ে সামনে বেশ কিছুদূর এগোলে রাস্তার বাম পাশে হযরত হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী

(রহ.)-এর কবর। এখন কবরটি বিধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছে। কবরটি যে বাড়ির মধ্যে সেই গোটা বাড়িটিই বিধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছে। বাড়ির সামনের দেয়ালে লেখা আছে–

سيدي الإمام ابن حجر العسقلاني شيخ الإسلام وإمام الأولياء الشهير شارح البخاري في كتاب الباري وأكثر من مئات الكتب

(অর্থাৎ, ইমামুল আউলিয়া শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার আসকালানীর কবর, যিনি বোখারী শরীফের শরাহগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'সহ শত শত গ্রন্থের প্রণেতা।)

অন্য অনেকের কবর পরিপাটি থাকা সত্ত্বেও এত বড় ব্যক্তির কবরটি এরকম বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে কেন তার কোন কারণ আমার বুঝে আসেনি। সেদিন রাতের বেলায়ই কবরটি জিয়ারত করেছিলাম। পরে আরেকদিন দিনের বেলায় যেয়ে পরিতৃপ্তি সহকারেই জিয়ারত করেছিলাম। সেদিনটি ছিল শুক্রবার। সেদিন কবরের সামনের এলাকায় গুরু ছাগলের হাটও বসেছিল। জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম প্রতি শুক্রবারই এখানে সাপ্তাহিক হাট বসে।

ইবনে হাজার আসকালানী-র কবরের প্রাচীন ছবি

www.maktabatulabrar.com

ইবনে হাজার আসকালানী-র কবরের সামনে বর্তমানে যে লেখাটি আছে

ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)–এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(৭৭৩–৮৫২ হি.)

ইবনে হাজার আসকালানী (ابن حجر العسقلاني) অসাধারণ এক জগৎ বরেণ্য আলেম। একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও ফকীহ। তিনি হলেন মারজিউল উলামা (مرجع العلماء) অর্থাৎ, উলামায়ে কেরাম কুরআন হাদীছের ব্যাপারে যার দিকে রুজু করে থাকেন। তিনি বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ সহীহ আল-বুখারী-র বিখ্যাত শরাহ গ্রন্থ– ফাতহুল বারী-র রচয়িতা। একাধারে তিনি ছিলেন হাফেজ, মুহাদ্দিস, মুফতী এবং কায়রোর প্রধান বিচারপতি। কায়রোর তৎকালীন প্রসিদ্ধ সব দরসগাহে তিনি হাদীছ, ফিকহ ইত্যাদির তালীম দিতেন।

তাঁর নাম আহমদ। তার পিতা আলী ইবনে মুহাম্মাদ। তার উপনাম আবুল ফজল। উপাধী শিহাবুদ্দীন। মূলত তাঁর পরিবার তিউনিসিয়ার অন্তর্গত

কাবেস (قابس/Gabes) এলাকার অধিবাসী ছিল। পরবর্তী সময়ে আসকালান নামক স্থানে তারা বসতি গড়ে তোলেন। আসকালান হচ্ছে ফিলিস্তীনের (বর্তমান ইসরাঈলের দখলে থাকা) ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় একটি এলাকা। ইবনে হাজারের পিতা-মাতা এই আসকালানের অধিবাসী ছিল বিধায় ইবনে হাজারকে 'আসকালানী' বলা হয়।

ইবনে হাজার আসকালানী ৭৭৩ হিজরি মোতাবেক ১৩৭১ খ্রিস্টাব্দে মিসরের কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলী ছিলেন বিখ্যাত ফকীহ ও কবি। শৈশবেই ৪ বছর বয়সের সময় তিনি পিতাকে হারান। মাতা আরও আগে ইন্তেকাল করেন। পিতার ওসীয়ত মোতাবেক যাকি উদ্দীন আল-খুররুবী (মৃত: ৭৮৭ হি.) নামক মিসরের একজন বড় ব্যবসায়ী তার লালন-পালন করেন। যাকি উদ্দীন তার পিতার বন্ধু ছিলেন।

৯ বছর বয়সে তিনি কুরআন হেফজ করেন। প্রখর মেধার অধিকারী হওয়ায় অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বেশ কিছু কিতাব মুখস্থ করেন। হাদীছ শাস্ত্রে ইবনে হাজারের খাস উস্তাদ ছিলেন হাফেজ যাইনুদ্দীন ইরাকী। তিনি ইবনে হাজার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, আমার সঙ্গীদের মধ্যে হাদীছ শাস্ত্রে ইবনে হাজারের চেয়ে বড় আলেম কেউ নেই। একবার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী মক্কা মুকাররমায় যমযম পান করার সময় দুআ করেছিলেন হে আল্লাহ! আমাকে হাফেজ যাহাবীর ন্যায় মুখস্থ-শক্তি দান করুন। আল্লাহ তাআলা তার এই দুই কবূল করেন। ২০ বছর পর আবার মক্কা মুকাররমায় এলে দুআ করেন হে আল্লাহ! আমাকে আরও মুখস্থ-শক্তি দান করুন। পরবর্তী সময়ের উলামায়ে কেরাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে হাফেজ যাহাবী থেকেও ইবনে হাজারকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

হযরত ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর জীবনে বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। যথা:

১. তিনি ইত্তেবায়ে সুন্নাতের ব্যাপারে এতটা যত্নবান ছিলেন যে, মানুষ তার আমল দেখে সুন্নাতের উপর কীভাবে আমল করতে হয় তা শিখত।

২. হালাল-হারামের ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। একবার একটা খাবার খেয়ে সন্দেহ হল যে, সেটা বোধ হয় হালাল নয়, তিনি তা যাচাই করে যখন জানতে পারলেন একটা গামলা এনে বললেন, আমি এখন সেই কাজ করব যা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) করেছিলেন। তিনি পুরো খাবার বমি করে ফেলে দিলেন।

৩. তার জীবন ছিল রুটিনবদ্ধ জীবন। তিনি সব কাজ রুটিন মোতাবেক

www.maktabatulabrar.com

করতেন, কোন কিছুই রুটিনের বাইরে করতেন না, যাতে তার জীবনের কোন সময় নষ্ট না হয়।

ইবনে হাজার আসকালানী কায়রোর আমর ইবনে আস মসজিদ এবং আল-আযহার মসজিদের খতীব ছিলেন। ৮২৭ হিজরী সন থেকে ২১ বছর তিনি কায়রোর প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৭৯৬ হিজরি থেকেই তিনি রচনা ও সংকলনের কাজ শুরু করেন। আকীদা, রিজালুল হাদীছ, শরহুল হাদীছ, উসূলে হাদীছ, ফিকহ ও ইতিহাস ইত্যাদি বহু শাস্ত্রে তিনি অনন্য সব কিতাব লিখে গেছেন। হাফেজ সাখাবীর বর্ণনা মোতাবেক তার রচনা ও সংকলনের সংখ্যা ২৭০। হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) তার নাজমুল ইক্বইয়ান (نظم العِقيان في أعيان الأعيان) কিতাবে সংখ্যা ২০০ বলেছেন। বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারী সেগুলোর অন্যতম। ইবনে হাজার (রহ.) ৩০ বছরের পরিশ্রমে বুখারির এই ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। তার রচিত ও সংকলিত প্রসিদ্ধ কিতাবগুলো হচ্ছে–

- فتح الباري شرح صحيح البخاري
- تهذيب التهذيب
- تقريب التهذيب
- لسان الميزان
- الإصابة في تمييز الصحابة
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة
- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر

এ ছাড়াও তার রচিত ও সংকলিত বিশেষ কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদান করা গেল।

- الإحكام لبيان ما في القرآن من الأحكام
- ديوان شعر
- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف
- ذيل الدرر الكامنة
- ألقاب الرواة
- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة

- تعريف أهل التقديس ويعرف بطبقات المدلّسين
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام
- الجمع المؤسس بالمعجم المفهرس
- تحفة أهل الحديث عن شيوخ الحديث
- القول المسدَّد في الذب عن مسند الإمام أحمد
- تسديد القوس في مختصر الفردوس للديلمي
- تبصير المنتبه في تحرير المشتبه
- رفع الإصر عن قضاة مصر
- إنباء الغمر بأنباء العمر
- إتحاف المهَرة بأطراف العشرة
- الإعلام في من ولي مصر في الإسلام
- نزهة الألباب في الألقاب
- الديباجة
- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام
- تغليق التعليق

এতসব মূল্যবান ও অনন্য কিতাবাদি রচনা ও সংকলন সত্ত্বেও হাফেজ সাখাবী (মৃত: ২০৯ হি.)-এর বর্ণনা মোতাবেক তিনি (হাফেজ ইবনে হাজার) বলে গেছেন,

لست راضياً عن شيء من تصانيفي؛ لأني عملتها في ابتداء الأمر، ثم لم يتهيأ لي مَنْ يُحَرِّرُها معي، سوى: «شرح البخاري»، و «مقدمته»، و «المشتبه»، و «التهذيب»، و «لسان الميزان»، وأما سائر المجموعات فهي كثيرة العَدَد واهية العُدَد، ضعيفةُ القُوى، ظامئة الرُّوى.

অর্থাৎ, আমি আমার এসব লেখার কোনোটির ব্যাপারে সন্তুষ্ট নই। কারণ, জীবনের শুরুতেই এসব লিখেছি। তদুপরি আমার সঙ্গে লেখার ব্যাপারে সহযোগিতা করারও কেউ ছিল না। তবে শুধু বোখারীর শরাহ (ফাতহুল বারী) এবং তার ভূমিকা (হাদইয়ুস সারী), আল-মুশতাবিহ, আত-তাহযীব ও লিসানুল মীযান কিতাবগুলোর ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। এ কয়টি কিতাব ব্যতীত

www.maktabatulabrar.com

বাকি সবগুলোর অবস্থা হল– সংখ্যায় অনেক, তত্ত্ব-তথ্যে নগন্য, শক্তিতে দুর্বল এবং পিপাসা নিবারণে অক্ষম।

৮ জিলহজ্জ ৮৫২ হিজরি মোতাবেক ১৪৪৮ মতান্তরে ১৪৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমিন!

মসজিদুল ইমাম আল-লাইছ এবং ইমাম লাইছ-এর কবর যিয়ারত

তারপর মসজিদুল ইমাম আল লাইছ (مسجد الإمام الليث) এবং ইমাম লাইছ ও তার পুত্রের কবর জিয়ারত করলাম। মসজিদুল ইমাম আল-লাইছ ক্বারাফা এলাকায় ইমাম আল-লাইছী সড়কে (شارع الإمام الليثي) অবস্থিত। মসজিদুল ইমাম আল-লাইছ-এর বাম পাশেই ইমাম লাইছ ইবনে সা'দ ও তার পুত্রের মাজার। মাজারের সামনে একটা খোলা চত্বরও রয়েছে। ৬৪০ হিজরির পর প্রথম হযরত লাইছ ইবনে সা'দের কবরের উপর গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারত বা কুব্বা বানানো হয়। ভিতরে নামায পড়ার জায়গাও রয়েছে। এজন্য এটাকে ইমাম লাইছির ইবাদতখানা (معبد الإمام الليثي)ও বলা হয়। মাজারের সামনে একটি সাইনবোর্ডেও ইমাম লাইছির ইবাদতখানা (معبد الإمام الليثي) কথাটি লেখা আছে। হযরত লাইছ ইবনে সা'দ-এর কবরের পাশে তার পুত্র শুআইব (রহ.)-এর কবরও রয়েছে। হযরত শুআইব (রহ.) হাদীছের একজন রাবী (রেওয়ায়েতকারী)।

মসজিদুল ইমাম আল-লাইছ (ডানে) ও তার মাজার (বামে)

ইমাম আল-লাইছ-এর মাজারের সামনের লেখা

ইমাম আল-লাইছ-এর পুত্র শুআইব (রহ.)-এর কবর

হযরত লাইছ ইবনে সা'দ (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

www.maktabatulabrar.com

(৯৪হি./৭১৩ খ্রী.–১৭৫ হি./৭৯১খ্রী.)

হযরত লাইছ ইবনে সা'দ (রহ.) প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তার যুগে তিনি ছিলেন সকলের ইমাম। তিনি ৯৪ হিজরি মোতাবেক ৭১৩ খ্রীস্টাব্দে ক্বলক্বাশানদাহ (قلقشندة) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ক্বলক্বাশানদাহ-কে ক্বরক্বাশানদাহ (قرقشندة)ও বলা হয়। ক্বলক্বাশানদাহ বা ক্বরক্বাশানদাহ কায়রো থেকে ৩৬ কিলোমিটার উত্তরে বৃহত্তর কায়রোর অন্তর্ভুক্ত আল-ক্বা-লইয়ূবিয়্যাহ (القليوبية) গভর্ণরেট (محافظة)-এর একটি গ্রাম।

হযরত লাইছ ইবনে সা'দ (রহ.)-এর বংশ পারস্যের ইস্ফাহান থেকে মিসরে এসেছিল। হযরত লাইছের জন্ম মিসরেই হয়েছিল। মিসরের তাবিয়ী-দের থেকে তিনি ইলম শিক্ষা করেছেন। ১১৩ হিজরিতে ২০ বছর বয়সের সময় হজ্জে গিয়ে হেজাযের উলামায়ে কেরাম থেকেও ইলম লাভ করেন। তারপর মিসরে ফিরে এলে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ফতওয়া প্রদানের কাজ শুরু করেন। তখনকার সাধারণ মানুষসহ শাসক, গভর্ণর ও বিচারকগণ পর্যন্ত তার ফতওয়া অনুসরণ করে চলত। মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদের আমলে তিনি মিসরের বিচারক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। খলীফা আবূ জা'ফর মানসূর মিসরের গভর্ণর হওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

হযরত লাইছ ইবনে সা'দ (রহ.)-এর বিশিষ্ট উস্তাদদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আতা' ইবনে আবী রবাহ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী মুলাইকা, সাঈদ ইবনে আবী সাঈদ আল-মাক্ববূরী, ইবনে শিহাব আয-যুহরী, আবুয যুবায়র আল-মক্কী প্রমুখ। তিনি পঞ্চাশের বেশি তাবিয়ী এবং একশত পঞ্চাশ জন তাবে তাবিয়ীর সাক্ষাত পেয়েছেন।

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত লাইছ ইবনে সা'দ ছিলেন ইমাম। প্রচুর মুখস্থ-শক্তিও ছিল। তার এক শাগরেদ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল হযরত অনেক সময় আপনার যবান থেকে এমনসব হাদীছ শুনতে পাই যা আপনার লিখিত কপিতে নেই। তখন তিনি বলেছিলেন, তোমরা কি মনে কর আমার সিনায় রক্ষিত সব হাদীছ কপিতে লিখে নিয়েছি। বাস্তব কথা হল যত হাদীছ আমার সিনায় রক্ষিত আছে তা যদি সব লিখে নেই তাহলে তা বহন করার জন্য এই সওয়ারী যথেষ্ট হবে না। (تهذيب التهذيب ج/٨ صفحه/٤٦٢)

হযরত লাইছ ইবনে সা'দ (রহ.) ফেকাহ শাস্ত্রেও অনেক উঁচু পর্যায়ের

ব্যক্তি ছিলেন। এমনকি মদীনার ইমাম মালেক (রহ.) থেকেও। কিন্তু ইমাম মালেক (রহ.) এমন সব শাগরেদ পেয়েছেন যাদের দ্বারা তার ইলম ও মযহাব প্রচারিত প্রসারিত হয়েছে, পক্ষান্তরে হযরত লাইছ ইবনে সা'দ (রহ.) তেমন শাগরেদ অনুসারী পাননি। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেছেন,

اللَّيْثُ أَفْقَهُ مِنْ مَالِكٍ إِلاَّ أَنَّ أَصْحَابَه لَمْ يقُوْمُوا بِهِ.

অর্থাৎ, লাইছ ইমাম মালেক থেকে বড় ফকীহ, কিন্তু তার শাগরেদরা তার (ফেকাহ সংরক্ষণের ব্যাপারে) যত্ন নেয়নি।

আল্লাহ তাআলা হযরত লাইছ ইবনে সা'দ (রহ.)কে ধন-দৌলতও অনেক দান করেছিলেন আর তিনিও এগুলো অকাতরে দান-খয়রাত করে দিতেন। এমনকি বছর শেষে তার উপর যাকাতও ফরয হত না। বরং বছর শেষে অনেক সময় দেখা যেত তিনি ঋণী হয়ে পড়তেন। অথচ সেই যুগে হযরতের বার্ষিক আয় ছিল বিশ থেকে পচিশ হাজার দীনার। (سير أعلام النبلاء ج/٨ صفحہ/١٥٢)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লাইছ ইবনে সা'দ-এর জীবনী লিখেছেন, যার নাম 'আর-রহমাতুল গাইছিইয়্যাহ ফিত-তারজামাতিল লাইছিয়্যাহ (الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية)।

১৭৫ হিজরি মোতাবেক ৭৯১ খ্রিস্টাব্দে ইমাম মালেকের ৪ বছর পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উঁচু মাকাম দান করেন। আমীন!

জামেয়ে আম্‌র ইবনুল আস (جامع عمرو بن العاص) গমন

মসজিদুল ইমাম আল লাইছ এবং ইমাম লাইছ ও তার পুত্রের কবর জিয়ারত করার পর আমরা হযরত আম্‌র ইবনুল আস (রা.)-এর মসজিদে অর্থাৎ, জামেয়ে আম্‌র ইবনুল আস (جامع عمرو بن العاص) কায়রোবাসীদের উচ্চারণে গামে' আম্‌র ইবনুল আস যিয়ারতে গেলাম। এটি ফুছতাত (فسطاط) এলাকার অন্তর্ভুক্ত। বরং এটি হচ্ছে ফুছতাত এলাকার মূল। এই মসজিদের এলাকা এবং এর থেকে কিছু উত্তর ও দক্ষিণ এবং কিছু পূর্ব পর্যন্ত এখনও ফুছতাত এলাকা। এ মসজিদে ইশার নামাজ জামাতে আদায় করলাম। মিসরী লাহজায় কেরাত শ্রবণ করলাম। খুবই মজাদার তেলাওয়াত।

এ মসজিদটি শুধু মিসর নয় গোটা আফ্রিকা মহাদেশের প্রাচীনতম

www.maktabatulabrar.com

মসজিদ। হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর খেলাফত আমলে যখন হযরত আম্‌র ইবনুল আস (রা.)-এর নেতৃত্বে মিসর বিজিত হয়, তখন সর্বপ্রথম হযরত আম্‌র ইবনুল আস (রা.) এখানে কোন দূর্গ নয় বরং একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করার ইচ্ছা করেন। তখন এখানে ছিল আঙ্গুরের বাগান। হযরত আম্‌র ইবনুল আস (রা.)–এর নির্দেশে মসজিদের জন্য স্থানটুকু প্রস্তুত করা হয়। ২০ হিজরি মোতাবেক ৬৪১ হিজরিতে মসজিদটির ভিত রাখা হয়। ৮০ জন সাহাবী মিলে চিন্তা-ভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক মসজিদের কেবলা নির্ধারণ করেন। যাদের মধ্যে হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা.), হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.), হযরত আবুদ্দারদা (রা.) এবং হযরত আবু যর গিফারী (রা.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মসজিদের সর্বপ্রথম ইমাম ছিলেন স্বয়ং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)। মুআজ্জিন ছিলেন হযরত আবু মুসলিম ইয়াফিয়ী (রা.)।

পরবর্তীতে হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত মিসরের শাসক হযরত মাসলামাহ ইবনে মাখলাদ (রা.) এ মসজিদটিকে আরও প্রশস্ত করেন। তিনি এর মিনারা তৈরি করেন। বলা হয় মিসরের মসজিদের সাথে মিনারা বানানোর সূচনা তিনিই করেন। ৭৭ হিজরিতে আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ান মসজিদটির পূনঃনির্মাণ করেন। তারপর ওলীদ ইবনে আব্দুল মালিকের নির্দেশে মসজিদটির পূনঃনির্মাণ করা হয় এবং অনেক কারুকার্য করা হয়। পিলারগুলোকে সোনার পানি দ্বারা খচিত করা হয়। (حسن المحاضرة للسيوطي ج/١ صفحہ/٧٣)

শুরুর দিকে এই মসজিদে বিচারকার্যও চালানো হত। এক সময় এখানে দ্বীনী তালীমের দরসও হত। আল্লামা ইবনে সাইগ হানাফী বলেছেন, ৭৪৯ হিজরির পূর্বে আমি এ মসজিদে ৪০ এর অধিক ইলমী হালকা গণনা করেছি। (حسن المحاضرة للسيوطي ج/٢ صفحہ/١٥٢) বস্তুত জামেয়া আযহারের পূর্বেই এটি ছিল জামেয়া। এমনকি এটি তিউনিসে অবস্থিত জামেয়াতুয্ যাইতূনাহ (جامعة الزيتونة) ও মরক্কোর ফেজ (فاس/Fes) শহরে অবস্থিত জামেয়াতুল ক্বারাউয়্যীন (جامعة القرويين)-এর আগ থেকে দ্বীনী দরসগাহ।

মসজিদটি বর্তমানে ১৩,২০০ বর্গমিটার বিস্তৃত বিশাল মসজিদ। এতে ৩৫০টি পিলার রয়েছে।

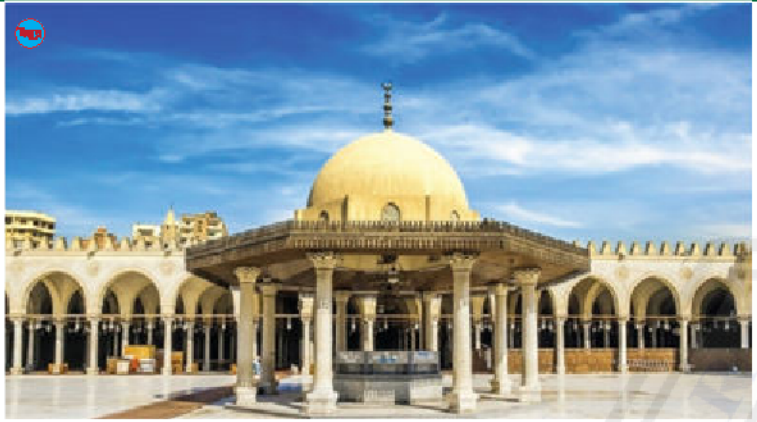

জামেয়ে আম্‌র ইবনুল আস-এর মধ্যভাগ

জামেয়ে আম্‌র ইবনুল আস বার থেকে

জাবালুল মুকাত্তাম (جبل المقطم) দর্শন

তারপর মেজবানের বাসায় ফিরে আসার পথে জাবালুল মুকাত্তাম (কায়রোবাসীদের উচ্চারণে গাবালুল মুআত্তাম) দর্শন করলাম। এবার ছাড়াও আরও বহুবার পাহাড়টির বিভিন্ন পাশ দিয়ে যাতায়াতের সময় পাহাড়টি দেখা হয়েছে। পুরাতন কায়রোর দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বিশাল এলাকা জুড়ে জাবালুল মুকাত্তাম (المقطم/El Mokatam)-এর অবস্থান। এই পাহাড়েরই পশ্চিম প্রান্তে সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর দূর্গ, যে সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা আসছে।

পূর্বেও একস্থানে বলা হয়েছে যে, এক রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায়, জাবাতুল

www.maktabatulabrar.com

মুকাত্তাম একটি পবিত্র পাহাড়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এই পাহাড়ে ইবাদত করতেন।[১] একটি ঐতিহাসিক বর্ণনায় হযরত লাইছ ইবনে সাআদ (রহ.) থেকে উল্লেখ এসেছে যে, হযরত আম্‌র ইবনুল আস (রা.) যখন এই অঞ্চল জয় করেন তখন মিসরের সাবেক বাদশাহ মুকাওকিস হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর নিকট ৭০ হাজার দীনারের বিনিময়ে এই পাহাড়টি ক্রয় করার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন, আমাদের কিতাবে এই পাহাড়ের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আমাদের কিতাবে আরও লেখা হয়– এই পাহাড়ে জান্নাতের গাছ উদ্গত হবে। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এ মর্মে পরামর্শ চেয়ে পত্র লেখেন। হযরত ওমর (রা.) জবাব পাঠান– মুসলমানরা জান্নাতের বেশি হকদার। অতএব এখানে মুসলমানদের কবরস্তান বানাও। সেমতে এলাকাটিকে কবরস্তান বানানো হয়।[২]

জাবালুল মুকাত্তাম

১৪/৪/১৯ রবিবার

কায়রোতে সুবহে সাদেকের পূর্বেই ফজরের আযান

ফজরের আযান শুনেই খটকার সম্মুখীন হলাম। ফজরের আযান হল সূর্যোদয়ের দেড় ঘণ্টারও আগে। অর্থাৎ সুবহে সাদেক হওয়ার ১২/১৪ মিনিট পূর্বে। এত পূর্বে সুবহে সাদেক হওয়ার মত কারও নেই। আমি বিষয়টা নিয়ে আমার মেজবান ও জামেয়া আযহারে মাস্টার্স করছে এমন একজন ছাত্রের

১. الخطط المقريزية ج/٢ صفح/٢٢٠

২. الخطط المقريزية وحسن المحاضرة. قال تقي العثماني : إسناده ليس بالقوي

সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম জামেয়া আযহারের হাইয়াতু কিবারিল

উলামার সদস্য, ফিকহে মুকারনের বিশেষজ্ঞ ডক্টর আহমদ তাহা রইয়্যানও এ বিষয়টা নিয়ে খুব সোচ্চার। তিনি যে মসজিদে নামায পড়ান সেখানে ১৫ মিনিট পরে ফজরের আযান দেওয়ান। আমার মেজবান জানালো তারাও রমজান মাসে সাহরির সময় আজান হওয়ার পরও ১০/১২ মিনিট পর পর্যন্ত পানাহার জারি রাখেন।

সালাহ উদ্দীন আইয়ূবির দূর্গ দর্শন

জোহরের পূর্বে সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবির কেল্লা (قلعة صلاح الدين الأيوبي/ Salah El Din Al Ayouby Citadel) দর্শনে গেলাম। কেল্লার মসজিদে মুহাম্মাদ আলীতে জোহরের নামাজ আদায় করলাম। বিশাল মসজিদ হওয়া সত্ত্বেও এখানে নিয়মিত জামাত হয় না।

'সালাহ উদ্দীন আইয়ূবির দূর্গ' নামে ৩ দেশে ৩টি দূর্গ রয়েছে। একটি রয়েছে সিরিয়ায়, একটি জর্দানে এবং আরেকটি মিসরের কায়রোতে। তবে এই ৩টির মধ্যে একমাত্র কায়রোরটিই সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবির নির্দেশে নির্মিত হয়েছে।

কৌশলগত কারণেই সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী কায়রোর এই স্থানে দূর্গ নির্মাণ করেছিলেন। এতে করে তখনকার প্রধান দুটো এলাকা ক্বারাফা ও ফুছতাত দূর্গের পাদদেশে থাকায় এলাকা দুটোর রক্ষা কাজ সহজ হয়। এ দূর্গটি তার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া আউয়ূবী শাসনামল ও মামলূক শাসনামল-এর বিভিন্ন ঘটনা এবং ১৭৯৮ সালে মিসরের উপর ফরাসী আক্রমণের সময়কার ঘটনার সাক্ষী।

দূর্গটি জাবালুল মুকাত্তাম-এর পশ্চিম প্রান্তে নির্মিত। এই দূর্গের দক্ষিণেই ঐতিহাসিক ক্বারাফা ও ফুছতাত এলাকা, যে সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী (মৃত: ৪ মার্চ ১১৯৩) ৫৭২ হিজরি মোতাবেক ১১৭৬ খ্রিস্টাব্দে এই দূর্গ নির্মাণ করেন এবং এটিকে নিজের বাসভবন হিসেবে নির্ধারণ করেন। দূর্গটি একটি পাহাড়ের উপর (জাবালুল মুকাত্তামের উপর) নির্মিত বিধায় ইতিহাসে 'কিলআতুল জাবাল' (قلعة الجبل) তথা পাহাড়ের দূর্গ নামেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল যাবত এ দূর্গটি রাজকার্য পরিচালনার ভবন (دار الحكومة) হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। তখন দূর্গের মধ্যেই সরকারি সব দফতর ছিল। পরবর্তীতে অটোমান মিলিটারি কমান্ডার ও আধুনিক মিসরের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত মুহাম্মাদ আলী পাশা (মৃত: ২ আগস্ট ১৮৪৯) দূর্গে একটি শানদার মসজিদ ও আরও বিভিন্ন

www.maktabatulabrar.com

ভবন নির্মাণ করেন। দূর্গটিকে তিনি অত্যন্ত পরিপাটি করে তোলেন। তখন থেকে দূর্গটি সেনা-ছাওনি হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এ থেকে দূর্গটিকে মুহাম্মাদ আলীর দূর্গও (قلعة محمد علي) বলা হয়। বর্তমানে এটি শুধু পর্যটকদের পরিদর্শনের জন্যই খোলা রাখা হয়েছে।

দূর্গের মধ্যে মসজিদে আলী, মসজিদে মুহাম্মাদ বিন ক্বালাউন, পুলিশ মিউজিয়াম (متحف الشرطة), ঐতিহাসিক জিনিসপত্রের মিউজিয়াম (متحف المصبوطات الأثرية), যুদ্ধ সামগ্রীর মিউজিয়াম (المتحف الحربي) ইত্যাদি বিভিন্ন দর্শন স্পট রয়েছে। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন মিউজিয়ামগুলোর সংস্কার কাজ চলছিল বিধায় কোনটিরই ভেতরে প্রবেশ করতে পারিনি।

একটি ফালতু মজার ব্যাপার

সালাহ উদ্দীন আইয়ূবির দূর্গের মধ্যে অনেক কিছুই তো দেখার আছে, যেগুলোর উল্লেখ পূর্বে করা হল। সবগুলোই রসকষহীন। তবে একটা মজার বিষয় রয়েছে। তা হল ফেরআউন, সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী ও মুহাম্মাদ আলী পাশা সেজে ছবি তোলার দৃশ্য। দূর্গের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন জায়গায় ফেরআউন, সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী ও মুহাম্মাদ আলী পাশা সেজে ছবি তোলার এটা সেটা ব্যবস্থা নিয়ে অনেকে প্রচুর পয়সা লুফে নেয়ার ভাল ধান্ধাই করছে। এসব জায়গায় কৌতুহলী মানুষের ভিড়ও অনেক। কেউ ফেরআউন সেজে ছবি তুলছে, কেউ সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী সেজে ছবি তুলছে, কেউ মুহাম্মাদ আলী পাশা সেজে ছবি তুলছে। ফেরআউন, সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী ও মুহাম্মাদ আলীর পোশাক কেমন ছিল, কোন্ ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ও ঢাল তলোয়ার নিয়ে তারা যুদ্ধ করত- এগুলোর মধ্যে যার যেভাবে পছন্দ সেভাবে সেজে বিভিন্ন এ্যাঙ্গেলে পোচ দিয়ে ছবি তুলছে। আমার সঙ্গে একজন ছিলেন –যার ছেলেমিপনা এখনও পুরো বিদায় নেয়নি– তিনিও সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী সেজে ছবি তোলার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। আগে তিনি বুঝতে পারেননি, বহু এ্যাঙ্গেলে পোচ দিয়ে মজা করে বহু ছবি তুলেছেন। কোনটাতে যেন সালাউদ্দীন ঢাল তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করছেন, কোনটাতে তলোয়ারের খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বের করছেন, কোনটাতে তলোয়ারের খাপের মধ্যে তলোয়ার ঢোকাচ্ছেন ইত্যাদি। পরে যখন তারা গলাকাটা পয়সা দাবি করেছে, তখন তো তার চোখ ছানাবড়া। তখন তার অবস্থা হয়েছিল ছেড়ে দে মা কেন্দে বাঁচি। কোনো রকমে অনুনয়-বিনয় করে তাদেরকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে সব ছবি না নিয়ে কয়েকটি ছবি নিয়ে শুধু সেগুলোর পয়সা দিয়েই রক্ষা

পেয়েছেন। এখন ছবি তোলার কারণে নাউযু বিল্লাহ বলা হবে নাকি অধিক গলাকাটা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল-হামদু লিল্লাহ বলা হবে পাঠকবর্গই তা নির্ধারণ করুন।

সালাহ উদ্দীন আইয়ূবির দূর্গ

সালাহ উদ্দীন আইয়ূবির দূর্গে মসজিদে মুহাম্মাদ আলী

www.maktabatulabrar.com

সালাহ উদ্দীন আইয়ূবির দূর্গ দূর থেকে

সাইয়্যেদা আয়েশা মসজিদে গমন

সালাহ উদ্দীন আইয়ূবির কেল্লা দর্শনের পর সাইয়্যেদা আয়েশা মসজিদে গেলাম। কেল্লা থেকে বের হয়ে কিছু পশ্চিমে আস-সাইয়্যেদা আয়েশা এলাকা। এই এলাকার চৌরাস্তা ও গাড়ি স্ট্যান্ডে একটি মসজিদের নাম সাইয়্যেদা আয়েশা মসজিদ। এই আয়েশা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নন, বরং ইনি হচ্ছেন হযরত জাফর সাদেকের কন্যা ও মূসা কাজেমের ভগ্নি আয়েশা। জাফর সাদেক ও মূসা কাজেমের পরিচয় হল– হযরত হুসাইন (রা.)-এর পুত্র আলী ওরফে যাইনুল আবিদীন, তার পুত্র মুহাম্মাদ বাকের, তার পুত্র জাফর সাদেক, তার পুত্র মূসা কাজেম। সাইয়্যেদা আয়েশা অত্যন্ত নেককার নারী ছিলেন। ১৪৫ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার নামেই মসজিদটির যেমন নামকরণ হয়েছে এলাকারও নামকরণ হয়েছে আস-সাইয়্যেদা আয়েশা (السيدة عائشة)। মসজিদের এক কোণায় সাইয়্যেদা আয়েশার কবর রয়েছে। তার কবর যিয়ারত করলাম। কবরের পাশে একটি বোর্ডে তার সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখা আছে। তাতে ব্যতিক্রমী একটা কথা দেখলাম। তা হল– তিনি আল্লাহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে দুআর সময় বলতেন, হে আল্লাহ! যদি আমাকে জাহান্নামে দাও, তাহলে তাওহীদ হাতে নিয়ে জাহান্নামের সবার কাছে গিয়ে গিয়ে বলব, আমি আল্লাহর তাওহীদ গ্রহণ করেছিলাম আর তিনি আমাকে শাস্তি দিয়েছেন!

মসজিদে সাইয়্যেদা আয়েশা

মিসরের ঐতিহ্যবাহী খাবার 'মুখ্ কিব্দা'

সালাহ উদ্দীন আইয়ূবির কেল্লা দর্শনের পর দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছিল। ক্ষুদাও পেয়েছিল। সঙ্গী মাওলানা আব্দুল হালীম জানালেন মিসরের একটা ঐতিহ্যবাহী খাবার আছে, তা-ই খাওয়া যাক। তার কথা মোতাবেক সাইয়্যেদা আয়েশা মসজিদের পাশে একটা হোটেলে মিসরের ঐতিহ্যবাহী খাবার 'মুখ্ কিব্দা' খেলাম। মুখ (مخ) অর্থ মগজ আর কিব্দা (كبدة) অর্থ কলিজা। বেশ বড় বড় পিচ করে মগজ কেটে ডুবো তেলে ভাজা। আমাদের দেশে টীকা কাবাবের উপর যেমন টোস্টের গুড়ো মেশানো থাকে তেমনি মগজের টুকরোগুলোর উপর গুড়ো গুড়ো কী যেন একটা ছড়ানো ছিল। আর রুটির লম্বা লম্বা পাতলা পিচের মত করে কলিজা কেটে সেগুলো ভাজি করা। সঙ্গে নানান রকম সালাদ ও কাচা সবজি পাতা ইত্যাদি যা সালাদের মত খাওয়া হয়। যেগুলোর কোনটা খেতে পারলাম কোনটা পারলাম না। যাহোক সব মিলিয়ে এক নতুন ধরনের স্বাদে মুখ কিব্দা-র আহার সম্পন্ন করলাম। ভেবেছিলাম বড় অংকের বিল হবে, কিন্তু না, মিসরে খাদ্য-খাবার, গাড়ি ভাড়া, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের মূল্য ইত্যাদি খুবই কম। মাল্টার কেজি ২/৩ পাউন্ড অর্থাৎ, আমাদের দেশের ১০/১৫ টাকা মাত্র। পাইকারি কিনলে ১

www.maktabatulabrar.com

পাউন্ডেই পাওয়া যায়। শাম্মাম ইত্যাদিও প্রায় পানির দামে। আমাদের ঢাকায় কোন টেক্সিক্যাবে যে পথ পাড়ি দিতে ৭/৮ শ টাকা লাগে, কায়রোতে সে পথ আমাদের টাকার হিসেবে ৩/৪ শ টাকার মধ্যেই পাড়ি দেয়া যায়। আবার কায়রোয় ট্যাক্সিতে একটা সুবিধে হল ট্যাক্সিতে মিটারের ব্যবস্থা থাকলেও পাবলিক মিটারে নয় চুক্তিতেই চড়তে আগ্রহী বেশি, কারণ চুক্তিতে মিটারের চেয়ে কমে যাওয়া যায়। ঠিক আমাদের ঢাকার উল্টো অবস্থা।

জাদুঘর ও ফেরআউনদের মমি দর্শন

তারপর ৪.৫০ কিলোমিটার আন্ডারগ্রাউন্ড পথ (নাফাক আল উবরা/نفق الاوبرا) দিয়ে ঐতিহাসিক তাহরীর স্কয়ারে (at tahrir sq./ميدان التحرير)গমন করলাম। এটি আনওয়ার আস-সাদাত (أنور السادات) এলাকায়। এখানেই মিসর জাদুঘর (egyptian museum) অবস্থিত। বিদেশীদের জন্য প্রবেশ টিকিটের মূল্য ১৬০ মিসরীয় পাউন্ড। জাদুঘরকে সামনে রেখে দাঁড়ালে দোতলায় ডান দিকের কোনায় একটি কক্ষে রাজ রাজড়াদের মমি। তাই এই কক্ষের নাম দেয়া হয়েছে قاعة المومياوات الملكية /royal moumes room। তার জন্য আলাদা টিকিট মূল্য ১৮০ পাউন্ড। সর্বত্রই দেখতে পেলাম বিদেশী-দের থেকে কত বেশি পাউন্ড খসানো যায় এ ব্যাপারে মিসরীয় সরকার বেশ নিষ্ঠাবান। পৃথিবীর অনেক দেশই বোধ হয় বিদেশীদের থেকে অধিক অর্থ খসানোর ব্যাপারে নিষ্ঠাবান। একসময় আমাদের লালবাগ কেল্লায়ও দেখেছি দেশীদের জন্য প্রবেশমূল্য ২০ টাকা আর বিদেশীদের জন্য ১০০ টাকা।

জাদুঘরে ঢুকে দেখলাম এ তো জাদুঘর নয় এ তো মূর্তি ও ভাস্কর্যের এক বিশাল রাজ্য। প্রাচীন যুগের লক্ষাধিক মূর্তি ও ভাস্কর্যে ঠাসা পুরো জাদুঘর। কিছু মমিও রয়েছে। প্রাচীন ফারাওদের ব্যবহার্য খাট, পালঙ্ক, সিন্দুক, চেয়ারও রয়েছে। সোনার তার দিয়ে তৈরি একটা খাটও দেখলাম। এগুলো দেখে মনের দৃষ্টি চলে গেল ফারাওদের বিলাসী জীবনের দিকে। মিসর জাদুঘরে মূর্তি, ভাস্কর্য, বিভিন্ন পাথরের ফলক, মমি ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে দেড় লক্ষের চেয়ে বেশি আইটেম রয়েছে। এর মধ্যে ফারাওদের যুগের জিনিসপত্রই বেশি। সব আইটেম সন ও তারিখের ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে।

হরেক রকম মূর্তি ও ভাস্কর্য। কিন্তু কোনটি দেখতেই প্রবৃত্তি জাগছিল না। নজর দিলেই মনে হচ্ছিল কলব অন্ধকার হয়ে আসছে। আবার এতোগুলো পয়সার শ্রাদ্ধ করে ঢুকেছি। অগত্যা লামছাম এদিক ওদিক কিছু দৃষ্টি দিয়ে অবশেষে চলে গেলাম রয়্যাল মমিজ রুমে ফেরআউনদের মমিগুলো দেখতে। এখানে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সময়কার ফেরআউনের মমির একটা ব্যাপার থাকায় দেখার কিছুটা কৌতুহল ছিল। রয়্যাল মমিজ রুমে রয়েছে রেমেসিস-২, তার পুত্র মেরনেফতাহ, থুতমোস-২, থুতমোস-৩ প্রমুখদের মমি। রেমেসিস-২ এর মমি একটু গভীরভাবে দেখলাম। কারণ অনেক বিশ্লেষকের মতে এ-ই হল হযরত মূসা আ.-এর সময়কার ফেরআউ-ন। যে প্রক্রিয়ায় মমি করা হয়েছে তাতে দেহের রক্ত রস সব শুকিয়ে শরীর এমনভাবে চুপসে এবং কালচে হয়ে গেছে যে, দেখতে কেমন লাগে, কীভাবে তার উপমা টানব ভাবছিলাম। অবশেষে মেজবান আখতারুজ্জামান একটা চমৎককার উপমা টেনে বললেন, দেখতে একেবারে 'চাড়ালের মত'। রেমেসিস-২-এর হস্তদ্বয়ের কয়েকটা আঙ্গুল ও হস্তদ্বয়ের বেশ কিছু অংশে টেপ জাতীয় জিনিস লাগানো দেখলাম। সম্ভবত সেসব জায়গা থেকে শরীরের অংশ খসে যেতে শুরু করেছে। রেমেসিস-২-এর পায়ের কাছেই তার পুত্র মেরনেফতাহ-এর মমি। দুই মমির মধ্যে দেখতে পার্থক্য হল রেমেসিস-২ এর বুকের উপর বাম হাত লাগোয়া অবস্থায় এবং ডান হাত কিছুটা উঁচু অবস্থায় রয়েছে। আর মেরনেফতাহের উভয় হাত বুকের সাথে লাগোয়া অবস্থায় রয়েছে। হযরত মূসা আলাহিস সালামের সময়ের ফেরআউন কে তা নিয়ে অনেক মত থাকলেও রেমেসিস-২ এই মতটিই অধিকাংশ বিশ্লেষকের মত এবং অধিকতর দলীল সমৃদ্ধ মত। (এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি।) রেমেসিস-২ এর পুত্র মেরনেফতাহ, থুতমোস-১, থুতমোস-২, থুতমোস-৩ এসব মতও রয়েছে। অর্থাৎ, মূসা আলাইহিস সালামের যুগের ফেরআউন কে সে সম্বন্ধে যাদের ব্যাপারে মতামত রয়েছে সেই রেমেসিস-২, তার পুত্র মেরনেফতাহ, থুতমোস-১, থুতমোস-২, থুতমোস-৩ প্রায় সকলের মমিই এখানে রয়েছে। এ মমিগুলোর দৈর্ঘ আমাদের দেশের মধ্যম লম্বা মানুষের মত। তাই মনে হল ফেরআউন সম্বন্ধে কিছু গাজাখোরী তথ্য পেশ করা ওয়ায়েজদের কথা, যারা বলে ফেরআউন অনেক লম্বা ছিল। এ রকম ওয়ায়েজদের কেউ কেউ বলে থাকে, "হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ছিলেন ১০ হাত লম্বা, আর তিনি লাফ দিয়ে ১০ হাত উপরে উঠতে পারতেন। তার লাঠিও ছিল ১০ হাত লম্বা। এই ১০ হাত লম্বা মূসা আলাইহিস সালাম লাফ

www.maktabatulabrar.com

দিয়ে ১০ হাত উপরে উঠে তার ১০ হাত লম্বা লাঠি দিয়ে ফেরআউনকে এক পিটানি দিল আর সেই পিটানি গিয়ে লাগল ফেরআউনের হাঁটুতে। ফেরআউন তাহলে কত লম্বা ছিল! বলুন, সুবহাল্লাহ!" কী গাজাখোরী বর্ণনা!

মিসর জাদুঘর

হযরত মূসা (আ.)-এর ফেরআউন কে ছিল?

প্রাচীন মিসরের শাসকদের উপাধি ছিল ফেরআউন। খৃস্টপূর্ব ৩১৫০ সন থেকেই এই উপাধির ব্যবহার শুরু হয়। এই ধারাবাহিকতায় হযরত মূসা (আ.)-এর জমানার শাসককেও ফেরআউন (فرعون) বলা হত। ফেরআউনকে ইংরেজিতে বলা হয় Pharaoh (ফারাও)।

হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরআউন কে ছিল তা নিয়ে গবেষকদের বিভিন্ন মত রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে বিশেষ কয়েকটি মত ও সে সম্বন্ধে পর্যালোচনা পেশ করা হল।

ফেরআউন কে ছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ ৫টি মত

১. আমেরিকান গবেষক পাউল বুর্ক (Paul Burke মৃত ২০০৯) তার দ্যা ওয়ার্ল্ড অব মুসেস (the world of Moses) নামক গ্রন্থে যা বলেছেন তার সারকথা হল হযরত মূসা (আ.) তিন ফেরআউনের যুগ পেয়েছেন। থুতমোস-১ (تحتمس / Thutmose মৃত: খ্রীস্টপূর্ব ১৪৯৩), যে বনী ইসরাঈলকে নির্যাতন করেছিন। তারপর থুতমোস-২ (মৃত: খ্রীস্টপূর্ব ১৪৭৯), যে মূসা (আ.)কে শৈশবে লালন-পালন করেছিল। তারপর থুতমোস-৩ (মৃত: খ্রীস্টপূর্ব ১৪৮১), যার সময়ে মূসা আলাইহিস সালাম নবুয়ত লাভ করে তার নিকট এসেছিলেন।

২. নাবলুসে জন্মগ্রহণকারী ও দামেস্কে মৃত্যু বরণকারী (মৃত ১৯৮৪) মুসলিম গবেষক মুহাম্মাদ ইযযাত দারওয়াযা (محمد عزة دروزه/Izzat Darwaza) তার 'তারীখু বনী ইসরাঈলা মিন আস্ফারিহিম' (تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم) গ্রন্থে যা বলেছেন, তার সারকথা হল হযরত মূসা (আ.)-এর সময়কার ফেরআউন হল র‍্যামেসিস–২ এর পুত্র মেরনেফতাহ-১ (مرنبتاح /Merneptah) যার শাসনকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১২১৩ থেকে ১২০৩ পর্যন্ত। অথবা তার পুত্র মেরনেফতাহ–২। অথবা মেরনেফতাহ–১ ও মেরনেফতাহ–২ উভয়ে। মেরনেফতাহকে মেরেনফাতাহ (Mer-enptah) এবং মেনেফতাহ (منفتاح/ Meneptah)ও বলা হয়। মিসরের শিলালিপি বিশেষজ্ঞ আহমদ ইউসুফ আফিন্দী-র মতেও হযরত মূসা (আ.)-এর সময়কার ফেরআউন হল র‍্যামেসিস–২ এর পুত্র মেরনেফতাহ।

৩. হযরত হিফজুর রহমান সিওহারবী (রহ.) কাসাসুল কুরআন গ্রন্থে যে মতটি গ্রহণ করেছেন তাহল– হযরত মূসা (আ.) লালিত-পালিত হয়েছেন, র‍্যামেসিস-২ এর ঘরে। আর যে ফেরআউনকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন এবং যার শাসনামলে তিনি বনী ইসরাঈলসহ মিসর ত্যাগ করেছেন ও যে ফেরআউন নিমজ্জিত হয়েছিল সে হল র‍্যামেসিস–২ এর পুত্র মেনেফতাহ (মেরনেফতাহ)।

৪. মিসরীয় ইসলামিক স্কলার আহমদ সুবহী মানসূর (জন্ম ১৯৪৯) তার من هو فرعون موسى (নেটে দ্রষ্টব্য) প্রবন্ধে বলেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর সময়কার ফেরআউন র‍্যামেসিস–৩ -এর স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী কোন র‍্যামেসিস। র‍্যামেসিস–৩ এর পর আরও ৮জন সম্রাট অতিবাহিত হয়েছে, যাদের প্রত্যেকের উপাধি ছিল র‍্যামেসিস। তাদের প্রত্যেকেই ফেরআউন।

৫. মিসরীয় গবেষক ফুআদ বাসিলী (فؤاد باسيلي/ Fouad Basily) তার 'হায়াতে মূসা' (حياة موسى) গ্রন্থে বিভিন্ন মত উল্লেখ করার পর এদিকেই ঝোঁক প্রকাশ করেছেন যে, হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরআউন হল র‍্যামেসিস–২ (Ramesses)। র‍্যামেসিসকে আরবিতে رمسيس ও رعمسيس দুইভাবে লেখা হয়। যার শাসকনকাল ছিল ১২৭৯ থেকে ১২১৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। মিসরীয় লেখক আব্দুর রাজ্জাক জুওয়াইলী (জন্ম: ১৯৫০)ও এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মিসরের দারুল ইফতা থেকে প্রকাশিত বিবরণেও এই মতকে অধিকতর প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

এতক্ষণ হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরআউন কে ছিল সে সম্বন্ধে ৫টি মতের উল্লেখ করা হল। এবার আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করব যে, এর মধ্যে কোন্ মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কয়েকটি কুরআনী উপাত্ত

এখন আমরা উপরোক্ত ৫টি মতের ব্যাপারে পর্যালোচনা পেশ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করব যে, হযরত মূসা (আ.)-এর ফেরআউন কে ছিল। পর্যালোচনা পেশ ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করার পূর্বে আমরা আলোচনা করে নিতে চাই কুরআনে কারীমের বর্ণনা থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর ফেরআউন সম্বন্ধে কি কি মৌলিক উপাত্ত পাওয়া যায় যা থেকে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। উল্লেখ্য, অনেকেই কুরআনে কারীমের উপাত্তকে বাদ দিয়ে শুধু মিসরের প্রাচীন ইতিহাস ও বিভিন্ন শিলালিপি থেকে উদ্ধারকৃত তথ্য থেকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন, যেমনটা করেছেন আমেরিকার গবেষক পাউল বুর্ক। কুরআনে বর্ণিত ফেরআউন কে তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে কুরআনের বর্ণনাকেই উপেক্ষা করে যাওয়া কত বড় ভুল তা তো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। নিঃসন্দেহে প্রাচীন শিলালিপি থেকে বহু তথ্য উদ্ধার হয়েছে, কিন্তু সব তথ্য আদৌ নয়। অনেকে শুধু তাওরাতের বর্ণনার উপর নির্ভর করেছেন, কিন্তু তাও যথাযথ নয়। কুরআনে কারীমে বর্ণিত তথ্য-উপাত্তকে অবশ্যই সামনে রাখতে হবে। এবং কুরআন যেহেতু তথ্য-উপাত্তের সবচেয়ে নির্ভর আকর, তাই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে কুরআনে কারীমে বর্ণিত তথ্য-উপাত্তেই সর্বাধিক নির্ভরতা রাখতে হবে। সেমতে আমরা হযরত মূসা (আ.)-এর ফেরআউন কে ছিল এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য এ বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি উপাত্ত সামনে আনতে পারি।

উপাত্ত–১

যে ফেরআউন হযরত মূসা (আ.)কে লালন-পালন করেছিল তার কাছেই তিনি দাওয়াত পেশ করেছিলেন। যে লালন-পালন করেছিল আর যার কাছে দাওয়াত পেশ করা হয়েছিল তারা দু'জন নয় বরং একজন। কুরআনে কারীমে সূরা শুআরায় ইরশাদ হয়েছে,

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٧) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (١٨)

অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা ফেরাউনের নিকট যাও এবং বল, আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রসূল। (১৬) যাতে তুমি বনী-ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে যেতে

দাও। (১৭) ফেরআউন বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? আর তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। (১৮)

উপাত্ত–২

যে ফেরআউনকে হযরত মূসা (আ.) দাওয়াত পেশ করেছিলেন সে-ই নিমজ্জিত হয়েছিল। কুরআনে কারীমে সূরা ক্বাসাসে ইরশাদ হয়েছে,

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (٣٦) وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٣٧) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٣٨) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (٣٩) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (٤٠)

অর্থাৎ, অতঃপর যখন মূসা তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে এল, তখন তারা বলল, এটা তো আর কিছু নয় কেবল বানোয়াট যাদু। আর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগে কখনও এরূপ ব্যাপার শুনিনি। (৩৬) আর মূসা বলল, আমার প্রতিপালক সে ব্যক্তি সম্পর্কে সম্যক অবগত, যে তাঁর পক্ষ থেকে হেদায়েত নিয়ে এসেছে এবং যার জন্য থাকবে আখেরাতের শুভ পরিণাম। নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হবে না। (৩৭) আর ফেরআউন বলল, হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য আছে বলে জানি না। হে হামান! তুমি আমার জন্য মাটি (ইট) পোড়াও। অতঃপর আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। যাতে আমি মূসার মা'বূদকে মাথা উঁচিয়ে দেখতে পারি। আর আমি তো তাকে একজন মিথ্যাবাদী মনে করি। (৩৮) আর সে (ফেরআউন) ও তার বহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল এবং তারা ধারণা করেছিল যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না। (৩৯) সুতরাং আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে নদীতে নিক্ষেপ করলাম। অতএব, দেখ জালেমদের পরিণাম কেমন হল। (৪০)

উপাত্ত–৩

যে ফেরআউনকে হযরত মূসা (আ.) দাওয়াত পেশ করেছিলেন সে-ই বনী ইসরাঈলকে নির্যাতন করেছিল এবং বনী ইসরাঈলকে গোলাম-বাঁদী বানিয়ে রেখেছিল। কুরআনে কারীমে সূরা শুআরায় ইরশাদ হয়েছে,

www.maktabatulabrar.com

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٧) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (١٨) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (١٩) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (٢٠) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٢١) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (٢٢)

অর্থাৎ, অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা ফেরাউনের নিকট যাও এবং বল, আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রসূল। (১৬) যাতে তুমি বনী-ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে যেতে দাও। (১৭) ফেরআউন বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? আর তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। (১৮) এবং তুমি তোমার সেই কাণ্ড যা করবার করেছ, তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ। (১৯) সে (মূসা) বলল, আমি সে কাজটা করেছি এমন অবস্থায় যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ। (২০) অতঃপর যখন আমার ভয় হল, তখন আমি তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম, এরপর আমার রব আমাকে প্রজ্ঞা দান করলেন এবং আমাকে রসূলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। (২১) আর ঐ লালন-পালন একটি নেয়ামত যার খোঁটা তুমি দিচ্ছ। আসলে তা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাস বানিয়ে রেখেছ। (২২)

উপাত্ত–৪

যে ফেরআউনকে হযরত মূসা (আ.) দাওয়াত পেশ করেছিলেন, যে বনী ইসরাঈলকে নির্যাতন করেছিল, যে বনী ইসরাঈলকে গোলাম-বাঁদী বানিয়ে রেখেছিল, সে-ই নিমজ্জিত হয়েছিল। পূর্বের বর্ণনা ধারায়ই (সূরা শুআরায়) পরবর্তীতে বলা হয়েছে, দাওয়াতের পর জাদুকরদের সঙ্গে মোকাবেলা হল, যাদুকরগণ হেরে গেল। তারপর বলা হয়েছে,

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٧) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٥٨) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (٥٩) فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (٦٠) فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (٦١) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٦٢) فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (٦٣) وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ (٦٤) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (٦٥) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (٦٦)

অর্থাৎ, অবশেষে আমি তাদেরকে (ফেরআউনী সম্প্রদায়কে) বাগ-বাগিচা, ও ঝর্ণাসমূহ থেকে বের করে আনলাম। (৫৭) এবং ধন-ভাণ্ডার ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান (উত্তম প্রাসাদ) থেকেও। (৫৮) (আমি) এরূপই করলাম। আর তাদের পরে বনী-ইসরাঈলকে এ সবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম। (৫৯)

অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। (৬০) তারপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখতে পেল, তখন মূসার সঙ্গীগণ বলতে লাগল, আমরা যে নিশ্চিত ধরা পড়ে গেলাম। (৬১) সে (মূসা) বলল, কখনই নয়। নিঃসন্দেহে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার পালনকর্তা, তিনি এখনই আমাকে পথ বলে দিবেন। (৬২) অতঃপর আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম, তোমার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত কর। ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল। (৬৩) আর অপর দলটিকেও ঐ স্থানের নিকট পৌঁছিয়ে দিলাম। (৬৪) এবং আমি মূসা ও তাঁর সঙ্গীদের সবাইকে উদ্ধার করে নিলাম। (৬৫) অনন্তর অন্যদেরকে নিমজ্জিত করে দিলাম। (৬৬)

উপাত্ত–৫

যে ফেরআউন থেকে বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল সে ছিল ঐ ফেরআউন যে তাদেরকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করত। কুরআনে কারীমে সূরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছে,

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (٤٩)

অর্থাৎ, আর (তোমরা স্মরণ কর,) যখন আমি তোমাদেরকে নিস্কৃতি দিলাম ফেরআউনী সম্প্রদায় থেকে যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাত; তারা তোমাদের পুত্রদেরকে যবেহ করত এবং তোমাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখত। আর তার মধ্যে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহা পরীক্ষা। (৪৯)

তাফসীরে কুরতুবীতে আয়াতে বর্ণিত 'কঠিন শাস্তি' কি কি ছিল তার বর্ণনায় বলা হয়েছে,

فروى أن فرعون جعل بني إسرائيل خدما وخولا وصنفهم في أعماله فصنف يبنون وصنف يحرثون ويزرعون وصنف يتخدمون وكان قومه جندا ملوكا ومن لم يكن منهم في عمل من هذه الاعمال ضربت عليه الجزية فذلك سوء العذاب.

অর্থাৎ, বর্ণিত আছে– ফেরআউন বনী ইসরাঈলকে সেবক ও কর্মচারী বানিয়ে রেখেছিল। তাদেরকে তার বিভিন্ন রকমের কাজে নিয়োজিত করে রেখেছিল। একটা শ্রেণী নির্মাণ কাজ করত, একটা শ্রেণী ক্ষেত-খামার ও চাষাবাদের কাজ করত এবং একটা শ্রেণী সেবার কাজ করত। আর তার নিজের সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিল সৈন্যবাহিনী ও সম্রাট। আর তাদের কেউ এসব কাজ না করলে তার উপর কর আরোপ করত। এটাই ছিল কঠিন শাস্তি। কুরতুবী-র

www.maktabatulabrar.com

এ বর্ণনায় প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল সেই ফেরআউন বনী ইসরাঈলকে দিয়ে বিভিন্ন নির্মাণ কাজও করাত।

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা

১ম মত প্রসঙ্গ: উপাত্ত–১ ও উপাত্ত–২ থেকে বুঝা যায় ১ম মতটি সঠিক নয়। কারণ সেগুলোতে যে ফেরআউন লালন-পালন করেছিল আর যার কাছে হযরত মূসা (আ.) দাওয়াত পেশ করেছিলেন এবং যে নিমজ্জিত হয়েছিল তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন সাব্যস্ত করা হয়েছে।

২য় মত প্রসঙ্গ: এ মতে প্রথমত সিদ্ধান্তহীনতা রয়েছে। যদি যে কোন একজন মেরনেফতাহ নির্দিষ্ট হয়েও যায় তবুও উপাত্ত–৩. উপাত্ত–৪ ও উপাত্ত–৫ সামনে রাখলে এমতটির পক্ষে আনুকূল্য পাওয়া যাবে না। কারণ মেরনেফতাহ-এর ব্যাপারে বনী ইসরাঈলকে নির্যাতন ও তাদেরকে নির্মাণ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত করার ইতিহাস সুবিদিত নয়। বরং তার পিতা র‍্যামেসিস–২ কর্তৃক বনী ইসরাঈলকে নির্যাতন ও তাদেরকে নির্মাণ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত করার ইতিহাস সুবিদিত, যা পরবর্তীতে আমরা উল্লেখ করছি।

৩য় মত প্রসঙ্গ: উপাত্ত–১ ও উপাত্ত–২ এ মতেরও বিরুদ্ধে। কারণ এ মতেও যে ফেরআউন লালন-পালন করেছিল আর যার কাছে হযরত মূসা (আ.) দাওয়াত পেশ করেছিলেন এবং যে নিমজ্জিত হয়েছিল তাদের দু'জনকে ভিন্ন ভিন্ন সাব্যস্ত করা হয়েছে। উপাত্ত–৪ ও উপাত্ত–৫ও এ মতের বিরুদ্ধে। কারণ মেরনেফতাহ-এর ব্যাপারে বনী ইসরাঈলকে নির্যাতন ও তাদেরকে নির্মাণ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত করার ইতিহাস সুবিদিত নয়, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ যে ফেরআউন নিমজ্জিত হয়েছিল সে ঐই ফেরআউন যে বনী ইসরাঈলকে নির্যাতন করত ও তাদেরকে নির্মাণ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত করত, যার প্রমাণ আমরা সামনে পেশ করেছি।

৪র্থ মত প্রসঙ্গ: এ মতে বলা হয়েছে, হযরত মূসা (আ.)-এর সময়কার ফেরআউন র‍্যামেসিস–৩ -এর স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী কোন র‍্যামেসিস। আর র‍্যামেসিস–৩ এর পর আরও ৮জন সম্রাট অতিবাহিত হয়েছে, যাদের প্রত্যেকের উপাধি ছিল র‍্যামেসিস। তাদের প্রত্যেকেই ফেরআউন। অর্থাৎ, এ মতে হযরত মূসা (আ.)-এর সময়কার ফেরআউন ৮ র‍্যামেসিসের যে কোনো একজন হতে পারে বলা হয়েছে। ৮ জনের যে কোনো ১ জন– এটা তো চরম সিদ্ধাহনীতার মত।

৫র্থ মত প্রসঙ্গ: রয়ে গেল ৫ম মতটি। অর্থাৎ, মূসা (আ.)-এর ফেরঅ-াউন হল র্যামেসিস–২। এ মতটি উপরোক্ত ৫টি কুরআনী উপাত্তের কোনটির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা এখানে ফেরআউন একজনকে মেনে নেয়ায় উপাত্ত–১ থেকে উপাত্ত–৪ এর সাথে সংগতিপূর্ণ হচ্ছে। আর র্যামেসিস–২ ই বনী ইসরাঈলকে নির্যাতন করেছিল এবং বনী ইসরাঈলকে নির্মাণ কাজসহ বহু কষ্টকর কাজে নিয়োজিত করেছিল। অতএব উপাত্ত–৫ এর সঙ্গেও এটি সংগতিপূর্ণ। হিফজুর রহমান সিওহারবী কৃত কাসাসুল কুরআনে তাওরাতের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'যে ফেরআউনের সঙ্গে বনী ইসরাঈলের শত্রুতা ছিল সেই ফেরআউন বনী ইসরাঈলকে ভীষণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে রেখেছিল। সে বনী ইসরাঈল দ্বারা দুইটি শহর রাআমসীস ও ফাইসুমের নির্মাণ কাজও করিয়েছিল, তাদেরকে শ্রমিক নিযুক্ত করেছিল।' উল্লেখ্য, র্যামেসিস–২ কেই রাআমসিস (رعمسيس)ও বলা হয়। সে নিজের নামেই শহর নির্মাণ করিয়েছিল। প্রাচীন শিলালিপি দ্বারা এ দু'টো শহরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবীও লিখেছেন এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে ফেরআউন বনী ইসরাঈলকে আপদ-বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত রেখেছিল সেই এই দ্বিতীয় র্যামেসিস। আর পূর্বে আমরা উপাত্ত–৪ ও উপাত্ত–৫ যে উল্লেখ করে এসেছি যে, যে ফেরআউন বনী ইসরাঈলকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করত, সেই ফেরআউনই নিমজ্জিত হয়েছিল, তার থেকেই বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। তাহলে প্রমাণিত হল যে সে ছিল র্যামেসিস–২। অতএব হযরম মূসা (আ.)-এর ফেরআউন একাধিক জন নয় বরং একজন। আর সে হল র্যামেসিস–২।

তদুপরি এ মতটি প্রাধান্য পাওয়ার আরও কিছু কারণ রয়েছে যা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

হযরত মূসা (আ.)-এর ফেরআউন র্যামেসিস–২ এই মত প্রাধান্য পাওয়ার কারণসমূহ

১. ১৮৮১ সনে র্যামেসিস–২ এর মমি উদ্ধার হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে তার উপর কয়েক দফা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে ফ্রান্সে চালানো পরীক্ষায় ফরাসি ডক্টর মরিচ বোকাইলী (১৯২০–১৯৯৮) আবিষ্কার করেন যে, র্যামেসিস–২ এর মমির অভ্যন্তরে লবণের উপস্থিতি রয়েছে। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তার মৃত্যু হয় সাগরে ডোবার কারণে। আর কুরআনে কারীমেও তার সাগরে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

২. যখন র্যামেসিস–২ এর মমি উদ্ধার হয় (যে মমিটি মিসরের যাদুঘরের রয়্যাল মমিজ কক্ষে সংরক্ষিত আছে।) তখন গোটা দেহ কয়েক খণ্ড নয় বরং অখণ্ড ছিল। কিন্তু নাড়াচাড়া ও বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর ফলে পরবর্তীতে মমিটি ভেঙ্গে কয়েক টুকরো হয়ে যায়। কুরআনে কারীম থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে বলা হয়েছে, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً অর্থাৎ, আজ তোমার দেহকে রক্ষিত রাখব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। তাফসীরে বায়যাবীর বর্ণনা মোতাবেক এ আয়াতেরই بِبَدَنِكَ শব্দের আর এক কেরাত হল بِأَبْدَانِكَ সেমতে আয়াতের অর্থ হবে আজ তোমার দেহগুলোকে (অর্থাৎ, দেহের টুকরোগুলোকে) রক্ষিত রাখব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। তাহলে র্যামেসিস–২ এর দেহ অখণ্ডও ছিল আবার কয়েক টুকরোও হয়েছে। উভয় কেরাতের অর্থই র্যামেসিস–২ এর দেহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩. হযরত মূসা (আ.)-এর ফেরআউনের দেহ-কাঠানো ও বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে হাদীছ ও তাফসীরের কিতাবাদিতে যে বর্ণনা পাওয়া যায় র্যামেসিস–২ এর দেহ-কাঠামো অঙ্গসমূহের ক্ষেত্রে সেগুলো প্রযোজ্য। যেমন তাফসীর গ্রন্থ আল-কাশ্ফ ওয়াল বয়ান-য়ে বর্ণিত হয়েছে, যখন ফেরআউনের মৃত্যুর সংবাদ হযরত মূসা (আ.)–এর কাছে পৌঁছয়, তখন বনী ইসরাঈল বলে ওঠে, না সে মরেনি, সে কখনও মরতে পারে না। তখন আল্লাহ তাআলা সমুদ্রকে নির্দেশ দেন। সমুদ্র কূলে নিক্ষেপ করে এক লাল খাটো দেহ (أحمر قصير)। শওকানী কৃত তাফসীর গ্রন্থ ফাতহুল কাদীরে আছে **فلفظه عريانا أصلع أخينس قصيرا** অর্থাৎ, তখন সমুদ্র তাকে (ফেরআউনকে) নিক্ষেপ করল, তার অবস্থা ছিল সে উলঙ্গ, টেকো, খাঁদা নাক বিশিষ্ট ও খাটো। **أخينس** শব্দের অর্থ শুধু খাঁদা নাক নয় বরং এমন নাক যার সামনের দিকটা কিছুটা খাঁদা তথা বোচা হওয়া সত্ত্বেও নাক কপালের চেয়ে উঁচু। যেমন অভিধান গ্রন্থ **الصحاح** য়ে বলা হয়েছে, **والخَنَسُ: تأخُّر الأنف عن الوجه مع ارتفاعٍ قليل في الأرنبة** অর্থাৎ নাকের অগ্রভাগ অল্প উঁচু হওয়া সত্ত্বেও নাক চেহারার চেয়ে উঁচু হওয়া। সুয়ূতী কৃত তাফসীর গ্রন্থ আদ্দুররুল মানছুরে ইবনুল মুনযির ও তাবারানী আওছাত-এর বরাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমাকে জানানো হয়েছে, ফেরআউন ছিল দাঁত পড়া/ফোকলা। (أثرم)।

এসব বর্ণনা সামনে রেখে র‍্যামেসিস–২ এর মমির দিকে তাকালে দেখা যায় তার মাথায় দুই পাশে ও পেছনে কিছু চুল থাকলেও মাথার মধ্যভাগে টাক রয়েছে। তার নাকের সামনের দিক বোচা হলেও নাকের মধ্যভাগ এতটা উঁচু যে তা কপাল ছাড়িয়ে যায়। তার রঙও বোধ হয় লালচে সুন্দর ছিল। আর ডক্টর স্মিথ –যিনি র‍্যামেসিস–২ এর মমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন তিনি– বলেছেন, তার দাঁতে ভাঙ্গন রয়েছে। রয়ে গেল সে সে খাটো দেহের তথা বেঁটে ছিল কি না। এখন মমির মাপে দেখা যায় তার উচ্চতা ছিল ১৭৩ সেন্টি-মটার। আর এই উচ্চতার লোককে বেঁটে নয় বরং মধ্যম লম্বা বলা যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে লম্বা বা বেঁটে হওয়ার বিষয়টা আপেক্ষিক। হতে পারে সে সমসাময়িক বনী ইসরাঈলীদের তুলনায় বেঁটে ছিল। সহীহ হাদীছের বর্ণনা (فأما موسى فرجل طوال) থেকে জানা যায় হযরত মূসা (আ.) লম্বা ছিলেন। ছা'লাবী কা'ব আহবার থেকে হযরত হারূন (আ.)-এরও লম্বা থাকার কথা বর্ণনা করেছেন। এখন হতে পারে এ জাতীয় দীর্ঘকায় বনী ইসরাঈলীদের তুলনায় র‍্যামেসিসকে বেঁটে বলা হয়েছে।

৪. সহীহ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী ফেরআউনের স্ত্রী ছিল হযরত আছিয়া (বিনতে মুযাহিম)। বোখারী শরীফের ৩৪১১ নং হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ অর্থাৎ, আর নারীদের মধ্যে কেবল ফেরআউনের স্ত্রী আছিয়া ও মারইয়াম বিনতে ইমরান ব্যতীত আর কেউ পূর্ণ কামেল হয়নি। আর এই ফেরআউন বলতে হযরত মূসা (আ.)-এর ফেরআউনকে বুঝানো হয়েছে, তার স্ত্রী ছিল আছিয়া। যেমন আল্লামা আল-জাযরী **جامع الأصول في أحاديث الرسول** কিতাবে বলেছেন, هي آسية بنت مُزَاحِم امرأة فرعون – موسى عليه السلام -. অর্থাৎ, আসিয়া বিনতে মুযাহিম হচ্ছে ফেরআউনের স্ত্রী অর্থাৎ, মূসা (আ.)-এর ফেরআউনের স্ত্রী। এখন আমরা জানতে পারি র‍্যামেসিস–২ এর কয়েকজন স্ত্রী ছিল যাদের একজনের নাম ছিল ইসেত নফরেত (است نفرت/Iset nofret)। অনেকের ধারণা এই ইসেতই হচ্ছে আছিয়া। ইসেত ও আছিয়া-এর মধ্যে শব্দগত ও অর্থগত মিল থাকার ভিত্তিতেই এমনটি ধারণা করা হয়েছে। ইসেতকে ইসিত বা ইসিসও (Isit /Isis) বলা হয়- Wikipedia।

তথ্যসূত্র: আহমদ সুবহী মানসূর-এর প্রবন্ধ **من هو فرعون موسى** , Pharaoh –Wikipedia, আব্দুর রাজ্জাক জুওয়াইলী-র প্রবন্ধ, **قصص القرآن لحفظ الرحمن السيوهاروي** ও বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ।

www.maktabatulabrar.com

নীল নদ দর্শন

জাদুঘরের পশ্চিমে একেবারে কাছেই নীল নদ। জাদুঘর থেকে বের হয়ে পায়ে হেঁটেই নীলের পাড়ে গেলাম। উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত নদী। সরাসরি নীল নদ দর্শনের মাধ্যমে জীবনের বহু দিনের এক তৃষ্ণা নিবারিত হল। এই সেই নীল নদ যাতে শিশু মূসাকে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল। এই সেই নীল নদ যা মিসরের গর্ব। এই সেই নীল নদ যা মিসরীয়দের জীবনে বহুমুখী কল্যাণের উৎস। এই সেই নীল নদ যা পৃথিবীর অনন্য ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক-বাহক।

নীল নদের ছবি

কায়রো টাওয়ারের উপর থেকে তোলা নীল নদের ছবি

নীল নদের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার উৎস সম্বন্ধে কিছু কথা

নীল নদ (Nile/النيل) আফ্রিকা মহাদেশের ১০টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলা একটি নদী। আফ্রিকার ১০টি দেশ এই নদীর অংশিদার। ১০টি দেশই নীল নদের আশির্বাদপুষ্ট। সেই ১০টি দেশ হল – মিসর, সুদান, দক্ষিণ সুদান, বুরুন্ডি, রুয়ান্ডা, কঙ্গো, তাঞ্জানিয়া, কেনিয়া, ইথিওপিয়া ও উগান্ডা।

নীলের দুইটি উপনদী রয়েছে। যথা: শ্বেত নীল নদ (النيل الأبيض/White Nile) ও নীলাভ নীল নদ (النيل الأزرق/Blue Nile)। এর মধ্যে শ্বেত নীল নদ দীর্ঘতর। শ্বেত নীল নদকেই নীল নদের প্রধান স্রোতধারা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শ্বেত নীল নদ আফ্রিকার মধ্যভাগের লেক ভিক্টোরিয়া বা ভিক্টোরিয়া হ্রদ (بحيرة فيكتوريا/Lake Victoria) অঞ্চল থেকে সুদানের রাজধানী খার্তুম পর্যন্ত। আর নীলাভ নীল নদ ইথিওপিয়ার তানা হ্রদ (بحيرة تانا/Lake Tana) থেকে সুদানের রাজধানী খার্তুম পর্যন্ত। দুইটি উপনদী সুদানের রাজধানী খার্তুমের নিকটে মিলিত হয়েছে। এরপর নীলের উত্তরাংশ সুদানের উত্তর অংশ পার হয়ে মিসরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে গিয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, 'ভিক্টোরিয়া হ্রদ' তাঞ্জানিয়া, কেনিয়া ও উগান্ডা– এই ৩ দেশের সীমান্তবর্তী অংশ জুড়ে অবস্থিত।

নীল নদের বিশেষ দুটো বৈশিষ্ট রয়েছে। (এক) এটি বিশ্বের দীর্ঘতম নদী। এর দৈর্ঘ ৬,৬৫০ কিলোমিটার। এর সর্বোচ্চ প্রশস্ততা ২.৮ কিলোমিটার। গড় গভীরতা ২৬-৩৬ ফুট (৮-১১ মিটার)। (দুই) নীল নদের উৎস দক্ষিণ দিকে, অথচ বিশ্বের সকল নদীর উৎস উত্তর দিকে। এর সর্বদক্ষিণের উৎস হল দক্ষিণ রুয়ান্ডাতে। সেখান থেকে উত্তর দিকে তাঞ্জানিয়া, লেক ভিক্টোরিয়া, উগান্ডা ও দক্ষিণ সুদানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আর নীলাভ নীল নদ ইথিওপিয়ার তানা হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে সুদানে প্রবেশ করেছে। এরপর সুদান সীমান্ত অতিক্রম করে মিসরের নাসের হ্রদের সাথে মিলিত হয়েছে। এই হ্রদের উত্তরাংশ থেকে নীল নদ প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরের কাছে বিশাল ব-দ্বীপ[১] সৃষ্টি করে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে।

অবশ্য শ্বেত নীলের উৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক আছে। অনেকে মনে করেন, আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদ ভিক্টোরিয়া থেকে এর উৎপত্তি। বস্তুত এই হ্রদের উত্তর প্রান্তে রয়েছে রিপন জলপ্রপাত। এই জলপ্রপাত থেকে উৎপন্ন একটি ক্ষীণ

১. নদীর মোহনাস্থিত ব-আকারের দ্বীপকে ব-দ্বীপ বলে।

www.maktabatulabrar.com

জলধারা থেকে শ্বেত নীলের জন্ম। আবার বহু ঝর্ণার জল এসে ভিক্টোরিয়া হ্রদে মিশেছে। ভিক্টোরিয়া হ্রদকে ঘিরে রয়েছে বহু পাহাড়। এসকল পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনার জলে ভিক্টোরিয়া হ্রদের উৎপত্তি হয়েছে। এর মধ্যে কাগেরিয়া নদীর জলধারাকে ভিক্টোরিয়া হ্রদের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই নদীকে নীলের উৎস বিবেচনা করে নীল নদকে পৃথিবীর দীর্ঘতম নদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কাগেরিয়া নদী শ্বেত নীল নদ নাম নিয়ে মধ্য আফ্রিকার দক্ষিণ সুদান অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। এরপর এই নদ সুদানের রাজধানী খার্তুমে নীলাভ নীল নদের সাথে মিলিত হয়েছে। অতএব ভিক্টোরিয়া হ্রদ থেকেই শ্বেত নীলের উৎপত্তি তা যেমন একবাক্যে বলা যায় না, তেমিন রিপন জলপ্রপাত থেকেই শ্বেত নীলের উৎপত্তি এটাও একবাক্যে দাবি করা যায় না।

প্রাচীন মিসরের সভ্যতা নীল নদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। মূলত মিসরের জনসংখ্যার অধিকাংশ নীল নদের উপত্যকায় বসবাস করে এবং এর বেশিরভাগ শহরের অবস্থান এই নদীর তীরে। প্রাচীন মিসরের প্রায় সমস্ত সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাও এর তীরেই অবস্থিত। মিসরকে তাই বলা হয় 'নীল নদের দান'।

মিসর এক বিশাল মরুভূমির দেশ। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা এখানে খুবই ক্ষীণ। তা সত্ত্বেও মিসরে গড়ে উঠেছে বহু ঐতিহাসিক সভ্যতা। কীভাবে তা সম্ভব হল?। বস্তুত তা সম্ভব হয়েছে এই নীল নদের ওছীলায়। বৃষ্টি বিরল মিসরে প্রতি গ্রীষ্মকালের প্রবল বন্যায় নীল নদের গতিপথের দু'পাশের ভূমি প্লাবিত হয়ে যায়। ফলে নীল নদের অববাহিকায় প্রতি বছর নতুন পলিমাটি সঞ্চিত হয়। এভাবে প্রতি বছর নীল নদ পলি দিয়ে মিসরকে সমৃদ্ধ করে এবং জমি হয়ে ওঠে অত্যন্ত উর্বর ও শস্য শ্যামলা। আর এই উর্বরতাই হচ্ছে মিসরে বহু সভ্যতা গড়ে ওঠার মূল উৎস। নীল নদের বন্যার কল্যাণেই বহু প্রাচীন কাল থেকে এই অঞ্চলে জনবসতি গড়ে ওঠে। এভাবে নীল নদ শুধু দীর্ঘতম নদীই নয়, জনজীবনে এক বিরাট প্রভাবশালী নদীও বটে। বস্তুত মিসরীয়দের অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে নীল নদের ভূমিকা। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন, এশিয়ার ইয়েলো রিভার কিংবা ইউরোপের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ভল্গা নদের প্রভাব অনেক থাকলেও নীল নদের মতো এতটা প্রভাব হয়তো অন্য কোনো নদীর নেই।

বস্তুত নীল নদ মিসরসহ অনেক দেশের কল্যাণের উৎস। নীল নদ আল্লাহর এক বিরাট নেয়ামত। সহীহ মুসলিম শরীফে মে'রাজ সম্পর্কিত এক হাদীছের একাংশে বর্ণিত হয়েছে–

وَحَدَّثَ نَبِيُّ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ. فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الأَنْهَارُ قَالَ أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ.

অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনি সিদরাতুল মুনতাহা বৃক্ষমূল থেকে চারটি নহর বের হতে দেখেছেন, যার দু'টো প্রকাশ্য আর দু'টো অপ্রকাশ্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে জিব্রাঈল! এই নহরগুলো কী? তিনি উত্তরে বললেন, অপ্রকাশ্য দু'টো নহর তো জান্নাতের দু'টো নহর। আর প্রকাশ্য দু'টো হচ্ছে নীল ও ফুরাত।

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ফাতহুল বারীতে আল্লামা নববীর বরাতে যা বর্ণিত হয়েছে তার সারকথা হল– এ হাদীছে নীল ও ফুরাত নদীদ্বয়কে জান্নাতের নহর বলে নীল ও ফুরাতের বাহ্যিক কল্যাণের কথাই বর্ণিত হয়েছে। আর এ প্রশ্নও উত্থাপিত হতে পারে না যে, এ নদী দু'টোর বাহ্যিক উৎস দেখতে পাই পৃথিবীতে তাহলে তার উৎস সিদরাতুল মুনতাহার মূল হয় কী করে? আল্লামা নববীর বক্তব্য নিম্নরূপ–

في هذا الحديث ان أصل النيل والفرات من الجنة وانهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى ثم يسيران حيث شاء الله ثم ينزلان إلى الارض ثم يسيران فيها ثم يخرجان منها وهذا لايمنعه العقل وقد شهد به ظاهر الخير فليعتمد ... واستدل به على فصيلة ماء النيل والفرات لكون منبعهما من الجنة.

অর্থাৎ, এ হাদীছে বলা হয়েছে নীল ও ফুরাত নদীদ্বয়ের মূল জান্নাতে। সিদরাতুল মুনতাহার মূল থেকে বের হয়ে চলতে চলতে পৃথিবীতে যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা স্থিতি লাভ করেছে আর সে স্থানগুলোই নদীদ্বয়ের উৎসমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা যুক্তির পরিপন্থী নয়। বাহ্যিক কল্যাণও তার সাক্ষী। অতএব আস্থা রাখা চাই। তিনি আরও বলেছেন, এ হাদীছ দ্বারা নীল ও ফুরাতের পানির ফযীলত প্রমাণিত হয়। কেননা নদীদ্বয় জান্নাত থেকে উৎসারিত।

www.maktabatulabrar.com

নীল নদ পরিচ্ছন্ন রাখার সযত্ন প্রয়াস

নীল নদ হচ্ছে মিসরীয়দের জন্য একটা বড় নেয়ামত। এই নদীর পানি দিয়ে তাদের চাষাবাদ হয়, এই নদীর পানি সারা শহরে খাওয়া ও ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়। নীল নদের পানি বেশ সুস্বাদুও বটে। নেয়ামত রূপ এই নীল নদকে মিসরীয়রা কদর করেই রাখছে। নীল নদ পরিচ্ছন্ন রাখার সযত্ন প্রয়াস দেখার মত। দেখলাম নদীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যেসব পলিথিন, প্লাস্টিকের বোতল, গাছের পাতা ইত্যাদি ময়লা-আবর্জনা পড়ে সেগুলো পরিষ্কার করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। মাটির উপর যেমন বুলডোজার তেমনি এক ধরনের ভাসমান বুলডোজারের মত মেশিন দিয়ে সব ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা দেখলাম। মনে পড়ল ঢাকার পাশে বুড়িগঙ্গা নদীর পানির কাল কুৎসিত নোংরা চেহারার কথা। এটা তো এখন আর পানির নদী থাকেনি, এটা হয়ে গেছে রীতিমত খোলা এক বিশাল বিস্তৃত পয়লাইন। যার দুর্গন্ধে নদীর দু পাশে দীর্ঘ দূর পর্যন্ত আকাশ-বাতাস জর্জরিত হয়ে থাকে। মনে হল উদ্যোগ নিলে আমরাও নীল নদের ন্যায় বুড়িগঙ্গাকে পরিষ্কার রাখতে পারতাম। কিন্তু তেমন উদ্যোগ নেয়ার চিন্তা যাদের করার তারা কি তা করে? তাদের এরূপ উদ্যোগ গ্রহণের চিন্তা বুঝি কূল দখলের ভারি চিন্তায় চাপা পড়ে আছে।

কায়রো টাওয়ার দর্শন

জাদুঘরের পশ্চিমে নীল নদের যে অংশ সেখানে নদীর মাঝে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত একটি স্বল্প দীর্ঘ দ্বীপ রয়েছে। অর্থাৎ নীল নদ এই দ্বীপের পূর্ব ও পশ্চিম দিয়ে কিছুদূর উত্তরে গিয়ে আবার একত্র হয়ে গেছে। এই দ্বীপকে বলে গেযিরা আইসল্যান্ড (الجزيرة/Gezira Island)। জাদুঘর বরাবর এই দ্বীপের মধ্যেই রয়েছে কায়রো টাওয়ার (Cairo Tower/برج القاهرة)। দ্বীপটির দক্ষিণ অংশে টাওয়ারের অবস্থান। টাওয়ারটি ৬২ তলা বিশিষ্ট। উচ্চতা ১৭৮ মিটার। বিদেশীদের জন্য প্রবেশ মূল্য ২০০ পাউন্ড আর মিসরী-য়দের জন্য ৩৫ পাউন্ড। টাওয়ারের উপরে গিয়ে গোটা কায়রোর দৃশ্য দেখলাম। টাওয়ারের উপর থেকে গীযা এলাকার পিরামিডগুলোও সুন্দরভাবে দেখা যায়। নীল নদ কায়রোর মাঝ দিয়ে কীভাবে কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে গিয়েছে তাও সুন্দরভাবে দেখা যায়।

কায়রো টাওয়ার

জামেয়া আযহারের মসজিদ ও জামেয়া আযহার দর্শন

জামেয়া আযহারের মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম। মা-শা-আল্লাহ কী অদ্ভূত সুন্দর তেলাওয়াত। মিসরীয়রা তেলাওয়াতের পাগল একথা আগেও বলেছি। প্রত্যেক নামাযে তারা দীর্ঘ তেলাওয়াত করে থাকেন। জামেয়া আযহারের মসজিদেও তার ব্যতিক্রম পেলাম না। আমাদের দেশে ফজরের নামাযে যতটা দীর্ঘ তেলাওয়াত হয় মাগরিবের নামাযেই ইমাম সাহেব তার চেয়ে দীর্ঘ তেলাওয়াত করলেন। কিন্তু ইমাম সাহেবের লাহজা এত সুন্দর, আমার মন চাইছিল কেরাত যদি আরও দীর্ঘ হতো! সেই তেলাওয়াতের মজা যেন বিস্মৃত হওয়ার নয়।

জামেয়ো আযহারের মসজিদ

জামেয়া আযহারের মসজিদ-এর ভিতরের দৃশ্য

www.maktabatulabrar.com

জামেয়া আযহারের মসজিদ কায়রোর প্রাচীনতম মসজিদ। (আর আমর ইবনুল আস [রা.]-এর মসজিদ গোটা আফ্রিকার প্রাচীনতম মসজিদ।) জামেয়া আযহারের মসজিদ ও জামেয়া আযহার একই সঙ্গে লাগোয়া। এটি কায়রোর হুসায়ন এলাকা (حي الحسين)-এ অবস্থিত। জামেয়া আযহারের মসজিদ জামেউল আযহার (جامع الأزهر) নামে প্রসিদ্ধ। শুরুতে এটির নাম ছিল জামেউল কাহেরা (جامع القاهرة), পরবর্তীতে নাম হয় জামেউল আযহার। হযরত ফাতেমাতুয যাহ্‌রা-র 'যাহ্‌রা' অংশের দিকে সম্পৃক্ত করে এমন নামকরণ করা হয়। অবশ্য কেউ কেউ নামকরণের ভিন্ন হেতুও বর্ণনা করে থাকেন। ৩৬১ হিজরিতে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। যখন ফাতিমী রাজত্বের দ্বিতীয় খলীফা মুইঝ লিদীনিল্লাহ (معز لدين الله)-এর সেনাপতি জওহর আস-সিকিল্লী (جوهر الصقلي/Jawhar al-Siqilli) কায়রো আবাদ করেন তখন তিনি খলীফার নির্দেশে এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। তিনি মসজিদটির ভিত্তিপ্রস্তর রাখেন ৩৫৯ হিজরি (মোতাবেক ৯৭১ খ্রিস্টাব্দ)-এর ১৪ রমজান আর ৩৬১ হিজরির ৫ রমজান প্রথম নামায আদায় শুরু হয়। পরবর্তীতে হাকিম বি আমরিল্লাহ এটির সংস্কার করেন এবং এর জন্য প্রচুর ওয়াকফ-সম্পত্তি বরাদ্দ করেন। (حسن المحاضرة ج/١ وغيرها) তারপর বিভিন্ন যুগে মসজিদটির আরও সংস্কার হয়েছে।

সে যুগে রেওয়াজ ছিল বড় বড় মসজিদে দ্বীনী শিক্ষার দরসও হত এবং সেগুলো নিয়মতান্ত্রিক মাদরাসার রূপ ধারণ করত। সে মোতাবেক এই মসজিদেও ৩৬৫ হিজরি থেকে দরস-তাদরীস শুরু হয় এবং শত শত বছর যাবত দ্বীনী শিক্ষার দরস-তাদরীস হতে থাকে। বড় বড় আলেম এখানে দরস প্রদান করেছেন, বড় বড় আলেম এখানে দরস গ্রহণ করেছেন। ধীরে ধীরে এখানকার দরস-তাদরীসের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার পর যখন দিক দিগন্ত থেকে প্রচুর ছাত্র এখানে আসতে শুরু করে, তখন এই মসজিদেরই নিকটে ভিন্ন ভবন নির্মাণ করে সেটির নাম দেয়া হয় জামেয়াতুল আযহার (جامعة الأزهر/Al-Azhar University), যাকে আমরা সহজ অভিব্যক্তিতে 'জামেয়া আযহার' বলে থাকি। তারপর থেকে মসজিদে দরস-তাদরীস না হয়ে জামেয়া আযহারেই দরস-তাদরীস হয়ে আসছে। আর মসজিদটি একটি ঐতিহাসিক মসজিদ রূপে কায়েম রয়েছে। তবে এখনও জামেয়া আযহারের পক্ষ থেকে এই নিয়ম রাখা হয়েছে– সপ্তাহের প্রায় প্রতিদিনই জামেয়ার কোন বিজ্ঞ আলেম মসজিদে যে কোন একটা দ্বীনী বিষয়ে আলোচনা রাখেন। তাতে

www.maktabatulabrar.com

জামেয়ার ছাত্ররা যেমন অংশগ্রহণ করে, তেমনি বাইরের লোকেরাও অংশগ্রহণ করে।

জামেয়া আযহার তিউনিসে অবস্থিত জামেয়াতুয্ যাইতূনাহ (جامعة الزيتونة) ও মরক্কোর ফেজ (فاس/Fes) শহরে অবস্থিত জামেয়াতুল ক্বারাউয়্যীন (جامعة القرويين)-এর পর পৃথিবীর তৃতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। জামেয়াতুয্ যাইতূনায় দরস শুরু হয় ১২০ হিজরিতে, জামেয়াতুল ক্বারাউয়্যীনে ২৪৫ হিজরিতে আর জামেয়া আযহারে ৩৬৫ হিজরী থেকে।

আল্লামা সাখাবী আয-যাওউল লামে' (الضوء اللامع) কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, জামেয়া আযহারের মসজিদের জায়গা ওয়াকফ করেছিল একজন কট্টর শিয়া। আবার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জামেয়া আযহারের মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল ফাতেমী খলীফা মুইঝ লিদীনিল্লাহ-এর নির্দেশে। আবার একথাও সুবিদিত যে, সরকারীভাবে ফাতেমী খলীফাগণ শিয়া মতবাদের (ইসমাঈলী শিআ মতবাদের) পৃষ্ঠপোষকতা করত। এসবকিছু মিলিয়ে এটা সুস্পষ্ট যে, শিয়া মতবাদ প্রচার-প্রসারের লক্ষেই জামেয়া আযহারের উক্ত মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং বাস্তবেও সেভাবেই শুরুতে এখানে শিয়া মতবাদের প্রভাব ছিল। পরবর্তীতে সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়্যুবী প্রতিষ্ঠানকে শিয়া প্রভাব থেকে মুক্ত করেন। তারপর থেকে অদ্যাবধি এটি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতাদর্শ অনুসারী রয়েছে।

জামেয়া আযহার অতীতে বহু বিখ্যাত হক্কানী আলেম তৈরি করেছে, যারা ইলমী অঙ্গনে যেমন দর্শনীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, আমলী ময়দানেও তারা অনুসরণীয় আদর্শ কায়েম করেছেন। অত্যন্ত কঠিনভাবে তারা বদ-দ্বীনী সয়লাবের মোকাবেলা করেছেন। জামেয়া আযহার প্রতিষ্ঠানের ভেতরও ছিল পাগড়ি জুব্বা পরিহিত ও ইত্তেবায়ে সুন্নাতের জযবায় উদ্বেলিত শিক্ষক ছাত্রদের সম্মিলন। কিন্তু তাকদীরের রহস্য আমাদের জানা নেই। বিংশ শতাব্দির শুরু থেকে পশ্চিমা আদর্শে প্রভাবান্বিত এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত কিছু ব্যক্তি জামেয়া আযহারের মাথায় জেঁকে বসে, যাদের কু-প্রভাব জামেয়া আযহারে ছেয়ে যায় এবং জামেয়া আযহারের দ্বীনী রঙ বদলাতে থাকে। একটি দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও দ্বীনী দরসগাহে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের যে গুরুত্ব ও অনুশীলন থাকা উচিত এবং এতদিন যাবত জামেয়া আযহারে যেটা ছিলও তাতে ভাটা পড়তে থাকে। যদিও ইলমী তাহকীকের অঙ্গনে জামেয়া আযহারের ভূমিকা এখনও কিছুটা হলেও টিকে আছে এবং এখনও জামেয়া আযহ-

ারে বিভিন্ন ফনের (শাস্ত্রের) বহু বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, কিন্তু আমলী ময়দানে জামেয়া আযহারে এতটাই শূন্যতা এসেছে যে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আজ জামেয়া আযহারের শুধু ছাত্রদেরই নয় বহু উস্তাদের অবস্থা দেখে মনে হয় না আদৌ তারা কোন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের ছাত্র শিক্ষক। বেশ কিছু সংখ্যক উস্তাদসহ বহু ছাত্র রীতিমত প্যান্ট শার্ট পরিধান করে এবং নামকাওয়াস্তে দাড়ি রাখে কিংবা সমূলেই সেভ করে। আমি নিজে জামেয়া আযহারের উসূলুদ্দীন এর কিসমুল হাদীছের (হাদীছ বিভাগের) ক্লাসরূম ইত্যাদি ঘুরে দেখেছি, কিছু উস্তাদকেও দেখেছি যাদের অবস্থা অনুরূপ।

জামেয়া আযহারের এই অবস্থার মধ্যেও একটা আশার আলো হচ্ছে– স্বয়ং কায়রোতেও এবং আরও বড় পরিসরে বললে গোটা মিসরেও অন্যান্য কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা এবং সাধারণ নওজোয়ানরা জামেয়া আযহারের এই অবস্থাতে সন্তুষ্ট নয়। তারা চায় আযহারীদের মধ্যে বরং গোটা মিসরের মানুষের মধ্যে দ্বীনী রঙ পুনর্জীবিত হোক। এক সময় তাদের এই চাওয়ার ভাল প্রভাব পড়বে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ যেন তা-ই করেন।

জামেয়া আযহারের এই বদ-আমলী ও বদ অনুশীলনের মধ্যেও একটা ভাল কথা জামেয়ার ছাত্রদের থেকে জানতে পারলাম। তা হল আমি কয়েকজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যেসব উস্তাদ দাড়ি কাটেন বা সেভ করেন কিংবা প্যান্ট শার্ট পরিধান করেন তোমরা কেউ কি তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে দেখেছো তারা কী জবাব দেন? কয়েকজন ছাত্র আমাকে উত্তরে বলেছে, তারা অনেকেই অনেকবার বিভিন্ন সুযোগে সেসব উস্তাদকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তারা পরিষ্কার উত্তর দিয়েছেন দাড়ি রাখা চার ইমামের সকলের মতেই ওয়াজিব, আমার মধ্যে যা দেখছ এটা আমার ঈমানের ত্রুটি। পোশাকের ব্যাপারেও তাদের ঐ একই ধরনের উত্তর। বুঝা গেল ঐসব উস্তাদের মধ্যে এই বদ-আমলীর জন্য অনুশোচনা রয়েছে, আর এই অনুশোচনা একদিকে যেমন ছাত্রদের তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করছে, তারা প্যান্ট শার্ট পরিধান করা ও দাড়ি না রাখাকে অন্যায়ই ভেবে যাচ্ছে, অন্যদিকে এই অনুশোচনা একসময় ঐসব উস্তাদেরও তওবার দিকে নিয়ে যেতে পারে। যেকোনো পাপের ব্যাপারে অনুশোচনা মানুষকে সেই পাপ থেকে তওবার দিকে নিয়ে যায়। বেশি বিপজ্জনক হত যদি তারা কুরআন হাদীছকে দুমড়ে মুচড়ে দাড়ি না রাখার পক্ষে দলীল দেয়ার অপচেষ্টা করতেন।

জামেয়া আযহারের কিছু বিষয় তো খারাপ লেগেছে যার বিবরণ এতক্ষণ

www.maktabatulabrar.com

দেয়া হল। এর বিপরীত কিছু বিষয় জেনে ভালও লেগেছে। যেসব বিষয় জেনে ভাল লেগেছে সেগুলো হল–

১. জামেয়া আযহারে মাযহাববিহীনতা তথা গায়র মুকাল্লিদিয়্যাতকে প্রশ্রয় দেয়া হয় না। তাই জামেয়া আযহারে ভর্তি হওয়ার জন্য যে কোনো একটা মাযহাবের অনুসারী হওয়া শর্ত। বিশেষত ফেকাহ নিয়ে পড়তে চাইলে।

২. মিসরে যদিও শাফিয়ী মাযহাবই সিংহভাগ জনগণের মাযহাব, তারপরও জামেয়া আযহারে সব মাযহাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। দরস তাদরীসে সব মাযহাবের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বক্তব্য পেশ করা হয়।

৩. জামেয়া আযহারে তাসাওউফের স্বীকৃতি রয়েছে। স্বয়ং বর্তমান শায়খুল আযহার আহমদ তাইয়্যিব সাহেব খান্দানীভাবেই পীরমুরিদী সিলসিলার সঙ্গে জড়িত।

৪. জামেয়া আযহার সরকার থেকে স্বীকৃতি ব্যতীত সরকার থেকে কোন অর্থ গ্রহণ করে না। বরং বছর শেষে জামেয়ার উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করে দেয়া হয়।

এ বৈশিষ্টগুলো দৃষ্টে আমার মনে হয় আমাদের দেশের কাওমী মাদরাসার যেসব ছাত্র মক্কার জামেয়া উম্মুল কুরা, মদীনার জামেয়া ইসলামিয়া তথা মদীনা ইউনিভার্সিটি ও মিসরের জামেয়া আযহার– এই ৩টি প্রতিষ্ঠানের কোন্টিতে ভর্তি হওয়া উত্তম তা নিয়ে ভাবে, তাদের জন্য জামেয়া আযহ-ারকেই উত্তম বিবেচনা করা ভাল। কেননা, জামেয়া আযহারের উপরোক্ত বৈশিষ্টাবলি দেওবন্দের চিন্তাধারা অনুসারী কওমী মাদরাসার বৈশিষ্টাবলির অনুকূল। দেওবন্দ মাযহাব অনুসরণকে অপরিহার্য মনে করে। দেওবন্দ সব মাযহাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। দেওবন্দ তাসাওউফের স্বীকৃতি প্রদান করে। এর বিপরীত জামেয়া উম্মুল কুরা ও মদীনা ইউনিভার্সিটি লামাযহ-াবিয়্যাতকে প্রশ্রয় দেয়, বরং তাতেই উৎসাহিত করে। এর ফলে কওমী মাদরাসার বহু ছাত্র সেখানে গিয়ে সালাফী তথা লা-মাযহাবী হয়ে যায়। জামেয়া উম্মুল কুরা ও মদীনা ইউনিভার্সিটির সব শিক্ষক নয় তবে কিছু শিক্ষক হানাফী মাযহাবের ব্যাপারে অসহিষ্ণুতা বরং তাআসসুব বা জেদ হটকারিতা প্রদর্শন করে। জামেয়া উম্মুল কুরা ও মদীনা ইউনিভার্সিটি তাসাওউফের স্বীকৃতি দেয় না। এসব কিছুর প্রেক্ষিতে জামেয়া উম্মুল কুরা ও মদীনা ইউনিভার্সিটির তুলনায় জামেয়া আযহারই উত্তম। এটি আমার একান্তই ব্যক্তিগত খেয়াল। বড়রা এ ব্যাপারে কি বলবেন জানা নেই। তদুপরি আমার

এই খেয়াল শুধু তাদের বেলায় যারা এখানে পড়তে যাওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছে। নতুবা শুরু থেকে হলে মূল পরামর্শ তো তা-ই যা হযরত ইবনে সীরীন (রহ.) বলে গেছেন, إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم অর্থাৎ, এই ইলম (কুরআন-হাদীছের ইলম) হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং কার থেকে তোমরা দ্বীন গ্রহণ করবে তা লক্ষ রেখো। অতএব ফাসেককে উস্তাদ বানানোর অবকাশ নেই। বিশেষত যখন তাদের কাছে দ্বীনী ইলম শিখতে যাওয়ার মত অনন্যোপায় অবস্থাও আমাদের নয়। আল-হামদু লিল্লাহ দ্বীনী উচ্চ শিক্ষা প্রদান করার মত যথেষ্ট যোগ্য ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশে রয়েছে এবং তারা মা-শা-আল্লাহ মুত্তাকী পরহেযগারও। অগত্যা যারাই জামেয়া আযহারে পড়াশোনা করতে যাবে তাদেরকে ঈমান আমলের ব্যাপারে যত্নবান থাকতে হবে। হাওয়া যেদিকে চলে সেদিকেই যেন তারা পাল না খাটায়।

জামেয়া আযহারের বহু বিভাগ রয়েছে এবং রয়েছে কায়রোসহ মিসরের বড় বড় শহরগুলোতে বহু শাখা। এক কায়রোতেই বহু স্থানে জামেয়ার বহু বিভাগ ছড়িয়ে রয়েছে। হাদীছ, ফিক্‌হ, তাফসীর, আরবি সাহিত্য বিভাগগুলো ছাড়াও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও বহু বিভাগ রয়েছে। আবার সরাসরি জামেয়ার শাখা ছাড়াও মিসরের বহু ইস্কুল কলেজ জামেয়ার অধীনে পরিচালিত হয়। হাজার হাজার বিদেশী ছাত্র জামেয়ার শাখাগুলোতে পড়াশোনা করে। এক ইন্দোনেশিয়া থেকেই প্রতি বছর দশ বার হাজার নতুন ছাত্র জামেয়া আযহারে অধ্যয়ন করতে যায়। আমাদের বাংলাদেশ থেকেও দুইশ আড়াইশ ছাত্র যায়।

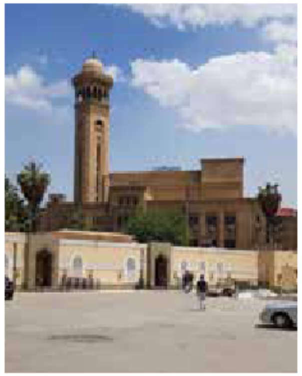

দিনের বেলায় জামেয়া আযহার

www.maktabatulabrar.com

মাদ্রাসাতুল আইনী ও আল্লামা আইনীর যিয়ারত

জামেয়া আযহারের পিছনে আল্লামা আইনীর মাদ্রাসাতুল আইনী (مدرسة العيني)। দরজার সামনে নেমপ্লেটে আরবিতে লেখা আছে مدرسة العيني (মাদরাসাতুল আইনী)। গেটের উপর মিনারা রয়েছে। ফলে বার থেকে এটা দেখতে মসজিদের মত কিন্তু ভিতরে মাদরাসার মত রুম রুম। আসলে সেই যুগে বড় বড় আলেমগণ বাড়ি এমনভাবে বানাতেন যে, সেখানে দরস ও তালীমের ব্যবস্থাও থাকত, ছাত্রগণের থাকার ব্যবস্থাও থাকত। ফলে সেখানে নামাযের ঘরও রাখতে হত। এভাবে যেটা বাড়ি সেটাই মাদরাসা সেটাই মসজিদ। এখানে একটা রুমের মধ্যে (রুমটি গেট দিয়ে প্রবেশ করে একটু সামনে গিয়ে ডান হাতে) পাশাপাশি আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ও আল্লামা আহমদ কাসতাল্লানীর কবর। ডান পাশে আল্লামা আহমদ কাসতাল্লানীর কবর আর বাম পাশে আল্লামা আইনীর কবর। আবেগ ভরে তাদের কবরদ্বয় জিয়ারত করলাম। আমরা যে তাদের কিতাবী ছাত্র, আমরা যে তাদের কিতাব বাদ দিয়ে ইলমী অঙ্গনে চলতে অনেকটাই অক্ষম! হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এই উস্তাদদের মর্যাদা বুলন্দ করে দাও।

আল্লামা আইনী ৮১৪ হিজরি মোতাবেক ১৪১১ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই তিনি এখানে দরস দান করতেন। মৃত্যুর পর এখানেই তাকে দাফন করা হয়।

মাদরাসাতুল আইনী-র গেট

আল্লামা আইনী ও আহমদ কাসতাল্লানী-র কবর

আল্লামা আইনী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

(৭৬২-৮৫৫ হি.)

www.maktabatulabrar.com

নবম হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস (হাদীছ-বিশারদ) ও ঐতিহাসিক আল্লামা আইনী হলেন আবূ মুহাম্মাদ বদরুদ্দীন মাহমূদ ইবনে আহমদ ইবনে মূসা। 'বদরুদ্দীন আইনী' নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। ৭৬২ হিজরির ২৬ রমজান মোতাবেক ১৩৬১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুলাই তিনি আইনতাবে (عينتاب) জন্মগ্রহণ করেন। আইনতাবকে আনতাব (عنتاب)ও বলা হয়। গাযী আইনতাব (غازي عينتاب)ও বলা হয়। তুর্কিরা বলে গাযী আনতেপ (Gaziantep)। শহরটি তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত। তার বংশ মূলত ছিল সিরিয়ার আলেপ্পো (حلب/Aleppo) শহরের অধিবাসী। আইনতাবে আল্লামা আইনী-র জন্ম বিধায় তাকে 'আইনী' বলা হয়।

আল্লামা আইনী-র পরিবার ছিল ইল্‌মী পরিবার। তার পিতা ছিলেন একজন ফকীহ, সেই সাথে বিচারক। ৮ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি হেফজে কুরআন সম্পন্ন করেন, লেখা ও পড়া শিখে নেন। তারপর কেরাতে সাবআ (কুরআন পাঠের ৭টি পদ্ধতি) শিক্ষা করেন। এবং পিতা ও অন্য উস্তাদদের কাছে হানাফী ফিকহ শিক্ষা করেন। নিজের এলাকার উলামায়ে কেরামের কাছে তাফসীর, মানতিক ও অন্যান্য উলূমে আরাবিয়া শিক্ষা করেন। ৭৮৩ হিজরি মোতাবেক ১৩৮১ খ্রিস্টাব্দে আলেপ্পোতে গিয়ে উলামায়ে কেরাম থেকে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। পিতার ইন্তেকালের পর ৭৮৫ হিজরি মোতাবেক ১৩৮৩ খ্রীস্টাব্দে দামেস্কের মাদ্রাসায়ে নূরিয়া (المدرسة النورية)তে ভর্তি হয়ে হাদীছের উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। তারপর আবার নিজের এলাকায় ফিরে আসেন। ৭৮৬ হিজরি মোতাবেক ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় গমন করেন। মক্কা ও মদীনায় থাকা অবস্থায় সেখানকার বড় বড় উলামায়ে কেরাম থেকে ইলম হাসেল করেন। হজ্জ থেকে দেশে ফেরার পর দরস ও তাদরীসের কাজ শুরু করেন। পাশ্ববর্তী এলাকাগুলো থেকে ছাত্ররা তার কাছে ভেঙ্গে পড়ে।

৭৮৮ হিজরি মোতাবেক ১৩৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারতে যান। সেখানে তিনি বিখ্যাত আলেম মালিকুল উলামা আলাউদ্দীন আস-সাইরামী-র সাক্ষাত পান। তার কাছেও ইলম অর্জন শুরু করেন। সে বছরই তার সঙ্গে তিনি কায়রো আগমন করেন। কায়রোতে আল্লামা সাখাবী, কামাল উদ্দীন্ ইবনুল হুমাম ও ইবনে তাগরী বিরদী-এর ন্যায় জগৎবিখ্যাত আলেমগণ তার থেকে শিক্ষা লাভ করেন। ৮১৪ হিজরি মোতাবেক ১৪১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাদরাসাতুল আইনী প্রতিষ্ঠা করেন, যার উল্লেখ পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এখানে দরস ও তাদরীসের কাজে

নিয়োজিত থাকেন।

আল্লামা আইনী কায়রোর অনেক রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও পালন করেছেন। তিনি কায়রোর ট্রেজারার (المحتسب) পদে দায়িত্ব পালন করেন। বহু বছর হানাফী-দের প্রধান বিচারপতির দায়িত্বও পালন করেন। সুলতান ও আমীর উমারা তার ভক্ত ছিলেন। সুলতান আশরাফ কায়তবাই ঘন্টার পর ঘন্টা তার সোহবতে বসে থাকতেন। এসব কিছুর পরও বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি একবার আবার নিজ দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। পরে আবার দ্বিতীয়বার তিনি কায়রোতে ফিরে আসেন। তখন কায়রোবাসী তাকে অত্যন্ত অভ্যর্থনাসহকারে গ্রহণ করেন।

তিনি অত্যন্ত মূল্যবান কিছু কিতাব রচনা করেন, যার মধ্যে বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'উমদাতুল কারী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি বোখারী শরীফের অন্যতম শরাহ। ২০ বছর লাগাতর সময় দিয়ে তিনি এটি রচনা করেন। তার রচিত হেদায়ার শরাহগ্রন্থ বিনায়া ও কানযুদ্দাক্বায়েকের শরাহ রমঝুল হাক্বায়েক হানাফী ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত হিসেবে মূল্যায়িত হয়ে থাকে। তার রচিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ কিতাব হল–

- عمدة القاري في شرح صحيح البخاري
- البناية في شرح الهداية وهو في الفقه الحنفي.
- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك في الفقه الحنفي.
- رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي أيضاً.
- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان وهو موسوعة ضخمة في التاريخ.
- السيف المهند في سبرة الملك المؤيد.
- الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ططر.

আল্লামা আইনী ৮১৪ হিজরি মোতাবেক ১৪১১ খ্রিস্টাব্দে জামেয়া আযহ-ারের পেছনে নিকটেই মাদরাসুল আইনী ও মসজিদুল আইনী প্রতিষ্ঠা করেন, যে বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। জামেয়া আযহারের মসজিদ ও মাদরাসা এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি এখানে মসজিদ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলেন সে সম্বন্ধে তার শাগরেদ আল্লামা সাখাবী আয-যাওউল লামে' (الضوء اللامع) কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লামা আইনী জামেয়া আযহারের মসজিদে নামায পড়াকে মাকরূহমুক্ত মনে করতেন না। কারণ, সাহাবায়ে কেরামকে কাফের বলা এক কট্টর শিয়া সে জায়গাটি ওয়াকফ করেছিল।

৮৫৫ হিজরি মোতাবেক ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা আইনী ইন্তেকাল

www.maktabatulabrar.com

করেন। তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাতুল আইনীতেই তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন। আমীন!

আল্লামা আহমদ কাসতাল্লানী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
(৮৫১–৯২৩ হি.)

মাদরাসাতুল আইনীতে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনির কবরের পাশে যে আহমদ কাসতাল্লানী-এর কবর রয়েছে তিনি হলেন আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী আল-কাসতাল্লানী আল-কাহিরী আশ-শাফিয়ী। তিনি শাফিয়ী মাযহাব অনুসারী কায়রোর একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তাকে ফখরুল উলামা (উলামায়ে কেরামের গর্ব) ও মানারুল উদাবা (সাহি-ত্যিকদের চেতনার মিনারা) বলা হত। তিনি ৮৫১ হিজরির ২২ যিলকদ জন্মগ্রহণ করেন। এবং ৯২৩ হিজরির ১ মুহাররম ৭২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

আল্লামা আহমদ কাসতাল্লানী হাফেজ সাখাবী, যাকারিয়া আনসারী, খালেদ আযহারী, বুরহান ইজলূনী ও আল-জালাল আল-কাবীর প্রমুখ বিখ্যাত উলামায়ের কেরামের ছাত্র। উস্তাদ-গুণে ছাত্র হিসেবে তিনিও তাদের ছাত্র হয়ে একজন বিখ্যাত আলেমে পরিণত হন।

আল্লামা আহমদ কাসতাল্লানী একজন উঁচুমানের লেখকও ছিলেন। তার রচিত কিতাবসমূহ নিম্নরূপ–

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.
- الإرشاد في مختصر الإرشاد (ولم يتمه).
- شرح صحيح مسلم إلى أثناء الحج.
- شرح الشاطبية.
- شرح البردة.
- مسالك الحنفا الصلاة على المصطفى.
- لطائف الإشارات في القراء ات الأربع عشرة.
- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية.

আল্লামা আহমদ কাসতাল্লানী (রহ.) জগৎবিখ্যাত আলেম বোখারী শরীফের শরাহগ্রন্থ উমদাতুল কারী-র রচয়িতা আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী-র পাশে শায়িত আছেন। দু'জন শারেহে বোখারী (বোখারী শরীফের শরাহ বা

ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনাকারী) পাশাপাশি শায়িত আছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়কে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন! (লেখাটি আল্লামা আহমদ কাসতাল্লানীর কবরের পাশে টানানো বোর্ড থেকে গৃহীত। বোর্ডে লিখিত আছে– এটি লিখেছেন জামেয়া আযহারের একজন গবেষক মুহাম্মাদ আল-হামলাবী আল-মাগরিবী।)

কিতাবের মার্কেট দর্শন

জামেয়া আযহারের পাশেই রয়েছে দ্বীনী কিতাবাদির প্রচুর সংখ্যক মাকতাবা তথা লাইব্রেরি। এখানকার লাইব্রেরিগুলো থেকে আমরা কিতাবাদি ইমপোর্ট করে থাকি। বহুদিন থেকেই এসব লাইব্রেরি দেখার আগ্রহ ছিল। কিতাব মার্কেট ঘুরে ঘুরে দেখলাম, লাইব্রেরি মালিকদের সাথে পরিচিত হলাম। বেশ দীর্ঘ সময় নিয়ে গোটা মার্কেটের বড় বড় লাইব্রেরিগুলো দেখলাম।

যারা আরবি কিতাবপত্র নাড়াচাড়া করেন বা এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে জড়িত তারা জানেন মিসরে এখন সব ধরনের দ্বীনী আরবি কিতাবপত্র ও রেফারেন্স বুকস মুদ্রিত হয়ে থাকে। এক সময় লেবাননের বৈরুতেই কেবল এসব বইপত্র ছাপা হত, কিন্তু কয়েক যুগ আগ থেকে মিসর বৈরুতকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। যদিও বৈরুতেও এসব কিতাবের মুদ্রণ বন্ধ হয়ে যায়নি তবে মিসরে মুদ্রিত কিতাব দামে কম বিধায় এখন বিশ্বে মিসরীয় মুদ্রণই বেশি বাজার পেয়েছে। বৈরুত ও মিসরের পাশাপাশি সৌদি আরবেও ইদানিং বেশ কিতাবপত্রের মুদ্রণ শুরু হয়েছে, তবে সৌদি মুদ্রিত কিতাবাদির মূল্য অধিক। কায়রোর দারুল হাদীছ, দারুস সালাম, তাওফীকিয়্যাহ, তাওফীকিয়্যাহ লিত্তুরাছ, দারে ইবনুল জাওযী, দারুল গদ আল-জাদীদ প্রভৃতি মাকতাবা তথা লাইব্রেরি দ্বীনী কিতাবাদি বিশেষত রেফারেন্স বুক্স মুদ্রণে অগ্রগামী রয়েছে। এসব লাইব্রেরির মালিকগণ যদি শুধুই দুনিয়া উপার্জনের নিয়ত না রাখেন, দ্বীনী খেদমতের চিন্তাও রাখেন, তাহলে অবশ্যই এটা বড় দ্বীনী খেদমত হচ্ছে। সারা বিশ্ব তাদের কাছে ঋণী। তবে দূরে থেকে চিন্তা করতাম এরা বুঝি শুধুই এসব বড় বড় কুরআন হাদীছ বিষয়ক কিতাবপত্রই ছেপে থাকে, কিন্তু তা নয়, কাছে গিয়ে দেখলাম তারা আজে বাজে নভেল নাটক, গল্প-গুজবের বই ইত্যাদি যতকিছু ছাপে তার তুলনায় এসব কিতাবপত্রের আইটেম তো নস্যি। আল্লাহ তাদের ভালটি কবূল করুন, খারাপটা মার্জনা করুন।

কায়রোর মাকতাবাগুলো কত আইটেমই তো ছেপে থাকে, বড় বড় কত

www.maktabatulabrar.com

রেফারেন্স বুকস তারা ছাপে তা অনেকেরই জানা আছে। একটা মজার আইটেমের কথা বলি যা অনেকের জানা নেই। সেটা হল– বড় বড় সাইজের কুরআন মাজীদ, যেগুলোর নাম দেয়া হয়েছে মুসহাফুত-তাহাজ্জুদ (مصحف التهجد) বা মুসহাফু কিয়ামিল লাইল (مصحف قيام الليل)। অর্থাৎ, তারাবীহতে তেলাওয়াতের কুরআন মাজীদ। আরব দেশের অনেক জায়গাতেই, মিসরেও সব জায়গাতে নয় তবে অনেক জায়গায় তারাবীহতে হাফেজগণ তেলাওয়াত করার সময় যেন লোকমা না লাগে তাই এরকম বড় সাইজের কুরআন মাজীদ পাশে কমর সমান উঁচু রেহালের উপর রেখে তারাবীহ পড়ান, প্রয়োজনের সময় নামাযের মধ্যেই দেখে নেন বা দেখে দেখে তেলাওয়াত করেন, যাতে লুকমার হাত থেকে বাঁচতে পারেন। বিনা লুকমায় পড়ানোর ফুটানি দেখাতেই এমন ছেলেমিপনা আর কি! আরে! কোনো লুকমা লাগবে না– এমন দাহরিয়া হাফেজই যদি হয়ে থাক, তাহলে না দেখে বিনা লুকমায় তেলাওয়াত করেই তা প্রমাণ কর। দেখে পড়লে তো সন্দেহ হয় তুমি দাহরিয়া হাফেজ হওয়া তো দূরের কথা আদৌ হাফেজই কি না।

মুসহাফুত-তাহাজ্জুদ বা মুসহাফু কিয়ামিল লাইল

মসজিদে হুসাইনে গমন

বাদ মাগরিব মসজিদে হুসাইনে গমন করলাম। জামেয়া আযহার ও জামেয়া আযহারের মসজিদের সামনে যে সড়ক তার অপর পাশেই মসজিদে

হুসাইন। এই হুসাইন নাম থেকেই গোটা এলাকার নাম হয়েছে হুসাইন এলাকা (حي الحسين)। মসজিদটি ফাতেমী রাজত্বকালে ৫৪৯ হিজরি মোতাবেক ১১৫৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করা হয়। কারও কারও বিশ্বাস যে, এখানে (মসজিদ সংলগ্ন স্থানে) হযরত হুসাইন (রা.)–এর মাথা দাফন করা রয়েছে। (এটি অত্যন্ত শানদার কবরের মত করে রাখা আছে।) এ থেকেই মসজিদটির নাম করা হয়েছে মসজিদুল হুসাইন। ঘটনার বিবরণ এরকম– ক্রুসেড যুদ্ধের সময় (৫৪৮ হিজরিতে) মিসরের ফাতিমী খলীফা আসকালান শহরে কবরস্থ হযরত হুসায়ন (রা.)-এর মাথার ব্যাপারে ইংরেজদের থেকে খারাপ আশংকা বোধ করে সেখান থেকে মাথা আনয়ন করে এখানে দাফন করেন। ঐতিহাসিক মাকরীযী এমনই লিখেছেন। ফাতেমী যুগের জামেয়া কায়রোর উস্তাদ ঐতিহাসিক আইমেন ফুয়াদ 'আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়্যা ফী মিসর' (الدولة الفاطمية في مصر) গ্রন্থে এটাকে ফাতেমীদের কৃতিত্ব হিসেবে উল্লেখ করার মাধ্যমে এটার সমর্থন করেছেন। তবে এ মতটি মীমাংসিত নয়। হযরত হুসাইন (রা.)-এর মাথা কোথায় দাফন হয়েছিল সেটিই তো মীমাংসিত নয়। হযরত হুসাইন (রা.)-এর মাথা কোথায় দাফন হয়েছে এ ব্যাপারে আরও ৪টি মত রয়েছে। যথা:

১. তার মাথা সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে।

২. তার মাথা সিরিয়ার রাক্কা (الرقة/Raqqah) শহরে।

৩. তার মাথা ইরাকের কারবালায়।

৪. তার মাথা মদীনায়।

অতএব আগে দলীল-প্রমাণ দ্বারা হযরত হুসাইন (রা.)-এর মাথা আসকালানে ছিল সেটা নিশ্চিত করতে হবে, কিংবা সেটার প্রাধান্য প্রমাণিত করতে হবে, তারপর তার মাথা কাদের দ্বারা আনা হয়েছিল, কীভাবে আনা হয়েছিল, মাথা চিহিত করা গিয়েছিল কীভাবে- এরকম অনেক কিছু অকাট্যভাবে প্রমাণিত করা গেলেই হুসাইন এলাকায় তার মাথা আনয়ন ও তা দাফন হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

www.maktabatulabrar.com

মানশিয়াতুল বাক্কারিতে বয়ানের প্রোগ্রাম

১৫/৪/১৯ সোমবার পিরামিড দেখা শেষে আমরা গেলাম মেজবানের কারখানা পরিদর্শনে। এটি হল গার্মেন্টস সামগ্রী তৈরির কারখানা। কারখান-াটি কায়রো পুরাতন শহরের মানশিয়াতুল বাক্কারী এলাকায় (কায়রোর একেবারে পশ্চিম এলাকায়) অবস্থিত। মেজবান কর্তৃক গৃহীত এ কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে দ্বীনদারী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখে মুগ্ধ হলাম। বাদ মাগরিব শ্রমিকদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বয়ান রাখলাম। বয়ানের সারকথা ছিল–

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم : وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا.

আপনারা প্রবাসী। আপনারা প্রবাসে এসেছেন কষ্ট করে উপার্জন করে সেই উপার্জন দেশে গিয়ে আরামে ভোগ করার নিয়তে। কেউ প্রবাসে এই নিয়তে আসে না যে, এখানে উপার্জন করবে আর এখানেই থেকে সেই উপার্জন ভোগ করবে, এখানেই সব আরাম-আয়েশ মিটিয়ে নিবে। বরং প্রবাসে আসে আসল বাড়ির জন্য উপার্জন করে নিতে। তাই প্রবাসীরা প্রবাসে থেকে যা উপার্জন করে সেখানে কোনো রকম জীবন ধারণের জন্য যতটুকু না হলে নয় ততটুকু ভোগ করে, আর বাকি সবটা নিজেদের দেশে প্রেরণ করে। যাতে প্রবাস থেকে দেশে ফেরার পর সেখানে গিয়ে দীর্ঘ দিন আরামে জীবন চালাতে পারে। মানুষ প্রবাসে আসে, প্রবাসে থাকে কিন্তু সর্বক্ষণ তার মাথায় থাকে আসল বাড়ির চিন্তা। যদি কেউ প্রবাসে থেকে যা আয়-উপার্জন করে

সবটা প্রবাসেই ভোগ করার জন্য করে, যেন প্রবাসই তার আসল বাড়ি, আসল বাড়ির কথা সে ভুলে যায়, তাহলে সবাই তাকে বোকা বলবে।

এমনিভাবে পরকালের বিচারে আমরা সকলেই প্রবাসী। আমাদের সকলের মূল দেশ বা মূল বাড়ি হল জান্নাত। এই দুনিয়াটা আমাদের জন্য প্রবাস। আমরা দুনিয়া রূপ প্রবাসে এসেছি এখান থেকে আমাদের আসল বাড়ির জন্য কিছু উপার্জন করে নিতে। অতএব আমরা দুনিয়ার জন্য ততটুকুই করব যতটুকু না হলে দুনিয়ায় জীবন ধারণ সম্ভব নয়। দুনিয়ার জন্য ততটুকু করার পর বাকি সবটা করব পরকালের জন্য তথা পরকালের বাড়ি জান্নাতের জন্য। দুনিয়ার কাজ করব কিন্তু সর্বক্ষণ মাথায় থাকবে আসল বাড়ি তথা পরকাল ও জান্নাতের কথা। কেউ যদি সবকিছু শুধু দুনিয়ার জন্যই করে, দুনিয়াকেই সে তার আসল ঠিকানা মনে করে, আসল ঠিকানা পরকাল তথা জান্নাতের কথা ভুলে যায়, তাহলে সে বোকা। অতএব আমাদের উচিত সর্বক্ষণ আসল বাড়ির কথা চিন্তায় রাখা। আসল বাড়ির জন্য কিছু পাঠানোর চিন্তা রাখা।

প্রবাস থেকে বাড়ির জন্য আমরা টাকা-পয়সা পাঠাই, কারণ বাড়ি গিয়ে সেই টাকা-পয়সা ভোগ করা যাবে। কিন্তু পরকালের বাড়িতে টাকা-পয়সা কাজে লাগবে না, বরং সেখানে কাজে লাগবে নেকি। পরকালের জন্য নেকি পাঠাতে হবে। প্রবাসে থেকে টাকা-পয়সা পাঠালে তা অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়, হাতছাড়া হয়ে যায়, কিন্তু আখেরাতের জন্য যা নেকি পাঠানো হবে তা কোনোভাবেই নষ্ট হবে না, বরং আল্লাহর কাছে তা ঠিকমত পাওয়া যাবে, এমনকি আমরা তা যেভাবে পাঠাব আল্লাহ তাআলা তার চেয়ে সুন্দরভাবে আমাদেরকে তা বুঝিয়ে দিবেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমের সূরা মুয্যাম্মিলে ঘোষণা করে দিয়েছেন–

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا.

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের জন্য যে নেকি অগ্রিম পাঠাবে তা আল্লাহর কাছে উত্তমরূপে বড় পুরস্কাররূপে পাবে।

আমি এই কারখানার ব্যবস্থা ও পরিবেশ দেখে যারপর নাই খুশি হয়েছি। অধিকাংশ মিল-ফ্যাক্টরির অবস্থা হল সেখানে শ্রমিক কর্মকর্তারা নামায পড়তে চাইলেও কর্তৃপক্ষ তাদেরকে সে সুযোগ পর্যন্ত দেয় না বা দিতে চায় না। নামাযের জন্য সেখানে কোন জায়গাও রাখা হয় না। অথচ এখানে নামাযের জন্য ভিন্ন জায়গা রাখা হয়েছে, এখানে যারা কাজ করে তাদেরকে নিয়মিত

www.maktabatulabrar.com

নামায আদায় করার জন্য শুধু উদ্বুদ্ধ করা হয় না বরং বলা যায় নিয়মের আওতায় তাদেরকে অনেকটা বাধ্য করা হয়। নামাযের পর ফাযায়েল মাসায়েলের তালীমও করা হয়। নামায তেলাওয়াত যেন সহীহ হয় তার জন্য কুরআন সহীহ করার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। মনে হচ্ছে কারখানার মালিক আপনাদের শুধু দুনিয়াবী মুরব্বী নয় দ্বীনী মুরব্বির ভূমিকাও পালন করছেন। এই কারখানার শ্রমিক কর্মকর্তাদের জন্য এটা নেয়ামত স্বরূপ। নেয়ামতের শোকর আদায় করুন। মালিকের জন্য আন্তরিক হোন। মালিকের জন্য দুআ করুন। সকলে দ্বীনী ভাই ভাই হিসেবে মিল-মহব্বতের সাথে থাকুন। আল্লাহ আপনাদের সকলকে আরও বেশি নেক আমলের তাওফীক দান করুন। সকলের আয়-উপার্জনে বরকত দান করুন। প্রবাসে আল্লাহ আপনাদেরকে ভাল রাখুন, দেশে আপনাদের পরিবার-পরিজনকে ভাল রাখুন। আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

১৬/৪/১৯ মঙ্গলবার

ড. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আবূ মূসা-এর বয়ান শ্রবণ

জামেয়া আযহারের মসজিদে জোহর নামায আদায় করলাম। এই মসজিদে বাদ জোহর প্রায় প্রতিদিনই জামেয়ার কোন বড় আলেমের বয়ান থাকে। আজ বাদ নামায জামেয়ার অলংকার শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ড. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আবূ মূসা-এর বয়ানের প্রোগ্রাম ছিল। তিনি আসরারুল বালাগাহ (أسرار البلاغة) আল-এজাজুল বালাগী (الإعجاز البلاغي) ইত্যাদি গ্রন্থ লিখেছেন। দাড়ী খসখসি। টুপীহীন। ট্রাউজার পরিহিত। কাইফিয়াত দেখে মনে খুব দুঃখ লাগল। তবে বয়ান ছিল অত্যন্ত তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ। তিনি জীবন, মৃত্যু ও পুনঃজীবন সম্বন্ধে বেশ তাত্ত্বিক ও যুক্তিনির্ভর বয়ান পেশ করছিলেন।

মানইয়াল আর-রওযায় গমন

১৬/৪/১৯ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব মানইয়াল আর-রওযায় (منيل الروضة) গমন করলাম। এটাকে তাকী উছমানী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম ‘জাহানে দীদাহ’ গ্রন্থে রাওযাতুল জাযীরাহ (روضة الجزيرة) নামে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ঐই নামে কেউ এখন চেনে না। তবে কেউ কেউ এখনও জাযীরাতুর রওযা (جزيرة الروضة) নামে উল্লেখ করে থাকে। এটা নিয়ে অনেক ঘাটাঘাটি করে পরে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে যে, এটিকে এখন মানইয়াল আর-রওযা বলা

হয়। কায়রোর বর্তমান মানচিত্রেও এটির নাম লেখা হয় মানইয়াল আর-রওযা। এটিও নীল নদের মাঝে একটি দ্বীপ। যে দ্বীপে কায়রো টাওয়ার অবস্থিত তারই সামান্য কিছু দক্ষিণে এ দ্বীপটির অবস্থান। আমি ও মাওলানা আব্দুল হালীম পায়ে হেঁটে মানইয়াল আর-রওযার বেশ কিছু অংশ ঘুরে দেখেছি।

মানইয়াল আর-রওযা কায়রোর বড় একটি ঐতিহাসিক মহল্লা। ইখশিদী (الإخشيدي/Ikhshidid) রাজবংশের কাল পর্যন্ত এটি জাযীরায়ে মিসর (جزيرة مصر) তথা মিসরের দ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ২০ হিজরিতে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) যখন ব্যবিলন দূর্গের দক্ষিণে অবস্থিত মিসরের দূর্গ (যে সম্বন্ধে পরের পরিচ্ছেদে আলোচনা আসছে।) অবরোধ করেন এবং দীর্ঘ ৭ মাস অবরোধের পর ৬৪১ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ২০ হিজরির ১৮ রবিউছ ছানী তারিখে এর পতন ঘটে, তখন কিবতী সম্রাট মুকাওকিস সেই দূর্গ থেকে বের হয়ে এই দ্বীপের একটি দূর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এবং নীল নদের উপর স্থাপিত এই দূর্গে পৌঁছার সব পুল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, যাতে মুসলমানরা নদী পার হয়ে দূর্গ পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। অন্য দিকে মুকাওকিস রোমান সম্রাট কায়সারের নিকট সাহায্যের আবেদন করেছিলেন যাতে পেছন দিক থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা হয়। এ অবস্থায় মুকাওকিস দূতের মাধ্যমে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর নিকট এই মর্মে পত্র প্রেরণ করেন যে, তোমরা এখন একদিকে নীল নদ অন্যদিকে রোমান সৈন্যবাহিনীর মাঝে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছ। তোমাদের অবস্থা এখন আমাদের হাতে বন্দিদের মত। অতএব মংগল চাইলে সন্ধির আলোচনার জন্য কিছু লোক আমাদের নিকট প্রেরণ কর। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) তৎক্ষণাত কোন উত্তর না দিয়ে দুই দিন দুই রাত দূতদের মেহমান হিসেবে রেখে দেন। যাতে তারা মুসলমানদের দিবারাতের আমল ও মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা সম্বন্ধে অবগত হতে পারে। দুই দিন পর দূতগণ হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর কাছ থেকে এই বার্তা নিয়ে মুকাওকিসের নিকট ফিরে গেল যে, হয় ইসলাম গ্রহণ কিংবা জিযয়া প্রদান কিংবা যুদ্ধ– এই তিন কথার বাইরে চতুর্থ কোন কথা গ্রহণীয় নয়। তখন মুকাওকিস দূতদের কাছে জানতে চাইলেন মুসলমানদেরকে তোমরা কেমন পেয়েছো? তারা জানাল–

رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة، والتواضع أحب إليهم من الرفعة، ليس

www.maktabatulabrar.com

لأحدهم في الدنيا رغبة لا نهمة، وإنما جلوسهم على التراب، وأكلهم على ركبهم، وأميرهم كواحد منهم، ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد من العبد، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم. (النجوم الزاهرة)

অর্থাৎ, আমরা এমন এক সম্প্রদায়কে দেখে এসেছি যাদের কাছে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই বেশি প্রিয়। অহংকারের চেয়ে বিনয় তাদের পছন্দনীয়। দুনিয়ার প্রতি না তাদের আগ্রহ আছে, না তারা কেউ পেটের ধান্ধায় থাকে। তারা দিব্যি মাটিতে বসে পড়ে। হাঁটু গেড়ে আহার করে। তাদের আমীর তাদেরই একজনের মতো। দেখা দৃষ্টিতে বুঝা যায় না কে তাদের মধ্যে উঁচু আর কে নিচু। গোলামকেও মুনিব থেকে ফারাক করা যায় না। যখন নামাযের সময় উপস্থিত হয় তাদের কেউ তা থেকে পিছিয়ে থাকে না– অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধুয়ে বিনয়ের সাথে নামায আদায় করে। (আন-নুজূমুয-যাহিরা)

মুকাওকিস এ বক্তব্য শোনার পর বলেছিলেন, তাদের সামনে পর্বত এলেও তারা তা টলিয়ে দিবে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাধ্য কারও নেই। অবশেষে পারস্পরিক বার্তা আদান-প্রদান হয়। এক পর্যায়ে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.)-এর নেতৃত্বে দশ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল মুকাওকিসের নিকট প্রেরণ করেন। মুকাওকিস তাদেরকে অর্থকড়ির লোভ দেখানোর চেষ্টা করেন। তিনি মুসলমানদের অভাব-অনটন ও দূর্দশার কথা তুলে ধরে তাদেরকে এই আশ্বাস প্রদান করেন যে, মুসলমানরা তার প্রস্তাব মেনে নিলে তাদের দূর্দশা লাঘব হবে। মুকাওকিস তাদেরকে এই ভয়ও দেখান যে, তোমাদের মোকাবেলা করার জন্য এত বিপুল সংখ্যক রোমান সৈন্য আসছে যাদের ঠেকানোর ক্ষমতা তোমাদের নেই। তখন উবাদাহ ইবনুস সাামিত (রা.) এমন ঈমানদীপ্ত ও আখেরাতের ফিকির উজ্জীবিত বক্তব্য পেশ করেন যা শুনে মুকাওকিসের আশার গুড়ে বালি পড়ে গেল। হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) সাফ জানিয়ে দিলেন খোদার কসম! এসব সৈন্যবাহিনীর ভয় আমরা পাই না। এতে আমাদের হিম্মতে কিছুই চিড় ধরবে না। বরং আমাদের হিম্মত ও জেহাদের জযবা আরও বৃদ্ধি পাবে এই চিন্তা করে যে, এতে আমরা শহীদ হলে তার বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত লাভ করতে পারব। সবশেষে হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) সেই তিন কথার (হয় ইসলাম গ্রহণ, কিংবা জিযয়া প্রদান কিংবা যুদ্ধ) পুনরাবৃত্তি করে জানতে চাইলেন, এর মধ্যে কোনটি আপনি বেছে

নিবেন? মুকাওকিস জিযয়া প্রদানের দিকে ঝুকছিলেন কিন্তু সঙ্গীদের কথায় শেষ পর্যন্ত তা মানতে পারলেন না। যুদ্ধ হল এবং আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বিজয় দান করলেন। (আন্-নুজুমুয যাহিরা গ্রন্থে হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত [রা.]-এর বক্তব্য সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।)

পরে ৫৪ হিজরীতে মুসলামরা এই দ্বীপে জাহাজ তৈরির কারখানা নির্মাণ করেছিল। এটা ছিল মিসরে জাহাজ নির্মাণের প্রথম কারখানা। পরবর্তীতে ইখশিদী (الإخشيدي/Ikhshidid) রাজবংশের আমলে এই দ্বীপকে প্রমোদ ভ্রমণ ও বিনোদনের বাগানে পরিণত করা হয়। সেখান থেকে এর নাম হয় রওযা (□□□□)। আরবিতে বাগানকে বলে □□□□ (রওযা)। বর্তমানে এর নাম মানইয়াল আর-রওযা।

উল্লেখ্য, বর্তমানে মানইয়াল আর-রওযা কোন ফাঁকা দ্বীপ নয় বরং একটি জনবহুল ও প্রতিষ্ঠানবহুল এলাকা। এর মধ্যে আছে বহু আবাসিক ভবন, পুলিশ স্টেশন, কয়েকটি হাসপাতাল, যাদুঘর, আমীর মুহাম্মাদ আলীর প্রাসাদ ইত্যাদি অনেক কিছু। এর সর্বদক্ষিণে রয়েছে নীলের পানি প্রবাহ এবং পানির পরিমাণ পরিমাপ করার প্রতিষ্ঠান মিকইয়াছুন্নীল (مقياس النيل/ Nilometer)

মানইয়াল আর-রওযা-র ছবি

www.maktabatulabrar.com

আমীর মুহাম্মাদ আলীর দুর্গ (মানইয়াল আর-রওযা)

ব্যবিলন দুর্গ দর্শন

মানইয়াল আর রওযার পূর্ব পাশে নীলের যে শাখা তার পূর্ব-তীরে মার জিরজিস (مار جرجس) এলাকা। কায়রোবাসীরা উচ্চারণ করে মার গিরগিস। আরবি নামের উচ্চারণ হিসেবে বলা উচিত মার জিরজিস। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, কায়রোর আঞ্চলিক উচ্চারণে জীমকে জ নয় বরং গ-এর ন্যায় উচ্চারণ করা হয়। তাই বলা হয় মার গিরগিস। ইংরেজিতেও সেভাবেই লেখা হয় mar girgis। এখানে মার গিরগিস মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন। এই স্টেশন সংলগ্ন রাস্তার পূর্ব পাশেই ব্যবিলন দুর্গ (حصن بابليون/Babylon Fortress)। রোমান সম্রাট ট্রাজান (تراجان/Trajan) এটি নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে রোমান সম্রাট আরকাডিউস (اركاديوس/Arcadius) এটির সংস্কার ও বিস্তৃতি সাধন করেন।

ব্যবিলন দুর্গটি রোমানী দুর্গ (الحصن الروماني) নামেও পরিচিত। এটি কাসরুশ শামা' (قصر الشمع) নামেও পরিচিত, যার অর্থ বাতির প্রাসাদ। এই নামকরণের হেতু হল প্রতি মাসের শুরুতে এই দুর্গের কোন একটি চূড়ায় বাতি জ্বালানো হত, যা সূর্যের এক রাশি থেকে আর এক রাশিতে গমনের ইংগিত বহন করত।

এই দুর্গের মধ্যে ১টা কিবতী যাদুঘর, ৬টা কিবতী গির্জা ও মঠ রয়েছে।

এই দূর্গের কিছুটা দক্ষিণে ছিল মিসরের প্রাচীন দূর্গ, হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)–এর হাতে যার পতন ঘটেছিল। ৬৪১ খ্রীস্টাব্দ মোতাবেক ২০ হিজরির ১৮ রবিউছ ছানী তারিখে ৭ মাস অবরোধের পর এর পতন ঘটেছিল, যার বর্ণনা পূর্বের পরিচ্ছেদে করা হয়েছে।

মার গিরগিস মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন

ব্যবিলন দূর্গ

১৯/৪/২০১৯ শুক্রবার

www.maktabatulabrar.com

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.)–এর কবর যেয়ারত

সকাল ১০ ঃ ৩০ মিনিটে বাসা থেকে বের হই। আবার গেলাম ক্বারাফা এলাকায়। আগে একদিন এই এলাকায় গিয়েছিলাম, কিন্তু সেদিন সবকিছু চিনে উঠতে পারিনি। আজ আল্লাহর ইচ্ছায় লাইছ ইবনে সা'দ-এর মাজারে গিয়েই জামেয়া আযহারের ফারেগ প্রবীণ এক আলেমের সাক্ষাত পেলাম, তার নামটি জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম। তাকে জানালাম আমরা এখানে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছি, কিন্তু তেমন কিছুই চিনি না। তিনি তার হাতে রাখা একটি ফাইল থেকে নিজের হাতে আঁকা একটি ম্যাপ বের করে দিলেন, যাতে ঐ এলাকা ও আশপাশের অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের কবর ইত্যাদি চিহ্নিত করা ছিল। ম্যাপটি আমাদের যিয়ারতে অনেক উপকারে এসেছে। (তবে তার প্রদত্ত ম্যাপে যেসব মনীষীদের কবর চিহিত করা আছে তার মধ্যে অনেক অনিশ্চিত বিষয়ও রয়েছে।)

এই ম্যাপ অনুযায়ী আমরা ইবনে হাজার আসকালানীর কবরে গিয়ে আবার সালাম করলাম। তার কবরকে বাম হাতে রেখে একটু সামনে অগ্রসর হলেই উকবা ইবনে আমের সড়ক (شارع عقبة بن عامر) শুরু হয়। এই সড়ক সোজা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানেই বাম পাশে মসজিদে উকবা ইবনে আমের। সেই মসজিদের সাথেই তার কবর। কবরটি যে রুমে সেটা এক সময় মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়। কারণ তাতে মেহরাব রয়েছে। মনে হয় এটিই মূল মসজিদে উকবা ইবনে আমের। মসিজদের কেবলার দিকে হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.)-এর বংশধরের অনেকের কবর রয়েছে। সম্প্রতি মিসরের একজন গবেষকের তাহকীক হল হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.)-এর কবরের পাশেই হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর কবরও রয়েছে। উক্ত গবেষক ছাড়াও আরও অনেকে এই মত পোষণ করেন যে, হযরত উকবা ইবনে আমের ও হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর কবর একই স্থানে। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.)-এর কবরের পাশে একটি বোর্ডে হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.)-এর পরিচিতি বর্ণনা করা আছে। তাতেও একথা লেখা আছে যে, হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.)-এর কবরের পাশেই হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর কবরও রয়েছে।

মসজিদে উকবা ইবনে আমের (রা.)

হযরত উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হযরত উকবা ইবনে আমের ইবনে আব্‌স ইবনে মালিক জুহায়নাহ গোত্রের প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি ওহী লেখক সাহাবীদের একজন। ফারায়েয ও ফিক্‌হ বিষয়েই তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। শুদ্ধ আরবি ভাষী ও কবি ছিলেন। কারী ছিলেন। তার কুনিয়াত (উপনাম) আবূ আব্‌স বা আবূ আম্‌র বা আবূ আমির বা আবূ হাম্মাদ।

যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন উকবা ইবনে আমের (রা.) মদীনায় ছিলেন না, বকরি চরাতে ময়দানে গিয়েছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন সংবাদ শুনে বকরি ইত্যাদি সব ফেলে দিয়ে মদীনায় ছুটে আসেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) বীর যোদ্ধা ছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধগুলোতে তিনি শরীক ছিলেন। তিনি মিসর

www.maktabatulabrar.com

বিজয়ের সময় হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন। ফুছতাত বিজয়ের পর হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) তাকে আশ-পাশের সব এলাকায় প্রেরণ করেন। তিনি সেসব এলাকা জয় করেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেন যেভাবে ফুছতাত এলাকার অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করা হয়েছিল। তিনি দামেস্ক বিজয়ে অংশ নিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা.)কে দামেস্ক বিজয়ের সু-সংবাদ তিনিই পৌঁছিয়েছিলেন। ফিলিস্তীনের গাযযা ইত্যাদি এলাকায় যুদ্ধে তিনি হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সঙ্গে ছিলেন। এ ছাড়াও অনেক যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) খুব সুন্দর আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারতেন। তিনি পুরো কুরআন মজীদ লিখে নিজের সঙ্গে রেখেছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, তার লিখিত সেই কপি (মুসহ-াফ) এখনও মিসরে রয়েছে। তাতে সূরাসমূহের তারতীব মুসহাফে উছমানী থেকে ব্যতিক্রম। তার শেষে লেখা আছে– وكتبه عقبة بن عامر بيده অর্থাৎ, উকবা ইবনে আমের নিজ হাতে এই মুসহাফ লিখেছে।

তিনি ৪৪ হিজরি থেকে ৪৭ হিজরি পর্যন্ত মিসরের গভর্ণরের দায়িত্ব পালন করেন। তার সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ৫৫টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর অধিকাংশ তার থেকে মিসরীয় রাবীগণ বর্ণনা করেছেন।

৫৮ হিজরিতে হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) ইন্তেকাল করেন। তাকে ক্বারাফা এলাকায় হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর কবরের পাশে দাফন করা হয়। এখন সেখানে মসজিদে উকবা ইবনে আমের (مسجد عقبة بن عامر) নামে একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদটির পাশেই তার কবর।

মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া ও রাবেয়া আল-আদাবিয়ার তথাকথিত কবর

পূর্বে বলেছি, উকবা ইবনে আমের সড়ক যেখানে শেষ হয়েছে তার বাম হাতে হযরত উকবা ইবনে আমেরের মসজিদ ও তার কবর। আর ডান হাতে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া ও রাবেয়া আল-আদাবিয়া (رابعة العدوية) তথা রাবেয়া বসরিয়ার-এর কবর বলে এলাকায় পরিচিতি রয়েছে। পাশে যুন্নুন মিসরীর কবরও রয়েছে। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া ও রাবেয়া আল-আদাবিয়া (رابعة العدوية) তথা রাবেয়া বসরিয়ার-এর কবর এখানে বলে যে পরিচিতি রয়েছে তা সঠিক নয়। কেন সঠিক নয় নিম্নে তার কিছু বিবরণ প্রদান করা গেল। তাদের উভয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনীও পেশ করা হল।

মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া ও তার কবর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা

মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া হচ্ছেন হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)-এর পুত্র। তার মাতা খাওলা বিনতে জা'ফর ইবনে কায়ছ আল-হানাফিয়্যাহ। হাসান ইবনে আলী ও হুসাইন ইবনে আলী থেকে ভিন্নতা বুঝানোর জন্য তাকে মুহাম্মাদ ইবনে আলী না বলে তার মায়ের দিকে সম্পৃক্ত করে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া বলা হয়। ১৬ হিজরীতে হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়ার জন্ম হয়। তিনি একজন বীর-বাহাদুর মানুষ ছিলেন। জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনে তিনি তার পিতা হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি এসব যুদ্ধে পতাকা বহন করেন। এসব যুদ্ধে তার প্রতি হযরত আলী (রা.)–এর অগাধ আস্থা ছিল। অত্যন্ত পরহেযগার ও ইলমের অধিকারী ছিলেন। বুখারী মুসলিমে তার থেকে বেশ কিছু সংখ্যক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ৮১ হিজরির ১ মুহাররম তিনি ইন্তেকাল করেন।

তার কবর কোথায় তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের অনেক মত রয়েছে। যেমন:

১. তার কবর মদীনার বাকী' কবরস্থানে।
২. তার কবর মক্কা ও মদীনার মাঝে।
৩. তার কবর তায়েফে।
৪. তার কবর আইলা বা আকাবায়।
৫. তার কবর ইরানের বূশহরে।
৬. তার কবর ইরানের রোদবার শহরে।
৭. তার কবর কায়রোর বাবুল ওয়াযীর (باب الوزير) নামক স্থানে[১]।
৮. তার কবর ক্বারাফায় হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.)-এর কবর এলাকায় যুন্নুন মিসরীর কবরের পাশে। ইত্যাদি অনেক মত রয়েছে। এক ইরানেই (বূশহর ও রোদবার শহর ছাড়াও) অনেক স্থানে তার কবর থাকার মত রয়েছে।

এই মতগুলোর মধ্যে প্রথম মতকেই প্রাধান্য দেয়া হয় অর্থাৎ, মদীনাতেই তার কবর– এই মতকে প্রাধান্য দেয়া হয়। কেননা ইমাম বাকের বলেছেন, আমি আমার চাচাকে দাফন করেছি। আর ইমাম বাকেরের জন্মও মদীনায় ওফাতও মদীনায়। এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়ার জানাযার নামায পড়িয়েছেন হযরত আবান ইবনে উছমান (রহ.)। আর আবান ইবনে উছমান

১. 'বাবুল ওয়াযীর' সালাহ উদ্দীন আইয়্যূবির দূর্গ থেকে উত্তর দিকের একটা এলাকা। সেখানে বাবুল ওয়াযীর নামে একটা সড়ক (شارع باب الوزير/Bab El-Wazir st.)ও রয়েছে। বাবুল ওয়াযীরকে বাবুল ওয়াদা' (باب الوداع)ও বলা হয়।

www.maktabatulabrar.com

ইবনে আফফান মদীনারই তাবিয়ী। এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়ার কবর ক্বারাফা এলাকায় বা বাবুল ওয়াযীরে- এটা যে আদৌ সঠিক নয় তা আল্লামা সাখাবীর কথায় অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি 'তুহফাতুল আহবাব' কিতাবে বলেছেন,

ويوجد مشهد معروف بمحمد بن الحنفية بن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم ، وليس بصحيح ، فإن المنقول عن السلف أنه لم يمت بمصر أحد من أولاد الإمام على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. (تحفة الأحباب وبغية الطلاب ص ٣٧٢)

অর্থাৎ আলী ইবনে আবী তালিবের পুত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়ার কবর হিসেবে পরিচিত একটি কবর এখানে পাওয়া যায়। এটা সঠিক নয়। কেননা পূর্বসূরীদের কারও থেকে বর্ণিত নেই যে, আলী (রা.)-এর আওলাদের কারও মৃত্যু মিসরে হয়েছে। উপরোক্ত কিতাবে তিনি আর এক জায়গায় আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, **السيد محمد بن الحنفية لم يدخل مصر** অর্থাৎ, সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া কখনও মিসরে প্রবেশই করেননি। (অতএব তার কবর মিসরে থাকার প্রশ্নই ওঠে না।)

রাবেয়া বসরিয়া ও তার কবর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা

রাবেয়া আল-আদাবিয়া (رابعة العدوية) অনেকের কাছে রাবেয়া বসরিয়া হিসেবে পরিচিত। তার উপনাম 'উম্মুল খায়র'। ইসলামী তাসাওউফের জগতে তিনি একজন প্রসিদ্ধ নারী। তিনি ১০০ হিজরি মোতাবেক ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মায়ের চতুর্থ কন্যা বিধায় 'রাবেয়া' বলে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। রাবেয়া (رابعة) শব্দের অর্থ চতুর্থ। তিনি জীবনে কখনও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হননি। তিনি আল্লাহর ভয়ে সর্বদা কাঁদতেন। নামাযেও এত কাঁদতেন যে, কাঁদতে কাঁদতে সাজদার জায়গা পর্যন্ত ভিজে যেত। তার মধ্যে মৃত্যুর চিন্তা এত বেশি ছিল যে, সর্বদা কাফনের কাপড় সঙ্গে রাখতেন। কখনও জাহান্নামের কথা শুনলে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতেন। সারা রাত তাহাজ্জুদে কাটাতেন। সুবহে সাদেকের সময় সামান্য একটু ঘুমাতেন। ফর্শা হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি উঠে নিজেকে তিরস্কার করে বলতেন, আর কতকাল শুয়ে থাকবে? শীঘ্রই কবরে ঘুমানোর সময় পাবে। এতটা দুনিয়ার মোহত্যাগী ছিলেন যে, কেউ তাকে কোনকিছু উপহার দিলে এই বলে তা ফেরত দিতেন যে, দুনিয়া দিয়ে কী করব? আমার দুনিয়ার কোনো-কিছুর প্রয়োজন নেই। এভাবে সারা জীবন অত্যন্ত মুজাহাদা ও সাধনার মধ্যে

অতিবাহিত করেছেন। তার উপদেশমূলক অনেক বাণী প্রসিদ্ধ রয়েছে। ইবনে খাল্লেকান রাবেয়া বসরিয়ার এক মহব্বতের মানুষ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, আমি রাবেয়ার জন্য দুআ করতাম। একদিন আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম তিনি বলছেন, তোমার হাদিয়া নূরের পেয়ালায় করে –যা নূরের রোমাল দিয়ে ঢাকা থাকে– আমার কাছে পেশ করা হয়।

সহীহ মত অনুসারে ১৮০ হিজরি মোতাবেক ৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। বসরাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

তার কবর কোথায় তা নিয়ে একটা মত এরূপ আছে যে, তার কবর ফিলিস্তীনের আল-কুদস (বাইতুল মুকাদ্দাস) এলাকায় তূরে যাইতা (طور زيتا) নামক পাহাড়ের চূড়ায়। কিন্তু ইয়াকূত হামাবী 'মু'জামুল বুলদান' গ্রন্থে লিখেছেন যে, আল-কুদসের সেই কবরটি আহমদ ইবনে আবিল হাওয়ারী নামক একজন লোকের স্ত্রীর কবর, রাবেয়া আদাবিয়ার (রাবেয়া বসরিয়ার) কবর নয়। আহমদ ইবনে আবিল হাওয়ারী নামক লোকটির সেই স্ত্রী রাবেয়া আশ-শামিয়া (رابعة الشامية) হিসেবে পরিচিত। তার মৃত্যু হয় ২৩৫ হিজরিতে। ইয়াকূত হামাবী বলেছেন, (রাবেয়া আদাবিয়ার কবর আল-কুদসে নয়–) এ মতের জোরালো সমর্থন এজন্য করতে হয় যে, রাবেয়া আদাবিয়া কোনদিন শাম দেশে গমনই করেননি। তাই তার কবর আল-কুদসে হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। (উল্লেখ্য, আল-কুদস বা বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকা প্রাচীন শাম-এরই অন্তর্ভুক্ত।) ইয়াকূত হামাবী ছাড়াও আরও অনেকে বলেছেন, রাবেয়া বসরিয়া হজ্জ ব্যতীত বসরার বাইরে আর কোথাও গমন করেননি। অতএব বসরার বাইরে নয়, বসরাতেই তার কবর– এটাই স্বাভাবিক।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, কায়রোতে (কায়রোর কেন্দ্র থেকে দক্ষিণে) মদীনাতু নাস্‌র (مدينة نصر) নামক একটি এলাকা রয়েছে। সেখানে মসজিদে রাবেয়া আল-আদাবিয়া (مسجد رابعة العدوية) নামক একটি মসজিদ রয়েছে। প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসের-এর যুগে ১৯৬৩ সনে রাবেয়া আদাবিয়ার নামে এই মসজিদটি বানানো হয়। এ মসজিদের সাথে রাবেয়া আদাবিয়া তথা রাবেয়া বসরিয়ার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। এখানে তার কবর নেই, কবর থাকার কোন মতও নেই।

হযরত ওকী ইবনুল জাররাহ (রহ.)-এর কবর যেয়ারত

www.maktabatulabrar.com

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.)-এর যিয়ারত শেষে বের হয়ে এই রাস্তায় উল্টো দিকে ফিরে আবার ইবনে হাজারের কবরকে ডান হাতে রেখে সোজা বেশ কিছুদূর অগ্রসর হলে ইমাম আশ শাফিয়ী সড়ক (شارع الإمام الشافعي)। এই সড়কের একখানে বাম পাশে মসজিদুল ইমাম আশ শাফিয়ী। সেখানে জুমুআর নামায (কায়রোবাসীদের উচ্চারণে গুমআর নামায) আদায় করলাম। নামায আদায় করার পর ইমাম শাফিয়ীর উস্তাদ ওকী রহ.-র কবর যিয়ারত করলাম। মসজিদুল ইমাম আশ শাফিয়ীকে বাম হাতে রেখে কিছুদূর অগ্রসর হলে বা দিকে একটা রোড গিয়েছে সেটায় প্রবেশ না করে আর কিছুদূর সামনে অগ্রসর হলেই রাস্তার বাম পাশে হযরত ওকী রহ.-এর মাযার। মাজারটি পরিচিত এবং জিয়ারত করা হয়। তবে এটি ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উস্তাদ হযরত ওকী (রহ.)-এর কি না তা নিয়ে যথেষ্ট ভিন্ন মত রয়েছে। সাধারণভাবে ঐতিহাসিকগণ সকলেই লিখেছেন– ইমাম ওকী ইবনুল জাররাহ ১৯৭ হিজরি মোতাবেক ৮১২ খ্রিস্টাব্দে আশুরার দিন হজ্জ থেকে ফেরার পথে সৌদী আরবের বুরায়দা ও হায়েল-এর মাঝে ফায়দ (فيد) নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। এবং ফায়দেই তাকে দাফন করা হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে হযরত ওকী কিছুদিন বসবাস করেছেন। এটা তার বসবাসের স্থান, কবর নয়। কিন্তু হযরত ওকী মিসরে এসেছেন এবং এখানে বসবাস করেছেন সেটিও দলীল-নির্ভর কি না তা বিচার্য।

হযরত ওকী (রহ.)-এর এই কথিত মাজারের ভিতরে ঘরের দেয়ালে বাম পাশে হযরত ওকী রহ.-এর নিকট ইমাম শাফিয়ীর পড়া ভুলে যাওয়ার অভিযো-গ সম্বন্ধে যে কবিতাটি প্রসিদ্ধ আছে তা আমরা যেভাবে শুনেছি তার থেকে একটু ব্যতিক্রম করে এভাবে লেখা আছে। সেই লেখাটুকুর ছবি দেখুন।

অর্থাৎ, লেখা আছে

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي

وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصى

অর্থাৎ, (ইমাম শাফিয়ী বলেন,) আমি আমার উস্তাদ ওকী'-র কাছে অভিযোগ জানালাম যে, আমার মুখস্থ শক্তি ভাল নয়। তিনি আমাকে পাপ বর্জন করার দিক-নির্দেশনা দিলেন। আমাকে আরও জানালেন, ইলম হচ্ছে নূর বা আলো, আর আল্লাহপ্রদত্ত আলো পাপীকে পথ দেখায় না।

কবিতাটি এভাবে আরও আছে **ديوان الإمام الشافعي** কিতাবে, **البلاغة العالية في آية المداينة** কিতাবে, **دواوين الشعر العربي** কিতাবে ও **مجمع الحكم والأمثا** কিতাবে।

আমাদের দেশে এ কবিতাটি যেভাবে প্রসিদ্ধ তা হল–

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي

فإن العلم نور من الهي ونور الله لا يعطى لعاصى

আবার **شرح اللؤلؤ المكنون** কিতাবে কবিতাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي

وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي

কবিতাটি আরও বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্নভাবে আছে। তবে যেহেতু কবিতাটি স্বয়ং ইমাম শাফিয়ীর কিতাবে (**ديوان الإمام الشافعي**) যেভাবে আছে সেভাবেই ওকীর মাজারে লিখিত আছে, তাই এভাবেই কবিতাটি সঠিক মনে হয়।

ওকী' ইবনুল জাররাহ-এর মাজার

ওকী ইবনুল জাররাহ (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী
(১২৯/১২৮–১৯৭হি.)

www.maktabatulabrar.com

হযরত ওকী ইবনুল জাররাহ (রহ.) মুহাদ্দিসুল ইরাক (**محدث العراق**) তথা ইরাকের মুহাদ্দিস বলে প্রসিদ্ধ। ১২৯ হিজরি মতান্তরে ১২৮ হিজরি মোতাবেক ৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের কূফায় তার জন্ম। তার পিতা কূফার রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বশীল একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি একজন প্রসিদ্ধ হাদীছের রাবী (হাদীছ বর্ণনাকারী)। হাদীছের কিতাবাদিতে তার থেকে প্রচুর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। বাল্য বয়সেই তিনি ইলম চর্চা শুরু করেন। বহু স্বনামধন্য মুহাদ্দিস তার শাগরেদ। যেমন: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহুইয়াহ, আবূ খায়ছামাহ যুহায়র ইবনে হারব, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আবূ বকর ইবনে আবী শাইবা, উছমান ইবনে আবী শাইবা, আলী ইবনুল মাদীনী, মুসাদ্দাদ ইবনে মুসারহাদ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ইয়াযীদ ইবনে হারূন, হিশাম ইবনে আম্মার আদ-দামেশকী, কুতাইবা ইবনে সাঈদ প্রমুখ। ইমাম শাফিয়ীও তার বিশেষ শাগরেদগণের একজন।

তিনি অত্যন্ত ইবাদতগুজার ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। সফরে ইকামতে সর্বদা সারা বছর রোযা রাখতেন এবং সপ্তাহে কয়েক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। (تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج ١٥ ص ٦٤٧) বাদশাহ হারুনুর রশীদ কয়েকবার তাকে কূফার গভর্নর বানাতে চেয়েছেন কিন্তু পরহেযগারির চিন্তা থেকেই তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

তিনি উচ্চমানের মুহাদ্দিস ও ইলমের অধিকারী ছিলেন। তার উপাধী ছিল বাহরুল ইলম তথা জ্ঞানের সাগর। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেছেন,

وكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه.

অর্থাৎ, ইমাম আওযাঈ তার যুগে যেমন ওকী'ও তার যুগে তেমনি। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন,

ما رأيت أحدا أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع.

অর্থাৎ, আমি ওকী'র চেয়ে বেশি মুখস্থশক্তি সম্পন্ন এবং বেশি ইলম সংরক্ষণকারী কাউকে দেখিনি।

তিনি বহু কিতাব রচনা করে গেছেন। তার রচিত কিতাবসমূহের একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা গেল।

- **المصنف.**

- السنن.
- المسند.
- التفسير.
- المعرفة والتاريخ.
- كتاب فضائل الصحابة.
- كتاب الهبة.
- كتاب الأشربة.
- نسخة وكيع عن الأعمش.
- كتاب الزهد.

ইমাম ওকী ইবনুল জাররাহ (রহ.) ১৯৭ হিজরি মোতাবেক ৮১২ খ্রিস্টাব্দে আশুরার দিন হজ্জ থেকে ফেরার পথে সৌদী আরবের বুরায়দা ও হায়েল-এর মাঝে ফায়দ (فيد) নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। এবং ফায়দেই তাকে দাফন করা হয়। তবে মিসরীয় কিছু লোকের দাবি ইমাম শাফিয়ী সড়কের এই স্থানেই তার কবর। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে হযরত ওকী কিছুদিন বসবাস করেছেন।

ইমাম ত্বহাবীর কবর যেয়ারত

ইমাম ওকীর মাজারের পিছনেই কাছেই আর একটি সড়ক রয়েছে ইমাম লাইছী সড়ক (شارع الامام الليثي)। এই সড়কেই ওকিয়ের মাজার বরাবর পিছনে রাস্তার দক্ষিণ পশ্চিম পাশে ইমাম ত্বহাবীর কবর। ছোট্ট একটা মসজিদ, তার সাথে লাগোয়া ছোট একটা রুমের মধ্যে কবর। তবে এই মসজিদ পরিত্যাক্ত। আইয়ূবী শাসনামলে ইমাম ত্বহাবীর সম্মানে এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এটাকে বলা হত 'মসজিদুশ শায়খ আত্ব-ত্বহ-াবী' (مسجد الشيخ الطحاوي) বা যাবিয়াতুশ শায়খ আত্ব-ত্বহাবী (زاوية الشيخ الطحاوي)।

কবরটি রাস্তা থেকে দেখা যায় না। রাস্তার পাশে একটা ছাদবিহীন জায়গায় কয়েকটি কবর রয়েছে। সেই জায়গার সামনের দিকে বাম পাশে একটা কাঠের দর্জায় লেখা আছে–

المهندس أحمد فوزي الطحاوي

www.maktabatulabrar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي

الى ربك راضية

مرضية فادخلى

فى عبادى وادخلى

جنتى.

এই লেখা সম্বলিত দরজার ছবি নিম্নে প্রদান করা গেল।

এই দর্জা দিয়ে প্রবেশ করলে ছাদবিহীন স্থানে প্রাচীন মিসরীয় স্টাইলের কয়েকটি কবর। সেখানে সামনের বাম দিকে একটা খোলা দর্জা দিয়ে ছোট্ট একটি মসজিদে প্রবেশ করলে তার ডান হাতে আরও ছোট্ট একটা রুমের

মধ্যে ইমাম ত্বহাবীর কবর। মাথার ধারে একটি গোল পিলারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ইমাম ত্বহাবীর নাম পরিচয় লেখা আছে। এ কবরটি অনেকের কাছে অপরিচি-ত। সংগত কারণেই যিয়ারতও তেমন হয় না। হযরত ওকীর মাজার (আদৌ তার মাজার কি না তা অনিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও) এমন শানদার ধুমধামের সাথে অথচ তারই কাছে ইমাম ত্বহাবীর ন্যায় এমন বড় ব্যক্তিত্বের কবর এমন পরিত্যাক্ত কেন তার কারণ এ ছাড়া আর কিছু খুজে পেলাম না যে, মিসরীয়রা শাফিয়ী আর ওকী রহ. হলেন ইমাম শাফিয়ীরই উস্তাদ। পক্ষান্তরে ইমাম ত্বহাবী শাফিয়ী নন বরং হানাফী।

ইমাম ত্বহাবীর কবর এতটাই পরিত্যাক্ত যে, অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায় তার কবরের উপর যেসব মূল্যবান পাথর দিয়ে কবরকে জড়ানো হয়েছিল সেগুলে-াও চুরি হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন মানুষের যাতায়াত না থাকায় সবকিছু স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে।

মিসরীয় প্রাচীন স্টাইলের কবর

ইমাম ত্বহাবী (রহ.)-এর কবর

ইমাম ত্বহাবী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

www.maktabatulabrar.com

(২২৯-৩২১ হি.)

ইমাম আবু জা'ফর ত্বহাবী (রহ.) ফকীহ, মুহাদ্দিস ও আকিদা বিশারদ ব্যক্তি। তার মূল নাম আহমাদ। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তার উপনাম আবু জা'ফর। ইমাম ত্বহাবীর বংশ মূলত ইয়ামানের। ইয়ামানের আয্দ (আয্দে হিজ্র) গোত্রের। মিসর ইসলামী খেলাফতের অধীনে আসার পর ইমাম ত্বহাবীর পূর্বপুরুষগণ মিসরে বসবাস শুরু করেন। মিসরের ত্বহা (طحا) নামক গ্রামে বসবাস করতেন বিধায় তাকে ত্বহাবী বলা হয়। ত্বহা গ্রামটি মিসরের মধ্যভাগে নীল নদের পশ্চিম তীরে আল-মিনয়া (المنيا/Minya) নামক মুহাফাজার (গভর্ণরেটের) একটি গ্রাম।

ইমাম ত্বাহাবীর জন্মসন নিয়ে প্রসিদ্ধ দুটো মত পাওয়া যায়। (১) ইমাম সামআনী, ইবনে খাল্লিকান, ইবনে কাসীর, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি ও আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারী (রহ.)-এর মতে ইমাম ত্বহাবীর জন্ম ২২৯ হিজরিতে। (২) ইবনে আসাকির ও যাহাবীর মতে ইমাম ত্বহাবীর জন্ম ২৩৯ হিজরিতে। আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারী (রহ.)-এর তাহকীক অনুযায়ী প্রথম মতটিই সঠিক। আবার অনেকের মতে দ্বিতীয় মতটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

ইমাম ত্বহাবীর পরিবার ছিল ইলমী পরিবার। তার পিতা আলেম ছিলেন। পিতা থেকে তিনি হাদীছও শ্রবণ করেছেন। তার মাতাও ছিলেন ফকীহা। তিনি শুরু জীবনে মায়ের কাছেও পড়াশোনা করেছেন।

ইমাম ত্বহাবী (রহ.) হানাফী মাযহাবের ফকীহ ছিলেন। প্রথমে তিনি শাফিয়ী মযহাবের ফেকাহ সম্বন্ধে বিজ্ঞতা অর্জন করেন, পরে হানাফী মাযহাবে ফিরে আসেন। তিনি অন্য মাযহাব সম্বন্ধেও ওয়াকেফহাল ছিলেন। ইমাম ইবনে আব্দিল বার বলেছেন, ইমাম ত্বহাবী (রহ.) হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু তিনি সকল ফকীহের মাযহাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। (আল-জাওয়াহিরুল মুজিয়্যা, খ. ১, পৃ. ১০২) বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাসলামা ইবনে কাসেম কুরতুবী বলেন, তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমামগণের মতভেদ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। গ্রন্থ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। (লিসানুল মিজানঃ খ. ১, পৃ. ২৭৬)

ইমাম ত্বহাবী সিহাহ সিত্তার গ্রন্থকারদের সমসাময়িক ছিলেন। অর্থাৎ, তারা ইমাম ত্বহাবী রহ. এর সহপাঠী ছিলেন। ফলে তাদের সকলেরই প্রায় একই মুহাদ্দিস থেকে হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে। ইমাম ত্বহাবী (রহ.)-এর বিশিষ্ট্য উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন–

১. ইমাম মুজানী (রহ.)। তিনি ইমাম শাফেয়ী (রহ.)–এর বিশিষ্ট ছাত্র ও ইমাম ত্বহাবী (রহ.)-এর মামা ছিলেন। ইমাম মুজানী থেকে ইমাম ত্বহাবী সুনানে শাফেয়ী শ্রবণ ও বর্ণনা করেন, যেটি 'মুসনাদে শাফেয়ী' হিসেবে পরিচিত।
২. হারূন ইবনে সাইদ আল-আইলী
৩. আবু শুরাইহ
৪. আবু উছমান সাইদ ইবনে বিশর
৫. রবী ইবনে সুলাইমান আল-জিযী

ইমাম ত্বহাবীর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন–
১. বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজ ইউসুফ ইবনে কাসেম মায়ানজী রহ.
২. ইমাম ত্বাবারানী রহ.
৩. হাফেজ আবু বকর ইবনুল মুকরী
৪. আল-কামেল এর গ্রন্থকার হাফেজ ইবনে আদী
৫. মিসরের বিশিষ্ট কাজী আবু উসমান আজদী

ইমাম ত্বহাবী (রহ.) আকীদা, হাদীস, ফিক্হ ইত্যাদি অনেক শাস্ত্রে কিতাব রচনা করেছেন। যাহাবী (রহ.) বলেছেন, তার রচনাবলী যে দেখবে, সে ইলমের ক্ষেত্রে তার উঁচু অবস্থান ও জ্ঞানের বিস্তৃতি সম্পর্কে অবগত হতে পারবে। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: খ. ১৫, পৃ. ৩০) তার রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে–

- العقيدة الطحاوية
- شرح معاني الآثار
- مشكل الآثار
- اختلاف العلماء.
- بيان السنة والجماعة في العقيدة.
- حكم أراضي مكة المكرمة.
- شرح الجامع الصغير والكبير للشيباني في الفروع.
- عقود المرجان في مناقب أبي حنيفة النعمان.
- الفرائض.
- قسمة الفيء والغنائم.
- كتاب التاريخ.

www.maktabatulabrar.com

- كتاب التسوية بين حدثنا وأخبرنا.
- الشروط الصغير.
- الشروط الكبير.
- المحاضرات والسجلات.
- المختصر في الفروع.
- نقد المدلسين على الكرابيسي.
- اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين.

ইমাম ত্বহাবী (রহ.) ৩২১ হিজরী মোতাবেক ৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মিসরে ইন্তেকাল করেন। তার কবর রয়েছে ক্বারাফা এলাকায়। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন। আমীন!

জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)–এর কবর যেয়ারত

তারপর সাইয়্যেদা আয়েশা এলাকায় গেলাম। সাইয়্যেদা আয়েশা এলাকা সালাউদ্দীন আইয়ুবির দূর্গের কিছুটা পশ্চিম দিকে। এখানে গাড়ি স্টপেজের পাশেই মসজিদে সাইয়্যেদা আয়েশা নামে একটি মসজিদ রয়েছে (যে সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা হয়েছে)। এই মসজিদের পাশে যে ফ্লাইওভার, সেই ফ্লাইওভারের দক্ষিণ পশ্চিম পাশে জালালুদ্দীন সুয়ূতী (কায়রোবাসীদের উচ্চারণে গালালুদ্দীন সুয়ূতী)-এর কবর। উল্লেখ্য, এই কবরটি সাইয়্যেদা আয়েশা এলাকায় পড়েছে বিধায় অনেক কিতাবপত্রে বলা হয় তার কবর সাইয়্যেদা আয়েশাতে। আবার এ এলাকাটি বৃহত্তর ক্বারাফা এলাকার অন্তর্ভুক্ত বিধায় কেউ কেউ এভাবে বলেন, তার কবর ক্বারাফায়। আবার এক সময় কায়রো শহরের নিরাপত্তা প্রাচীর ছিল। সেই প্রাচীরটি দূর্গ-এলাকা ও ক্বারাফা এলাকার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করত বিধায় হযরত সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী এখানে প্রাচীর ভেঙ্গে একটি দরজা খুলেছিলেন, যাকে বলা হত 'বাবুল ক্বারাফা' (باب القرافة)। তাই অনেকে কিতাবপত্রে এভাবে বলেছেন যে, হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতির কবর বাবুল ক্বারাফাতে। বস্তুত অভিব্যক্তিগুলোর মাঝে কোন বিরোধ নেই।

হযরতের কবরটি একটি ঘরের মধ্যে। ঘরটি মসজিদের ন্যায় গম্বুজ বিশিষ্ট। এটিকে মসজিদে জালালুদ্দীনও বলা হয়। ঘরটি তালাবদ্ধ থাকে। সংরক্ষণকারীকে কয়েকটি পাউন্ড ধরিয়ে দিলে তিনি তালা খুলে ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেন। আমরা যখন গিয়েছিলাম সংরক্ষণকারীকে খুঁজে না

পাওয়ায় ঘরের ভেতর ঢুকতে না পেরে বাইরে দাঁড়িয়েই জিয়ারত সেরে চলে আসি।

জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)-এর মাজার

উপরোক্ত মাজারের তালাবদ্ধ গেট

হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)–এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

(৮৪৯–৯১১হি.)

হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। জগৎবিখ্যাত আলেমে দ্বীন ও বহু গ্রন্থ-প্রণেতা। তার নাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন ইবনে আবী বকর মুহাম্মাদ কামালুদ্দীন। 'আসয়ূত' (أسيوط) শহরে তার জন্ম বিধায় তাকে সুয়ূতী বলা হয়। আসয়ূত কায়রো থেকে দক্ষিণে এবং সুহাজ থেকে উত্তরে বর্তমানে গভর্ণর শাসিত একটি শহর (মুহাফাজা)। শহরটি কায়রো

www.maktabatulabrar.com

থেকে ৩৮৮ কিলোমিটার দূরে।

হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) ৮৪৯ হিজরির ১ রজব আসয়ূত এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বছর বয়সে তার পিতা ইন্তেকাল করেন। পিতার ওছিয়ত মোতাবেক প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ কামালুদ্দীন ইবনুল হুমামসহ কয়েকজন তার তত্ত্বাবধান করতে থাকেন। বয়স ৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই হেফজে কুরআন সম্পন্ন করে উমদা, মিনহাজ, উসূল, আলফিয়ায়ে ইবনে মালিক কিতাবসমূহ মুখস্থ করে ফেলেন। তারপর তখনকার প্রসিদ্ধ মিসরীয় উলামায়ে কেরাম থেকে হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ ইত্যাদির শিক্ষা লাভ করেন। তিনি নিজেই বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ ও অলংকার শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান দান করেছেন। তিনি লিখেছেন- একবার আমি হজ্জের সময় এই নিয়তে যমযম পান করেছিলাম যে, আমি যেন ফিকহ শাস্ত্রে শায়খ সিরাজুদ্দীন বুলকীনী-র স্তরে এবং হাদীছ শাস্ত্রে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী-র স্তরে পৌঁছতে পারি। বস্তুত তা-ই হয়েছে। তিনি তার যুগে হাদীছ শাস্ত্রের বড় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। তিনি নিজে বলেছেন, আমার দুই লক্ষ হাদীছ মুখস্থ আছে, এর চেয়ে বেশি হাদীছ পেলে তাও আমি মুখস্থ করে নিতাম।

৪০ বছর বয়সে তিনি দরস-তাদরীস এবং দুনিয়াবী সমস্ত সম্পর্ক থেকে ফারেগ হয়ে নির্জনে ইবাদত মুজাহাদায় লিপ্ত হন। তিনি এতটাই দুনিয়া বিমুখ হয়ে পড়েন যে, আমীর উমারা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বা অন্য যে কেউ তার সাক্ষাতে হাদিয়া-তোহফা নিয়ে এলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না।

হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) কারামাতের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। তার খাস খাদেম মুহাম্মাদ ইবনে আলী বর্ণনা করেছেন, একদিন দুপুরে খাওয়ার পর আরাম করার সময় আমাকে বললেন, যদি আমার মৃত্যুর পূর্বে এই গোপন ভেদ প্রকাশ না কর তাহলে আজ তোমাকে আসরের নামায মক্কা মুকাররমায় পড়াব। আমি বললাম, অবশ্যই তা-ই হবে। তিনি বললেন, চক্ষু বন্ধ কর। আমি চক্ষু বন্ধ করলাম। তিনি আমার হাত ধরে আনুমানিক ২৭ কদম হাঁটার পর বললেন, চক্ষু খোলো। দেখলাম আমরা বাবে মুআল্লাত (হারাম শরীফের একটা গেটের নাম) পৌঁছে গেছি। হারাম শরীফে প্রবেশ করে তাওয়াফ করলাম। যমযম পান করলাম। তারপর তিনি বললেন, আমাদের জন্য জমিন গুটিয়ে যাওয়া (طي الأرض)-এর এই বিষয়টাতে (এটি এক ধরনের কারামত) আশ্চর্যান্বিত হয়ো না। বেশি আশ্চর্যের বিষয় হল হারাম শরীফে আমাদের প্রতিবেশী পরিচিত অনেক লোক আছে তারা

আমাদেরকে চিনতে পারছে না। এখন তুমি চাইলে আমার সঙ্গেও যেতে পার আবার হাজীদের সঙ্গেও যেতে পারো। আমি আরয করলাম আপনার সঙ্গেই যেতে চাই। তিনি আমাকে নিয়ে আবার সেই বাবে মুআল্লাত গেটে গেলেন। চক্ষু বন্ধ করতে বললেন। ৭ কদম আমাকে দ্রুত চালালেন। তারপর চোখ খুলে দেখি আমরা মিসরে।

তিনি জীবনে বহুসংখ্যক কিতাব রচনা করেছেন। বিভিন্ন শাস্ত্র বিষয়ক তার গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচশতের চেয়ে বেশি। আল্লামা সুয়ূতির শাগরেদ আব্দুল কাদের শাযিলী 'বাহজাতুল আবিদীন' কিতাবে বলেছেন, আমি হযরতের খেদমতে প্রায় ৪০ বছর থেকেছি। হযরতের ওফাতের পূর্বে হযরতের রচিত কিতাবসমূহের একটি তালিকা হযরতের কাছে পেশ করে তা হযরতকে পাঠ করে শুনিয়েছিলাম। তাতে প্রায় ৬০০ কিতাবের তালিকা ছিল। হযরত সেগুলো প্রকাশ ও প্রচারের এজাযত দান করেছিলেন।

দরসে নেজামিতে যে জালালাইন শরীফ পড়ানো হয় তার দ্বিতীয় অংশ জালালুদ্দীন মহল্লী (রহ.) রচনা করেন। জালালুদ্দীন মহল্লী (রহ.)-এর ইন্তেকালের ৬ মাস পর মাত্র ৪০ দিনে জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) এই কিতাবের প্রথম অংশ রচনা সম্পন্ন করেন। তখন তার বয়স ২০ বা ২২ বছর। আল্লামা সুয়ূতী রচিত বিশেষ কয়েকটি কিতাবের নাম–

- أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب
- الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء
- الأشباه والنظائر
- الأشباه والنظائر
- الإتقان في علوم القرآن
- التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة
- الحاوي للفتاوى
- الحبائك في أخبار الملائك
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور
- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة
- الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج
- الروض الأنيق في فصل الصديق

www.maktabatulabrar.com

- الشماريخ في علم التاريخ
- العجالة الحسنى في شرح أسماء الله الحسنى
- العرف الوردي في أخبار المهدي
- الغرر في فضائل عمر
- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة
- المزهر في علوم اللغة و أنواعها
- إرشاد المهتدين إلى نصرة المجتهدين
- إسعاف المبطأ برجال الموطأ
- إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر
- تاريخ الخلفاء
- تحذير الخواص من أكاذيب القصاص
- تفسير الجلالين
- جمع الجوامع
- شرح السيوطي على سنن النسائي
- شرح عقود الجمان
- طبقات الحفاظ
- طبقات المفسرين
- عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث
- مفحمات الأقران في مبهمات القرآن
- لباب النقول في أسباب النزول
- نواضر الأيك في معرفة النيك

৯১১ হিজরির জুমাদাল উলা মাসের ১৯ তারিখ তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন। আমীন!

জামেয়া আযহারের ছাত্রদের উদ্দেশে বয়ান ও

একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

১৯ এপ্রিল শুক্রবার বাদ মাগরিব জামেয়া আযহারে অধ্যয়নরত বাঙ্গালী ছাত্ররা নসর সিটি-র এক স্থানে সমবেত হল। আমার মিসর সফরের প্রোগাম হতেই আমি বাংলাদেশে থাকা অবস্থায়ই জামেয়া আযহারে অধ্যয়নরত বাঙ্গালী ছাত্ররা এই প্রোগামটি করে রেখেছিল। উদ্দেশ্য ছিল দু'টো– এক. মাওলানা আব্দুল হালীমের মাকতাবাতুল আফনান থেকে প্রকাশিত 'দাজ্জাল' নামক একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন। দুই. ছাত্রদের উদ্দেশে কিছু বয়ান।

দাজ্জাল নামক বইটির পুরো নাম হল– দাজ্জাল: একবিংশ শতাব্দি ও একটি পর্যালোচনা। বইটির লেখক জামেয়া আযহারের অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্র মাওলানা শামসুদ্দীন। লেখক বইটি বেশ ভাল লিখেছেন। দাজ্জাল সম্পর্কে সম্প্রতি যেসব বিভ্রান্তিমূলক ধারণা প্রচারিত হচ্ছে যেমন দাজ্জাল হল আমেরিকা বা দাজ্জাল হল আধুনিক প্রগতি, দাজ্জাল রয়েছে বারমুডা ট্রায়াংগলে ইত্যাদি– লেখক এসব ধারণার বেশ দলীলভিত্তিক খণ্ডন পেশ করেছেন। লেখক ও প্রকাশককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। সাথে সাথে একথাও বললাম, আমি পুরো গ্রন্থ পাঠ করিনি, যা বললাম তা বিশেষ বিশেষ কিছু স্থান দেখার ভিত্তিতেই বললাম।

ছাত্রদের উদ্দেশে আমি সংক্ষিপ্ত কিছু কথা রেখেছিলাম। তার মধ্যে বিশেষভাবে তিনটি বিষয়ে কিছু কথা বলেছিলাম। তার সারকথা হল– (১) তোমরা যারা বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছো উদ্দেশ্য ভাল কিছু অর্জন করা এবং ভাল কিছু নিয়ে যাওয়া। এখানে দরস ও তাদরীসের এমন কোন বৈশিষ্ট্য যদি থাকে যা আমাদের দেশের দরস ও তাদরীসে নেই সেটা নিয়ে যাও। এখানে হাদীস, ফিক্‌হ ইত্যাদি শাস্ত্রের বিশ্লেষণে কোন স্বাতন্ত্র বা বৈশিষ্ট যদি থাকে তা নিয়ে যাও। এর জন্য তোমাদেরকে এখানকার দরস-তাদরীস ও ইলমী উপস্থাপনা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। নিয়মিত দরসে উপস্থিত থাকতে হবে। তাহলেই ভালটি খুঁজে বের করে তা নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। (২) আমাদের বাংলাদেশে আল-হামদু লিল্লাহ ইল্মী পরিবেশের সাথে সাথে আমলী পরিবেশও রয়েছে। উস্তাদগণও আল-হামদু লিল্লাহ ছাত্রদের আমলী তারাক্কীর ব্যাপারে ফিকর করেন, তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু এখানকার অবস্থা ভিন্ন। এখানে আমলী পরিবেশের যথেষ্ট অভাব রয়েছে, বিশেষত ছাত্রদের সাথে সাথে উস্তাদদের মধ্যেই যখন আমলী ত্রুটি বিদ্যমান। তোমরা

www.maktabatulabrar.com

এই বে-আমলীর পরিবেশে ভেসে যেয়ো না। (৩) এখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মত পথের, বিভিন্ন মাসলাক মাশরাবের ছাত্র থাকতে পারে, উস্তাদদের মধ্যেও ভিন্ন মাসলাক মাশরাবের লোক থাকতে পারে, তোমরা নিজেদের মাসলাক মাশরাবের উপর অটল থেকো। একছাত্র জিজ্ঞেস করেছিলো হুজুর! মাসলাক মাশরাব কি জিনিস? আমি সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলাম, ফিক্‌হের ক্ষেত্রে কোন মাযহাব অনুসরণ হচ্ছে মাসলাক, আর তাসাওউফের ক্ষেত্রে কোন তরীকার অনুসরণ হচ্ছে মাশরাব। অতএব মাসলাক মাশরাবের ব্যাপারে অটল থাকার অর্থ হচ্ছে ফিকহের ক্ষেত্রে অবশ্যই কোন একটি মাযহাব অনুসরণ করে চলতে হবে, গায়র মুকাল্লিদ বা সালাফী হওয়ার অবকাশ নেই। এমনিভাবে তাসাওউফের প্রয়োজনকে স্বীকার করে তরীকার কোন একটি ধারার সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িয়ে রাখতে হবে।

২৪/৪/২০১৯ বুধবার

ইবনুল হুমামের কবরে

বিকেলে তুনসী এলাকা (منطقة التونسي)-র মসজিদুস সেকান্দারীর পাশে কামাল উদ্দীন ইবনুল হুমামের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে জিয়ারতকে কামেল (পরিপূর্ণ) করলাম। এই মসজিদুস সেকান্দারী আহমদ ইবনে আতাউল্লাহ আস-সিকান্দারী নামক ব্যক্তির দিকে সম্পৃক্ত। মসজিদের নাম ফলকে এভাবে লেখা আছে– **مسجد ومقام سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري** এই আহমদ ইবনে আতাউল্লাহ আস-সিকান্দারী ছিলেন মালিকী মাযহাবের একজন ফকীহ এবং শাযিলিয়্যাহ তরীকার একজন প্রখ্যাত সূফী। তার জন্ম ৬৫৮ হিজরি মোতাবেক ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ এবং ওফাত ৭০৯ হিজরি মোতাবেক ১৩০৯ খ্রীস্টাব্দ। তার কবরের উপরই এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে।

এই মসজিদের কেবলার দিকে বাইরে ডান পাশে নিচ থেকে উঠানো মসজিদের মিনারা। এই মিনারার বামে ইবনুল হুমামের করব। তার কবরের পাশে ইবনে দাকীকুল ঈদ-এর কবরও রয়েছে। মসজিদের ভিতর দিয়ে কবরের কাছে যাওয়া যায়। যিয়ারত শুরু করেছিলাম শাফিয়ী মযহাবের ইমাম হযরত আবূ ইদরীছ শাফিয়ীর যিয়ারতের মাধ্যমে, আর সমাপ্ত করলাম হানাফী মযহাবের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ইবনুল হুমামের যিয়ারতের মাধ্যমে। **إنما العبرة بالخواتيم**

উল্লেখ্য, হযরত ইবনুল হুমাম (রহ.)-এর কবর যিয়ারত করেছিলাম সফরের শেষভাবে দেশে ফেরার আগের দিন। কিন্তু এটা কায়রোর দর্শনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিধায় 'কায়রোতে যা কিছু দেখা হল' শিরোনামের আওতায় এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

মসজিদুস সেকান্দারী

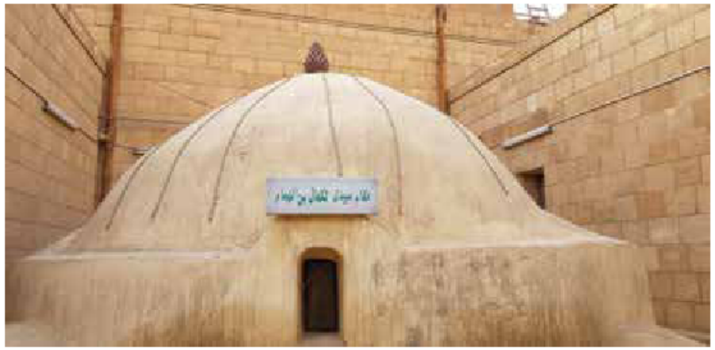

ইবনুল হুমাম (রহ.)-এর কবর

www.maktabatulabrar.com

ইবনুল হুমাম (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

(৭৯০-৮৬১)

কামাল উদ্দীন ইবনুল হুমাম প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তার নাম মুহাম্মাদ ইবনে হুমামুদ্দীন আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে সা'দুদ্দীন আব্দুল হামীদ কামাল উদ্দীন। 'ইবনুল হুমাম' বলেই তিনি প্রসিদ্ধ। তার পিতা সীওয়াস (سيواس/Sivas)-এর বিচারক ছিলেন। তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালনের জন্য কায়রোতে চলে আসেন। পরে তাকে আলেকজান্দ্রিয়া পাঠানো হয়। সেখানে তিনি বিচারকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। 'সীওয়াস' হচ্ছে তুরস্কের মধ্যভাগে আনাতোলিয়া-এর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত একটি প্রাদেশিক শহর। এক সময় এটি রোমান সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। তাই কেউ কেউ সীওয়াস-এর পরিচয় এভাবে দিয়ে থাকেন যে, সীওয়াস হচ্ছে রোমান সাম্রাজ্যের অধিন একটি এলাকা।

আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন ৭৯০ হিজরিতে ইবনুল হুমাম জন্মগ্রহণ করেন। ভিন্নমতে ৭৮৮ হিজরিতে। তার জন্ম হয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়ায় (الإسكندرية)। এজন্য তাকে সিকান্দারী বলা হয়। ১০ বছর বয়সে তার পিতা ইন্তেকাল করলে তার নানী তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ, নাহব-সরফ শাস্ত্র বিশারদ, অলংকার শাস্ত্র বিশারদ ও বাহাছ-মুনাজারায় পারদর্শী ব্যক্তি।

প্রথম জীবনে তিনি সবকিছু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে একাকী ইবাদত-বন্দেগী ও পড়াশোনায় লিপ্ত থাকার পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। মিসরের শাইখুনিয়া খানকায় (الخانقاه الشيخونية) তাসাওউফ সাধনা করতেন। তিনি শায়েখদের শায়েখে পরিণত হন। তিনি কারামাতের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তরীকতের লোকেরা তাকে বলেছিলেন, আপনি ফিরে যান, আপনার ইল্ম মানুষের প্রয়োজন। আল্লামা সাখাবী বলেছেন, তিনি জগৎবাসীর আলেম এবং সমসাময়িকদের মধ্যে মুহাক্কিক।

তিনি নিম্নোক্ত কিতাবগুলো রচনা করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হেদায়া কিতাবের শরাহ গ্রন্থ 'ফাতহুল কাদীর'।

- فتح القدير في شرح الهداية
- التحرير في أصول الفقه
- المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة
- زاد الفقير مختصر في فروع الحنفية.

৮৬১ হিজরির ৭ রমজান রোজ শুক্রবার তিনি ইন্তেকাল করেন।

কায়রোতে আরও যা কিছু দেখার রয়েছে

এ পর্যন্ত কায়রোতে যা কিছু দেখার বর্ণনা দেয়া হল এর বাইরেও কায়রোতে আরও দেখার বিষয় রয়েছে, যেগুলো আমাদের সময়ের অভাবে কিংবা আগ্রহের অভাবে দেখা হয়নি। (কিছু জিনিস তো এমন আছে ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে যার কোনো সম্পর্কই নেই।) নিম্নে এরকম কয়েকটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করা হল, যাতে আগ্রহীগণ এবর্ণনা থেকে সহযোগিতা লাভ করতে পারেন।

- **মসজিদুল হাকিম বি আমরিল্লাহ (مسجد الحاكم بأمر الله)**

মসজিদুল হাকিম বি আমরিল্লাহ (مسجد الحاكم بأمر الله) তথা হাকিম বি আমরিল্লাহ-র মসজিদ। ফাতিমী বাদশাহ আল-আযীয বিল্লাহ-এর যুগে ৩৭৯ হিজরি মোতাবেক ৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কিন্তু মসজিদটি পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়। তারপর তার পুত্র হাকিম বি আমরিল্লাহ ৪০৩ হিজরি মোতাবেক ১০১৩ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটির কাজ পূর্ণ করেন। তার নামের দিকে সম্পৃক্ত করে এটিকে মসজিদুল হাকিম বি আমরি-ল্লাহ (সংক্ষেপে মসজিদুল হাকিম) বলা হয়। মসজিদটি কায়রোর আল-গামা-লিয়া (الجمالية/El Gamaleya) এলাকার উত্তরে আল-মুইঝ লি দ্বীনিল্লাহ সড়কে (شارع المعز لدين الله) অবস্থিত। মসজিদটিতে দীর্ঘকাল যাবত চার মযহাবের উলামায়ে কেরাম দরস তাদরীসের কাজ করতেন।

হাকিম বি আমরিল্লাহ ছিলেন একজন জালেম বাদশাহ। বছরের পর বছর তার দুঃশাসনে মিসরবাসীদের নাভিঃশ্বাস উঠেছিল। আল্লামা সুয়ূতী হুসনুল মুহাদারা গ্রন্থে বলেছেন, ফেরআউনের পর মিসরে তার চেয়ে নিঃকৃষ্ট শাসক আর কেউ আসেনি।

www.maktabatulabrar.com

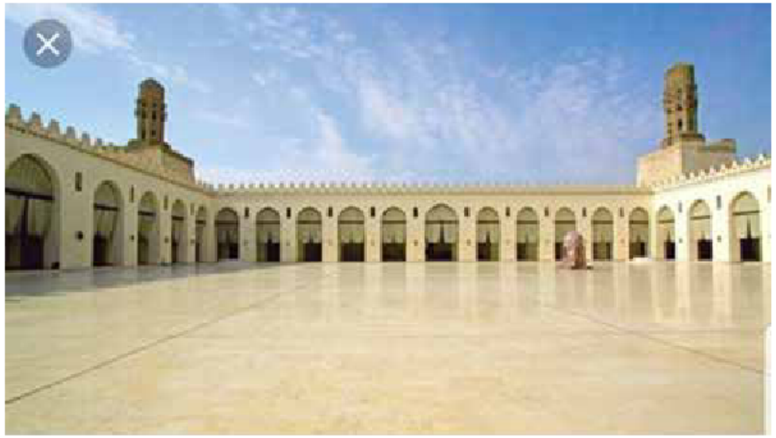

মসজিদুল হাকিম বি আমরিল্লাহ

- **মসজিদে ইবনে তূলূন (مسجد ابن طولون)**

মসজিদে ইবনে তূলূন (□□□□□ □□□ □□□□) অর্থাৎ, ইবনে তূলূন-এর মসজিদ। একে মসজিদে আহমদ ইবনে তূলূন (مسجد أحمد بن طولون) অথবা আল-মসজিদুত্তূলূনী (المسجد الطولوني)ও বলা হয়। এটি কায়রোর একটি ঐতিহাসিক মসজিদ। তূলূনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ ইবনে তূলূন তার প্রতিষ্ঠিত আল-ক্বাতায়ে' (القطائع) শহরে ২৬৩ হিজরি মোতাবেক ৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণের নির্দেশ দেন। যাতে এটি ফুছতাতের জামেয়ে আমরুল ইবনুল আস (□□□□□ □□ □□□□ □□□□) অর্থাৎ, হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) কর্তৃক নির্মিত মসজিদ ও আল-আসকার (العسكر) শহরের জামেউল আসকার (جامع العسكر)-এর পর এটি ৩য় মসজিদ হতে পারে। আল-কাতায়ে' বর্তমানে কিলআতুল কাব্‌শ (قلعة الكبش) নামে পরিচিত। এটি আস-সাইয়্যেদা যয়নাব এলাকায়।

মসজিদে ইবনে তূলূন-এর একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি তার শুরুর অবস্থায় অদ্যাবধি টিকে আছে, এতে কোন সংস্কার করা হয়নি। পক্ষান্তরে জামেয়ে আমরুল ইবনুল আস তথা হযরত আম্র ইবনুল আস-এর মসজিদে সংস্কার হয়েছে।

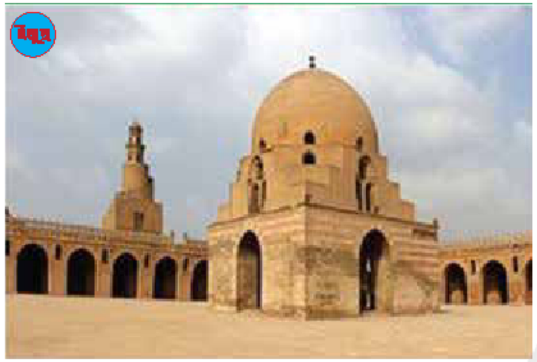

মসজিদে ইবনে তূলুন

- মসজিদ ও মাদরাসাতুস সুলতান আন-নাসের হাসান (مسجد ومدرسة السلطان ناصر حسن)

মসজিদ ও মাদরাসাতুস সুলতান আন-নাসের হাসান অর্থাৎ, সুলতান নাসের হাসানের মসজিদ ও মাদরাসা। কায়রোর সালাহ উদ্দীন আইয়্যুবির দূর্গের পূর্ব দিকে হাইয়্যুল খালীফা (حي الخليفة) মহল্লায় অবস্থিত। এটি কায়রে-ার একটি ঐতিহাসিক মসজিদ ও মাদরাসা। সুলতান নাসের হাসান ইবনে নাসের মুহাম্মাদ ইবনে ক্বালাউন ৭৫৭ হিজরি মোতাবেক ১৩৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৬৪ হিজরি মোতাবেক ১৩৬৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি নির্মাণ করেন। চার মাযহাবের উলামায়ে কেরামই এখানে দরস-তাদরীসের কাজ করতেন। এখানে হাদীছ, তাফসীর ও কেরাআতে সাবআ শিক্ষা দেয়া হত। হেফজে কুরআন ও কিতাবাত শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল।

মসজিদ ও মাদরাসাতুস সুলতান আন-নাসের হাসান

www.maktabatulabrar.com

- সাক্কারাহ-এর পিরামিড

গীযা এলাকায় যেমন পিরামিড রয়েছে, সাক্কারাহ এলাকাতেও পিরামিড রয়েছে। তবে সাক্কারাহ এলাকার পিরামিডের তুলনায় গীযার পিরামিডগুলো বৃহৎ ও বিখ্যাত। সাক্কারাহ (سقارة/Saqqarah) হচ্ছে গীযা মুহাফাজা (গভর্ণরেট)-এর অন্তর্গত আল-বাদরাশীন (البدرشين/Al Badrashin) এলাকার অধীন একটি অঞ্চল। এটি গীযার কেন্দ্র থেকে দক্ষিণে এবং হেলওয়ান (حلوان/Helwan)-এর পশ্চিমে অবস্থিত।

সাক্কারাহ-এর পিরামিড

- বাব যুবেইলাহ (باب زويلة/Bab Zuweila)

প্রাচীন কায়রোর নগর-রক্ষা প্রাচীর ছিল, যাকে বলা হত 'সূরুল কাহেরা' (سور القاهرة) তথা কায়রোর প্রাচীর। এই প্রাচীরের চতুর্দিকে বেশ কিছু ভারী গেট বা দর্জা ছিল। এরূপ একটি গেট হল বাব যুবেইলাহ। বাব যুবেইলাহ ছিল প্রাচীরের দক্ষিণাংশের দুটো গেটের একটি। গেটটি এখনও বিদ্যমান রয়েছে। বাব যুবেইলাহকে বাবুল মুতাওয়াল্লী (باب المتولي)ও বলা হয়। বাবুল মুআইয়্যাদ (باب المؤيد)ও বলা হয়। কারণ, গেটের পশ্চিম দিকে মামলূক সুলতান আল-মুআইয়্যাদ-এর মসজিদ জামিউল মুআইয়্যাদ (جامع المؤيد) রয়েছে। গেটের সামনে রয়েছে জামিউস সালেহ (جامع الصالح)। গেটটি বর্তমান আল-মুইয লি দ্বীনিল্লাহ সড়ক (شارع المعز لدين الله)-এর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। তাতারীরা যখন মিসরে ভীতি প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে এসেছিল, তখন তাতার নেতা হালাকুর দূতদের মাথা কেটে এই গেটে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

বাব যুবেইলাহ

- আল-ক্বারইয়াতুল ফিরআউনিয়্যাহ (القرية الفرعونية)

কায়রোর পাশে নীল নদের অভ্যন্তরে 'আল-ক্বারইয়াতুল ফিরআউনিয়্যাহ' (Pharaonic village) নামে একটি নগরী বানানো হয়েছে। এখানে ফেরআউনী যুগের জীবন পদ্ধতি, ফেরআউনদের কর্মকাণ্ড ইত্যাদি কৃত্রিমভাবে দেখানো হয়।

আল-ক্বারইয়াতুল ফিরআউনিয়্যাহ

- মাতহাফু উম্মে কুলছুম (متحف أم كلثوم) ও মাতহাফুল কিব্‌তী (متحف القبطي)

www.maktabatulabrar.com

কায়রোর তাহরীর স্কয়ারের পাশে যে জাদুঘর (المتحف المصري/মিসর জাদুঘর), যে জাদুঘরে র‍্যামেসিস-২ ও অন্য অনেক ফারাওয়ের মমি রয়েছে, সেটি ছাড়াও কায়রোতে আরও কয়েকটি জাদুঘর রয়েছে। যেমন: মাতহাফু উম্মে কুলসুম (متحف أم كلثوم) তথা উম্মে কুলসুম জাদুঘর ও মাতহাফুল কিব্‌তী (متحف القبطي) তথা কিব্‌তী জাদুঘর ইত্যাদি।

মাতহাফু উম্মে কুলসুম

মাতহাফুল কিব্‌তী

- হাদীকাতুল আযহার (حديقة الأزهر)

হাদীকাতুল আযহার (حديقة الأزهر) অর্থ আল-আযহার পার্ক (Al-Azhar Park)। পার্কটি সালাহ উদ্দীন আইয়্যুবির দূর্গের পাশে সালাহ সালেম স্ট্রীট (طريق صلاح سالم/Salah Salem St.) য়ে অবস্থিত। এটি বিশ্বের একটি উন্নত পার্ক।

হাদীকাতুল আযহার

- আল-হাদীকাতুদ দুওয়ালিয়্যা (الحديقة الدولية)

আল-হাদীকাতুদ দুওয়ালিয়্যা (الحديقة الدولية) অর্থ আন্তর্জাতিক পার্ক। এটি হচ্ছে কায়রোর আব্বাস আল-আক্কাদ সড়কে (شارع عباس العقاد) অবস্থিত একটি আন্তর্জাতিক পার্ক (International garden)।

আল-হাদীকাতুদ দুওয়ালিয়্যা

- হাদীকাতু হাইওয়ানাতিল জীযা (حديقة حيوانات الجيزة)

www.maktabatulabrar.com

হাদীকাতু হাইওয়ানাতিল জীযা (حديقة حيوانات الجيزة) অর্থাৎ গীযা চিড়িয়াখানা। এটি কায়রোর সর্ববৃহৎ চিড়িয়াখানা। ১৮৯১ সনে এটি বানানো হয়, যেন এটি মধ্যপ্রাচ্যের সর্ববৃহৎ চিড়িয়াখানা হতে পারে।

গীযা এলাকায় যা কিছু দেখা হল

১৫/৪/১৯ সোমবার

গীযা এলাকা ও পিরামিড

পিরামিড দর্শনের জন্য জীযা (جيزه) এলাকায় (কায়রোবাসীদের উচ্চারণে গীযা এলাকায়) গমন করলাম। জীযা কায়রোর পশ্চিম-দক্ষিণ পাশে লাগোয়া বৃহত্তর কায়রোর অন্তর্ভূক্ত এলাকা। পিরামিডকে আরবিতে বলে হারাম (هرم), তার বহুবচন আহরাম (أهرام)। গাড়ীওয়ালাদেরকে 'হারাম' বললেই পিরামিড এলাকায় নিয়ে যায়। তবে একটা যন্ত্রণা রয়েছে। হারাম এলাকার কাছে পৌঁছলেই বিভিন্ন লোক গাড়ি থামিয়ে গাইড লাগবে কি না জানতে চায়। শুধু জানতেই চায় না, গাইড হিসেবে তাদেরকে গ্রহণের জন্য রীতিমত চাপাচাপি শুরু করে। এই গাইড নিলেও যন্ত্রণা। শেষ নাগাদ কী পরিমাণ গিনী দাবি করবে তার কোন ইয়ত্তা নেই। তবে আমাদের সাথে মেজবান কামরুজ্জামান থাকায় এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে। তিনি এরকম লোকদের সাফ জানিয়ে দিয়েছেন আমরা জামেয়া আযহারের ছাত্র, সব আমাদের চেনা জানা আছে। এজন্যই কোন ভিনদেশে ভ্রমণে গেলে স্থানীয় কোন লোক বা ভাল জানা-বুঝা কোন লোক গাইড হিসেবে সঙ্গে থাকতে হয়, নতুবা বিভিন্ন রকম মতলববাজ লোকের খপ্পরে পড়ার সমূহ

সম্ভাবনা থেকে যায়। যাহোক পিরামিড এলাকায় পৌঁছলাম। পিরামিড এলাকায় প্রবেশ টিকেটের মূল্য ১৬০ পাউন্ড। আমি, মাওলানা আব্দুল হালীম ও মেজবান আখতারুজ্জামান ৩ জনে টিকেট নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

আবুল হাওল-এর ভাস্কর্য

গেট থেকে পিরামিড চত্বর বেশ খানিকটা দূরে এবং বেশ উঁচুতে। প্রবেশ করার পর থেকেই রাস্তা উঁচু হতে শুরু করেছে। শুরুতেই উপর দিকে ওঠা রাস্তার বাম হাতে আবুল হাওল (أبو الهول)-এর বিশাল পাথরের ভাস্কর্য। সব পিরামিডের সামনে বিশাল এই মূর্তি যেন প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে। তাই আবুল হাওলকে বলা হয় পিরামিড চত্বরের প্রহরী (حارث المصطبة)।

সামনে বলা হবে এখানকার বড় তিনটি পিরামিডের এধ্যে যেটা মধ্যম সেটা হচ্ছে রাজা খাফ্রে'-র নির্মিত। এই খাফ্রে'র শাসনামলে (২৫৫৯ থেকে ২৫৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মাঝে) অর্থাৎ, এখন থেকে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার বছর পূর্বে আবুল হাওল-এর ভাস্কর্য নির্মিত হয়। এটি একটি প্রাণীর ভাস্কর্য, যার শরীরটি সিংহের এবং মস্তকটি মানুষের (নারির) মত। ভূপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা (মাথার উপর পর্যন্ত) ২০ মিটার (৬৬ ফুট)। সামনের দুটো পাসহ এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৩.৫ মিটার এবং প্রস্থ ১৯.৩ মিটার। এটি বেলে পাথর দ্বারা নির্মিত একটি মূর্তি। গোটা মূর্তি একটি পাথরের দ্বারা নির্মিত। আবুল হাওলকে ইংরেজিতে বলা হয় Sphinx (স্ফিংক্স)। গ্রীক পুরাণের বর্ণনা মোতাবেক স্ফিংক্স হল নারীর মুখ ও সিংহের দেহবিশিষ্ট বিরাটকায় দানবি। সংক্ষেপে বলা যায় স্ফিংক্স হল নারীসিংহীমূর্তি। কেউ কেউ বলেছেন, স্ফিংক্স তৈরির মাধ্যমে সম্ভবত রাজা খাফ্রে' রূপকভাবে তার নিজেরই প্রতিকৃতি তৈরি করিয়েছিলেন। মাথা মানুষের মত তৈরি করে বুদ্ধিমত্তা বুঝিয়েছেন আর শরীর সিংহের ন্যায় বানিয়ে শক্তিমত্তা বুঝিয়েছেন। এভাবে নিজের বুদ্ধিমত্তা ও শক্তিমত্তা জ্ঞাপনের জন্য নিজের এমন রূপক প্রতিকৃতি তৈরি করিয়েছেন। আরবি 'আবুল হাওল' (أبو الهول) নামটিও এমনই অর্থ জ্ঞাপন করে। কেননা أب অর্থ পিতা আর الهول অর্থ ভয়াবহতা। অতএব রূপকভাবে আবুল হাওল নামটি ভয়াবহ শক্তিধর বা প্রচণ্ড শক্তিধর অর্থে হতে পারে। সম্ভবত শক্তিমত্তার প্রতীক হিসেবে মিসরীয়রা বর্তমানেও তাদের মুদ্রা (পাউন্ড)–এর গায়ে আবুল হাওলের প্রতিকৃতির ছবি সংযোজন করে চলেছে। মিসরীয়দের অনেকে বিশ্বাস করে স্ফিংক্স বা আবুল হাওল মূলত সূর্য-দেবতা হোর-এম-আখেত (حور. إم. آخت/Horemakhet)-এর প্রতিকৃতি।

আবুল হাওলের মাথায় রয়েছে নেমেস (النمس/nemes)। নেমেস হচ্ছে

www.maktabatulabrar.com

মাথায় ব্যবহার্য রুমালের ন্যায় ডোরকাটা এক ধরনের বস্ত্র যা গোটা মুকুট ও গলার পেছন ও দুই পাশকে ঢেকে রাখত। মাঝে মধ্যে পিঠের দিকেও কিছুটা প্রলম্বিত হত। এটা ছিল ফারাওদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, ফারাওরা তাদের মাথায় যা পরিধান করত। আবুল হাওলের ভাস্কর্যের যে চেহারা সেটি খাফ্রের চেহারা নয়। মিসর জাতীয় যাদুঘরে খাফ্রের ভাস্কর্য রয়েছে, তার চেহারার সঙ্গে আবুল হাওলের চেহারার মিল নেই।

আবুল হাওলের প্রাচীন নাম ছিল বেলবিব (بيلبيب), আরবরা তার নাম রেখেছে আবুল হাওল।

আবুল হাওলের ডান পাশে নিচু স্থানে দূর্গ সদৃশ ইমারতের যে ভগ্নাবশেষ দেখা যায় এ সম্বন্ধে বলা হয় যে, এগুলো ছিল ফারাওদের যুগে শাহজাদীদের থাকার কক্ষ।

আবুল হাওলের ভাস্কর্য

আবুল হাওলের নাক ভাঙ্গা নিয়ে যত কথা

আবুল হাওলের নাক ভাঙ্গা– এ নিয়েও রয়েছে নানান কথা। কেউ কেউ বলেছেন শুরুতেই নাক ভাঙ্গা ছিল। এটা কোন যুক্তিযুক্ত কথা নয়। কেউ কেউ বলেছেন কালক্রমে নাক ভেঙ্গে গিয়েছে। এটাও কোন যুক্তিযুক্ত কথা নয়। কারণ কালক্রমে সর্বাঙ্গ একই হারে ক্ষয়ে যেতে পারে, শুধু নাকের উপর কেন এত ক্ষয় নেমে আসবে। কেউ কেউ বলেছেন, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের আমলে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর গোলার আঘাতে তার নাক ভেঙ্গে গিয়েছে। কিন্তু ডেনমার্কের অনুসন্ধানী নাবিক ফ্রেডারিক লুইস নরডেন (Frederick Louis norden মৃত ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দ) ১৭৩৭ সনে (যা ফরাসী বাহিনীর

আগমনের ৫০ বছরেরও বেশি আগে) মিসর থেকে সুদান পরিদর্শনের পর আবুল হাওলের যে চিত্র তার গ্রন্থ Voyage d'Egypte et de Nubia (জলযাত্রা: মিসর থেকে নুবিয়া [النوبة/Nubia]) তে পেশ করেছেন, তাতে আবুল হাওলের নাক ভাঙ্গা দেখানো হয়েছে। গ্রন্থটি ১৭৫৫ সনে প্রকাশিত হয়। এতে স্পষ্ট হয় যে, ফরাসী বাহিনীর গোলার আঘাতে আবুল হাওলের নাক ভাঙ্গেনি বরং আরও আগ থেকেই ভাঙ্গা ছিল। মাকরীযী উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের যুগে শায়খ মুহাম্মাদ নামে এক সূফি বুযুর্গ আবুল হাওলের পাশে বাস করতেন, যিনি সারা বছর রোযা রাখতেন। তিনি দেখা দৃষ্টিতে যত শরীয়ত-বিরুদ্ধ জিনিস ছিল সেগুলো দূর করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন লোকেরা আবুল হাওলের দিকে সম্মানের দৃষ্টিতে তাকায়। এটা মূর্তিকে সম্মান বিধায় শরীয়তের দৃষ্টিতে মারাত্মক পাপ। তাই তিনি আবুল হাওলের চেহারা এমনভাবে বিগড়ে দেন যে, চেহারার আদলই যেন আর বুঝা না যায়।

পিরামিড দর্শন

আবুল হাওলের ভাস্কর্যকে বাম হাতে রেখে ক্রমান্বয়ে উঁচু হয়ে ওঠা রাস্তা দিয়ে বেশ কিছুদূর হেঁটে পিরামিডের কাছে পৌঁছতে হবে। এই পথটুকু পাড়ি দেয়ার জন্য ঘোড়ার গাড়িও রয়েছে। রয়েছে সরাসরি ঘোড়ার পিঠে বা উটের পিঠে চড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ঘোড়া ও উট। ভাবলাম উটের পিঠে চড়েই ওঠা যাক। উটের পিঠে চড়া– কেমন যেন স্বাদ ও অ্যাডভেঞ্চারই বোধ হচ্ছিল। বিশ গিনী ভাড়া ঠিক করে একটা উটের পিঠে উঠে বসলাম। কিন্তু উটের পিঠে উঠে বসামাত্র উট যেই নড়াচড়া দিল শরীরটা কেমন যেন কাঁপতে শুরু করল। ভাবলাম পড়ে যাব। আসলে সবকিছুর জন্যই একটা প্রশিক্ষণ বা অভ্যাস লাগে। উটের পিঠে হাওদা থাকলে অবশ্য ভয় হত না, হাওদার দণ্ড ধরে পতন ঠেকানো যেত। কিন্তু হাওদা ছিল না। ছিল উটের পিঠের আসনের সাথে লাগানো সামনে পেছনে এক বিঘত লম্বা দুটো কাঠের দণ্ড, এই দুই দণ্ডের মাঝে বসতে হয়। এই দণ্ড ধরে সামনে বা পিছনের ঝোঁক হয়তো সামলানো যেত কিন্তু ডানে বামে পতন ঠেকানো যেত না। তাই উটওয়ালাকে বললাম, আমাকে নামিয়ে দাও। কিন্তু সে বেচারা কিছুতেই নামাতে রাজি নয়। আমার তখন অবস্থা হয়েছিল ছেড়ে দে মা কেন্দে বাঁচি, কিন্তু উটওয়ালা আমাকে নানানভাবে বোঝাতে চাচ্ছিল তুমি পড়ে যাবে না, কিছুক্ষণ পর সব ঠিক হয়ে যাবে, না হয় আমি তোমাকে ঠেকাবো, প্রয়োজনে আমি তোমার

www.maktabatulabrar.com

পাশে বসে তোমাকে ধরে রাখব ইত্যাদি। আমার তো ছিল পড়ে যাওয়ার ভয় আর তার ভয় ছিল আমি নেমে গেলে পাছে আবার তার বিশ গিনী হাতছাড়া হয়ে যায়। অবশেষে যখন তাকে বলা হল আমাকে নামিয়ে দিলেও তোমার বিশ গিনী তুমি ঠিকই পাবে, তখন সে নামিয়ে দিল। উটের পিঠে চড়ে পথ চলার স্বাদ আর আস্বাদন করা হল না। মনে পড়ল প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত জারীর ইবনে আব্দিল্লাহ আল-বাজালী (রা.)-এর কথা। বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে এসেছে– তিনি বলেন,

شكوتُ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم أني لا أثبتُ على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال : " اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هادِياً مَهْدِيّاً "

অর্থাৎ, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে অভিযোগ জানালাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারি না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বুকে হাত মেরে দুআ করলেন- হে আল্লাহ! তাকে স্থির রেখো এবং তাকে হেদায়েতকারী ও হেদায়েতপ্রাপ্ত বানাও। মনে হল রসূলের যুগ হলে তো আমিও এমন দুআ চেয়ে নিতে পারতাম।

যাহোক উট থেকে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে উঠেই পিরামিড চত্বরে গেলাম। আগের দিন হেঁটে হেঁটে বহু কিছু দেখেছিলাম। সেই বহু হাঁটার ক্লান্তি এখন আর হেঁটে অগ্রসর হওয়ার জযবাকে উদ্বেলিত হতে দিল না। তাই ঘোড়ার গাড়িতে চড়া।

পিরামিডগুলো দূর থেকে দেখে মনে হয় ছোট্ট ছোট্ট ইট দিয়ে বানানো। কিন্তু একেবারে কাছে গেলেই দেখা যায় ছোট্ট ছোট্ট ইট নয় বিশাল বিশাল পাথরের ব্লক দ্বারা নির্মিত।

পিরামিড কি ও কেন

পিরামিড (Pyramid/هرم) হল এক প্রকার জ্যামিতিক আকৃতি বিশিষ্ট স্থাপনা, যার বাইরের তলগুলো ত্রিভূজাকার (Triangular) এবং তলগুলো শীর্ষে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়। একটি পিরামিডের কমপক্ষে তিনটি ত্রিভূজাকার পার্শ্বতল (Triangular outer surfaces) থাকে, অর্থাৎ পিরামিডের ভূমিসহ কমপক্ষে চারটি তল থাকে। তবে চার ত্রিভূজাকার পার্শ্বতল বিশিষ্ট পিরামিডের ব্যবহারই বহুল, যাকে বলে বর্গাকার পিরামিড (Square Pyramid)। গীযার পিরামিডগুলো এ ধরনেরই।

পিরামিডগুলো কে বা কারা নির্মাণ করেছিল এবং কেন নির্মাণ করেছিল তা নিয়ে অনেক মতামত রয়েছে। মিসরের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ আল্লামা মাকরিযী বলেছেন, পিরামিডগুলো কখন কারা নির্মাণ করেছিল এবং কী

উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছিল তা নিয়ে পরস্পরবিরোধী বহু মত রয়েছে, যেগুলোর অধিকাংশই সঠিক নয়। (আল-খুতাতুল মাকরীযিয়্যাহ. খণ্ড ১, পৃ. ১৯৮) এক মত অনুসারে হযরত নূহ (আ.)-এর তূফানের পর সুরীদ নামে মিসরের এক বাদশাহ তার এক স্বপ্নের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে এক মহা বিপর্যয় দিবে বলে জানতে পেরে আত্মরক্ষার্থে পিরামিডগুলো নির্মাণের আদেশ দেন। আর এক মতে শাদ্দাদ নামক আদ সম্প্রদায়ের এক বাদশাহ এগুলো নির্মাণ করেন। আর এক মতে হযরত ইদ্রীস (আ.) কে এগুলোর নির্মাণকারী উল্লেখ করা হয়েছে। তবে প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন খনন কার্য ও উদ্ধারকৃত বিভিন্ন প্রাচীন লেখা পরীক্ষা ও যাচাই পূর্বক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রাচীন মিসরীয় শাসক তথা ফেরআউন বা ফারাও (Pharaoh)গণই পিরামিডগুলোর নির্মাতা। এই ফেরআউন বা ফারাওরা তাদের কবর বা সমাধি হিসেবেই পিরামিড নির্মাণ করেছিল। ফারাওদের চতুর্থ থেকে সপ্তদশ বংশের মধ্যে এই ধারার সমাধি নির্মাণের প্রচলন ছিল।

প্রাচীনকালে মিসরীয়রা বিশ্বাস করত মৃত্যুর পরও তাদের আত্মা বেঁচে থাকে। সেই আত্মা মরদেহের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। তারা মনে করত, মরদেহ টিকে থাকার ওপরই নির্ভর করে আত্মার ফিরে আসা। এ কারণেই মরদেহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তারা মমি করত। বস্তুত দেহের সঙ্গে যেন আত্মা সংযোজিত হতে পারে তাই মমি করে তারা দেহকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করত। দেহই যদি না থাকে তাহলে আত্মা কিসের সঙ্গে সংযোজিত হবে। আর দেহের সঙ্গে আত্মা সংযুক্ত না হলে পরকালের আরাম-আয়েশ ভোগ করা হবে কীভাবে। আবার বেঁচে থাকার জন্য চাই প্রয়োজনীয় নানান জিনিস। তাই তারা মৃতদেহের সাথে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র, বিশেষ করে খাবার-দাবার দিয়ে দিত। আবার দেহ যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির কারণে নষ্ট হয়ে যেতে না পারে এবং সমাধিতে দেয়া নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র, বিশেষ করে খাবার-দাবার ইত্যাদি দস্যু কর্তৃক চুরি হয়ে যেতে না পারে সে জন্য দরকার মজবুত সমাধিক্ষেত্র। এসব চিন্তা থেকেই সবথেকে সামর্থবানরা তথা ফারাওরা জীবদ্দশায়ই মজবুত সমাধিক্ষেত্র বানিয়ে নিত। অনেক ফারাও মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সমাধিক্ষেত্র তৈরির কাজ চালিয়ে যেত। এভাবেই রাজাদের জন্য তৈরি হয়েছে মজবুত সমাধিক্ষেত্র তথা পিরামিডগুলো। বড় বড় পিরামিডের পাশে ছোট ছোট পিরামিডগুলো সম্ভবত রাজাদের স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য নির্মিত হয়েছিল, যাতে পরকালে স্ত্রী ও আত্মীয়-

www.maktabatulabrar.com

স্বজনরা রাজাদের পাশে থেকে তাদের সেবা করতে পারে।

মিসর ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কম বেশ পিরামিড রয়েছে। তবে মিসরের পিরামিড সংখ্যায় অধিক ও নির্মাণশৈলিতে বিশ্বখ্যাত। এ পর্যন্ত মিসরের মেমফিস, সাক্কারাহ ও জীযা (মিসরীয়দের উচ্চারণে গীযা) প্রভৃতি এলাকায় শতাধিক পিরামিডের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং আকর্ষণীয় হচ্ছে গীযার পিরামিডগুলো।

গীযার পিরামিডসমূহের ছবি

গীযার পিরামিডসমূহের বর্ণনা

গীযার পিরামিড চত্বরে এখনও ছোট বড় মিলে ৮টি পিরামিড আছে। ভাংগাচোরা আরও অনেক পিরামিডের অংশ দেখে বুঝা যায় এক সময় এখানেই প্রচুর সংখ্যক পিরামিড ছিল, হাজার হাজার বছরের কালপরিক্রমায় সেগুলো ভেঙ্গেচুরে মাটির সাথে মিশে গেছে।

প্রবেশ গেট দিয়ে ঢোকার পর কিছুদূর গিয়ে আবুল হাওলের ভাস্কর্যকে বাম হাতে রেখে সামনের দিকে তাকালে বড় বড় ৩টি পিরামিড দেখা যাবে। এর মধ্যে মাঝখানেরটা সবচেয়ে বড়। এর মাথার থেকে নিচের দিকের কিছু কিছু অংশ ক্ষয়ে গেছে বিধান মাথার অংশটুকু মনে হয় যেন একটা ক্যাপ পরানো। এটিকে বলা হয় খুফু-র পিরামিড। তার ডানেরটা দ্বিতীয় বৃহত্তম পিরামিড, এটিকে বলা হয় খাফ্রে'-র পিরামিড। খাফ্রে'-র পিরামিডের পাদদেশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছোট্ট দুটো পিরামিড রয়েছে। খুফু-র পিরামিডের বামে

রয়েছে তৃতীয় বৃহত্তম পিরামিড। এটিকে বলা হয় মেনকাউরি-র পিরামিড। এর পাদদেশে রয়েছে ছোট্ট ছোট্ট আরও ৩টি পিরামিড। এই হল সর্বমোট ৮টি পিরামিড।

উপরোক্ত ৮টি পিরামিডের মধ্যে সবচেয়ে বড় পিরামিডটি খুফু-র পিরামিড হিসেবে পরিচিত। এটি হচ্ছে গীযার গ্রেট পিরামিড বা মহা পিরামিড (الهرم الأكبر)। রাজা খুফু (خوفو/Khufu) এটি নির্মাণ করেছিল। খুফু ছিল ফারাওদের চতুর্থ রাজবংশের দ্বিতীয় ফারাও। তার শাসনকাল ছিল ২৫৮৯ থেকে ২৫৬৬ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। খুফুর পিরামিড তৈরি হয়েছিল ২৫৬০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে অর্থাৎ সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে। শুরুতে এর উচ্চতা ছিল ৪৮১ ফুট (১৪৬.৫ মিটার)। পরে উপর দিকে থেকে কিছু কমে যাওয়ায় বর্তমানে রয়েছে ৪৫৫ ফুট (১৩৮.৮ মিটার)। এটি ১৩ একর জমির উপর স্থাপিত। এটা তৈরি করতে সময় লেগেছিল প্রায় ২০ বছর এবং শ্রমিক খেটেছিল আনুমানিক ১ লক্ষ। পিরামিডটি তৈরি করা হয়েছিল ২০ লক্ষের চেয়ে বেশি বিশাল বিশাল পাথরের ব্লক দিয়ে, যেগুলোর একেটার ওজন ছিল ২ থেকে ১৫ টন পর্যন্ত। গড় ওজন ছিল আড়াই টন। আর দৈর্ঘ্য ছিল ৩০ থেকে ৪০ ফুটের মত। এগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল আসওয়ান এলাকার পাহাড় থেকে। পাথরের ব্লকগুলো এমনভাবে জোড়া দেয়া হয়েছে যে, বাইরে থেকে তা কোনোভাবেই দেখা যায় না। ভূমি থেকে কিছু উপরে গ্রেট পিরামিডে প্রবেশের একটা গর্ত দেখা যায়, যা দিয়ে ভিতরে একটা সুড়ংয়ের সংযোগ পাওয়া যায়। সেই সুড়ং দিয়ে পিরামিডের ভিতরে ভিতরে চূড়া পর্যন্ত আরোহণ করা যায়। এই গর্তটি পিরামিডে প্রবেশের নিয়মতান্ত্রিক দরজা নয় বরং বাদশাহ হারুনুর রশীদ পিরামিডের অভ্যন্তরের রহস্য উদ্ধার করার জন্য এই গর্তটি বানিয়েছিলেন।

খুফুর পিরামিড গ্রেট পিরামিড বলে স্বীকৃত। এই গ্রেট পিরামিড প্রাচীন যুগের সপ্ত আশ্চর্যের একটি। ইংল্যান্ডের লিঙ্কন ক্যাথিড্রাল নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত এটি বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা ম্যানমেড কাঠামো হিসেবে বিবেচিত ছিলো। লিঙ্কন ক্যাথিড্রাল চার্চ ১৩১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (মোট ২৩৮ বছর) গীযার গ্রেট পিরামিডের পর সবচেয়ে উঁচু স্থাপনা হিসেবে পরিগণিত ছিল। তারপর বিশ্বে আরও বেশি উঁচু কাঠামো নির্মিত হয়েছে। তবে এই যুগে ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্র উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করার পরও উচ্চতা, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ

www.maktabatulabrar.com

সবকিছুর বিবেচনায় গীযার এই গ্রেট পিরামিড বা মহা পিরামিড এখনও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্থাপনা বলে গণ্য হয়ে থাকে।

পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য বলে একটা কথা রয়েছে। বিভিন্ন যুগে এই সাতটি আশ্চর্যজনক জিনিসের তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন জিনিস গণ্য হয়। প্রাচীন যুগের সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে গীযার মহা পিরামিড একটি। তখন সপ্তাশ্চর্যের তালিকায় যেসব জিনিস গণ্য হত তার মধ্যে একমাত্র এই পিরামিডই অদ্যাবধি অবশিষ্ট রয়েছে। তখন সপ্তাশ্চর্যের তালিকায় ছিল –

১. গীযার মহা পিরামিড
২. ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান
৩. জিউসের মূর্তি
৪. আর্টেমিসের মন্দির
৫. হ্যালিকারনেসাসের সমাধি মন্দির
৬. রোডস এর মূর্তি
৭. আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর

দ্বিতীয় বৃহত্তম পিরামিডটি (الهرم الأوسط) খাফ্রে’-র পিরামিড হিসেবে পরিচিত। খুফু-র পুত্র খাফ্রে’ (خفرع/Khafre) এটা নির্মাণ করেছিল। খাফ্রে’ ছিল ফারাওদের চতুর্থ রাজবংশের তৃতীয় বা চতুর্থ ফারাও। খাফ্রেকে শেফরন (شيفرن/Chephren)ও বলা হয়। তার শাসনামল ছিল ২৫৫৯ থেকে ২৫৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মাঝে। নির্মাণকালে এই পিরামিডের উচ্চতা ছিল ৪৭১ ফুট। বর্তমানে রয়েছে ৪৪৭ ফুট।

তৃতীয় বৃহত্তম পিরামিডটি (الهرم الأصغر) মেনকাউরি-র পিরামিড হিসেবে পরিচিত। খাফ্রে’-র পুত্র মেনকাউরি (Menkaure) এটা নির্মাণ করেছিল। কেউ কেউ নামটির উচ্চারণ করেছেন মেনকাউরা (Menkaura)। মেনকাউরির নাম আরবিতে দু’ভাবে লেখা হয়। (১) منقرع (২) من كاورع। আরবি ২য় উচ্চারণ থেকে মেনকাউরিকে ‘মেনকারে’ও বলা হয়ে থাকে। মেনকাউরি ‘মাইকেরিনোস’ (ماي كرينوس/Mykerinos) নামেও পরিচিত। মেনকাউরি ছিল ফারাওদের চতুর্থ রাজবংশের পঞ্চম ফারাও। মেনকাউরি ২৫৩২ থেকে ২৫০৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাজত্ব করেন। নির্মাণকালে এই পিরামিডটির উচ্চতা ছিল ২১৮ ফুট। বর্তমানে রয়েছে ২০৪ ফুট।

আলেকজান্দ্রিয়ায় যা কিছু দেখা হল

১৭/৪/১৯ বুধবার আলেকজান্দ্রিয়া গমন

আলেকজান্দ্রিয়া শহরের পরিচয়

আলেকজান্দ্রিয়া (الإسكندرية/Alexandria) মিসরের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং এই শহরেই মিসরের বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর অবস্থিত। শহরটি উত্তর-পশ্চিম মিসরে ভূমধ্যসাগরের পাড়ে অবস্থিত। আলাকজান্দ্রিয়াকে বর্তমানে মিসরের কেন্দ্রীয় শিল্প নগরী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ভূমধ্যসাগরের তীর ঘেঁষে প্রায় ৩২ কিলোমিটার জুড়ে এই নগরীটি গড়ে উঠেছে। ভূমধ্যসাগরের তীরে গড়ে উঠা শহরগুলোর মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়া সবচেয়ে বড়। রাজধানী কায়রো থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার দূরত্ব ২২২ কিলোমিটার। শহরটি গভর্ণর শাসিত এবং এ ধরনের শহরকে মিসরে 'মুহাফাজা' (محافظة) বলা হয়। কায়রো থেকে প্লেন, টেক্সি বা মাইক্রোতে আলেকজান্দ্রিয়া গমন করা যায়। কায়রো রামসিস রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে রেলেও যাওয়া যায়। রেলের ভাড়া অবিশ্বাস্য রকম কম। সাধারণ রেলে ভাড়া মাত্র ১০ মিসরীয় পাউন্ড (১০ গিনি), যা আমাদের মুদ্রায় মাত্র ৫০ টাকা।

আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন নাম ছিল রাকোটিশ (Rhacotis)। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩১ অব্দে গ্রিক মহাবীর আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট (Alexander the Great) এই নগরীকে নতুনভাবে সাজান। পরে তাঁর নামানুসারে এই নগরীর নাম হয় আলেকজান্দ্রিয়া। আলেকজান্ডারকে আরবিতে বলা হয় আল-ইস্কান্দার আল-মাকদূনী (الإسكندر المقدوني)। এ হিসেবেই আলেকজান্দ্রিয়া নগরীকে আরবিতে আল-ইস্কান্দারিয়া (الإسكندرية) বলা হয়। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তার অন্যতম সেনাপতি টলেমী (Ptolemy/بطليموس) আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের এই অংশের অধিকারী হন। এ এলাকায় গড়ে ওঠে টলেমীয় রাজত্ব। টলেমীয় শাসকদের সেই আমলে আলেকজান্দ্রিয়া ছিল মিসরের রাজধানী। মূলত আলেকজান্ডারই এটিকে রাজধানী বানান। তখন আলেকজান্দ্রিয়ার ছিল বিরাট দাপট। (৬৪১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই নগরী মিসরের রাজধানী ছিল। ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে ফুসতাত [فسطاط/Fustat] নগরে মিসরের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়, পরে তা কায়রো নগরীর ভিতরে মিশে গেছে।) তারপর মিসরের মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসকগণের আমলে আলেকজান্দ্রিয়ার দাপট ক্ষয়ে যেতে থাকে এবং উসমানীয় রাজত্বের সময় এটি নিছক ছোট একটি জেলেপাড়া হিসেবে পরিগণিত হয়।

আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর ও আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের জন্য

www.maktabatulabrar.com

আলেকজান্দ্রিয়ার ছিল বিশ্বব্যাপী খ্যাতি। ধর্মীয় ঐতিহ্যের বিচারেও আলেকজান্দ্রিয়া উল্লেখযোগ্য। আলেকজান্দ্রিয়া বহু মুসলিম মনীষীর পদচারণায় ধন্য একটি নগরী। বহু সাহাবীর আগমনও ঘটেছে এখানে। এখানে জীবন আতিবাহিত করেছেন বহু বুযুর্গ ও মুসলিম মনীষী, যাদের কবর ও মাজার এখনও এই এলাকায় সুপরিচিত।

আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর ও কায়তবাই-এর দূর্গ

প্রাচীন যুগে ঘনকুয়াশা কিংবা রাতের অন্ধকারের কারণে সমুদ্রপথে জাহাজ নাবিকরা পথ হারিয়ে বন্দরে পৌঁছতে পারতো না। এই অসুবিধার জন্য নাবিক এবং ব্যবসায়ীরা আতঙ্কগ্রস্ত থাকতো। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ২৮০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মিসরের সম্রাট টলেমি দ্বিতীয় (بطليموس الثاني/Ptolemy II) ভূমধ্যসাগর উপকূলে আলেকজান্দ্রিয়ার উত্তরাংশে অনেকটা ভূমধ্যসাগরের ভিতরে ফ্যারোস দ্বীপে (جزيرة فاروس) একটি বাতিঘর তৈরি করেন। এটিই আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর (Lighthouse of Alexandria/منارة الإسكندرية) নামে খ্যাত। প্রথমে বন্দরের পরিচিতি চিহ্ন হিসেবে তৈরি করা হলেও পরবর্তীকালে এটি বাতিঘর হিসেবে কাজ করে। পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য বলে একটা কথা রয়েছে। বিভিন্ন যুগে এই সপ্তাশ্চর্য তথা সাতটি আশ্চর্যজনক জিনিসের তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন জিনিস গণ্য হয়। পূর্বেও বলা হয়েছে, প্রাচীন যুগের সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘরও গণ্য হত। তখন সপ্তাশ্চর্যের তালিকায় ছিল –

১. গীযার মহা পিরামিড
২. ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান
৩. জিউসের মূর্তি
৪. আর্টেমিসের মন্দির
৫. হ্যালিকারনেসাসের সমাধি মন্দির
৬. রোডস এর মূর্তি
৭. আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর

আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘরের মূল ভিত্তিভূমির আয়তন ছিল ১১০ বর্গফুট। উচ্চতা ছিল ১২০ মিটার। ঐতিহাসিক মাসউদী ৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে বাতিঘরটি দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এর উচ্চতা মেপে দেখেছেন ১২০ হাত। বাতিঘরটিতে একটা প্যাঁচানো সিড়ি ছিল। এই সিড়ি বেয়েই উপরে উঠে বিশাল অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে দেয়া হত। রাতের অন্ধকারে ৫০ মাইল দূর থেকেও বাতিঘরটি দেখা যেত। ৭০৩ হিজরিতে সুলতান রুকনুদ্দীন বেইবারস -২

আল-জাশানকির (ركن الدين بيبرس الجاشنكير/Rukn ad-din Baibars II al-Jashankir) বাতিঘরটির সংস্কার করেন। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আন-নাসের মুহাম্মাদ বিন ক্বালাউন (الناصر محمد بن قلاوون)-এর যুগে এক প্রবল ভূমিকম্পে বাতিঘরটি ভেঙ্গে পড়ে। ইবনে বাতূতা ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া দর্শনে গিয়ে বাতিঘরটিকে এমন ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন যে, তার মধ্যে ঢোকার বা তার উপরে আরোহণ করার মত অবস্থা ছিল না। সুলতান নাসের মুহাম্মাদ বাতিঘরটির স্থলে আর একটি বাতিঘর নির্মাণ শুরু করেছিলেন কিন্তু তার মৃত্যু ঘটায় তা আর হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীতে ১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দে মিসরের মামলূক রাজ সুলতান আশরাফ কায়তবাই (الأشرف قايتباي) আলেকজান্দ্রিয়া পরিদর্শনে গিয়ে বাতিঘরটির স্থানে একটি দূর্গ নির্মাণের নির্দেশ দেন। গড়ে ওঠে একটি দূর্গ, যার নাম কায়তবাই দূর্গ (قلعة قايتباي/Citadel of Qaitbay) বা কায়তবাই টাওয়ার (برج قايتباي)। এখনও এ দূর্গ বা টাওয়ারটি বিদ্যমান রয়েছে। পর্যটকগণও সেখানে পরিদর্শনে যেয়ে থাকেন। কারও কারও ধারণা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাতিঘরটির পাথর দিয়েই দূর্গটি নির্মাণ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, বাতিঘরটির স্থানেই এ দূর্গটি নির্মাণ করা হয়েছে। তবে গুগল ম্যাপের নির্দেশনা অনুসারে এখন যেখানে কায়তবাই দূর্গটি অবস্থিত তার কিছুটা দক্ষিণ-পূর্ব দিয়ে দ্বীপটির কিছু অংশ সাগরের মধ্যে বর্ধিত হয়ে কিছু পূর্ব-পূর্ব দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই ছিল বাতিঘরটির অবস্থান।

আলেকজান্দ্রিয়ার এই বাতিঘরকে ইংরেজিতে বলে 'লাইটহাউস অব আলেকজান্দ্রিয়া' (Lighthouse of Alexandria) আর আরবিতে বলে 'মানারাতুল ইস্কান্দারিয়া' (منارة الإسكندرية) বা 'ফানারাতুল ইস্কান্দারিয়া' (فنارة الإسكندرية)। বাতিঘরটির প্রাচীন ছবিতে দেখা যায় সেটি উঁচু মিনারা সদৃশ ছিল, তাই হয়তো আরবিতে 'মানারাহ' (তথা মিনারা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া মানারাহ শব্দটি বাতিঘর অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর 'ফানারা' (فنارة) বলা হয় সমুদ্র বন্দরে উঁচুতে স্থাপিত বাতিকে, তাই আরবিতে বলা হয়েছে ফানারাতুল ইস্কান্দারিয়া (তথা আলেকজান্দ্রিয়ার উঁচু বন্দর-বাতি)।

www.maktabatulabrar.com

আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘরের প্রাচীন ছবি

কায়তবাই-এর দূর্গ

আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার

আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার (مكتبة الإسكندرية/Library of Alexandria) বলতে আলেজান্দ্রিয়ার প্রাচীন গ্রন্থাগারকেই বুঝানো হয়ে থাকে। আলোকজান্দ্রিয়ার সেই প্রাচীন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করছি। এখন সেটি নেই, বহু বছর পূর্বেই তা ধ্বংস হয়েছে। এখন আলেকজান্দ্রিয়ার যে গ্রন্থাগার সেটি সেই প্রাচীন গ্রন্থাগার যে স্থানে ছিল তারই পাশে নির্মিত হয়েছে। এবার প্রথমে আমরা আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনা করছি, তারপর আলেকজান্দ্রিয়ার বর্তমান গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনা করব।

আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন গ্রন্থাগার

আলেকজান্দ্রিয়া শহরে অবস্থিত ছিল আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন গ্রন্থাগার বা আলেকজান্দ্রিয়ার রাজ-গ্রন্থাগার (مكتبة الإسكندرية/Library of Alexandria)। এটি ছিল প্রাচীন বিশ্বের বৃহত্তম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগারগুলোর একটি। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মিসরের টলেমিক রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে এই গ্রন্থাগারটি গড়ে উঠেছিল। কারও কারও মতে টলেমি রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা টলেমি প্রথম সোটার (بطليموس الأول سوتير/Ptolemy I Soter)-এর রাজত্বকালে (৩২৩-২৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কারও মতে তাঁর পুত্র টলেমি দ্বিতীয় ফিলাডেলফাস (بطليموس الثاني فلادلفوس/Ptolemy II Philadelphus)-এর রাজত্বকালে (২৮৫-২৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেউ কেউ দুই মতের মধ্যে সমন্বয় করে বলেছেন, টলেমি প্রথমের আমলে শুরু হয়ে টলেমি দ্বিতীয়-র আমলে সমাপ্ত হয়। কারও কারও মতে আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট (৩৫৬–৩২৩ খ্রিস্টপূর্ব) এটি গড়েছিলেন।

সারা পৃথিবী থেকে গ্রন্থ ধার করে তার অনুলিপি তৈরি করা এবং এই গ্রন্থাগারে নিয়ে আসার জন্য এই গ্রন্থাগারে কর্মচারী নিয়োগ করা হত। অধিকাংশ গ্রন্থই লেখা হত প্যাপিরাসে এবং সেগুলো গোলাকারে প্যাঁচানো অবস্থায় রাখা হত। রাজা টলেমি দ্বিতীয় ফিলাডেলফাসের সময় প্রায় ৫,০০,০০০ গোটানো বই ছিল। গ্রন্থ সংগ্রহের পাশাপাশি এই গ্রন্থাগারে বক্তৃতাকক্ষ, সভাকক্ষ ও বাগানও ছিল। অতীতকালের গ্রন্থ সংগ্রহের পাশাপাশি এই গ্রন্থাগারে একদল আন্তর্জাতিক গবেষক সপরিবারে বাস করতেন। রাজা তাদেরকে বৃত্তি প্রদান করতেন। এটি শুধু গ্রন্থাগারই ছিল না, ছিল একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানও এবং একটি জাদুঘরও। এ গ্রন্থাগারে প্রাচীন

www.maktabatulabrar.com

বিশ্বের বহু বিশিষ্ট দার্শনিক পড়াশোনা ও গবেষণা করেছেন। যেসব বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এই গ্রন্থাগারে পড়াশোনা ও গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে গণিত, প্রযুক্তিবিদ্যা, শরীরবিদ্যা, ভূগোল ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশিষ্ট প্রথিতযশা মনীষীরা আছেন। তারা হলেন ইউক্লিড (Euclid), আর্কিমিডিস (Archimedes), এরাটোস্থেনেস (Eratosthenes), হেরোফিলয়াস (Herophilus), এরাসিস্ট্রাটাস (Erasistratus), হিপ্পার্কাস (Hipparchus), এইডেসিয়া (Aedesia), পাপ্পাস (Pappus), হাইপাটিয়া (Hypatia), এ্যারিস্টার্কাস (Aristarchus), সাধু ক্যাথরিন (Saint Catherine)।

এ গ্রন্থাগারটি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। যার ফলে বহু স্ক্রোল (প্যাপিরাসে গোলাকারে পেঁচিয়ে রাখা গ্রন্থের কপি) ও গ্রন্থ চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। এই অগ্নিকাণ্ডের সময় নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কে বা কারা এই অগ্নিসংযোগ ঘটিয়েছিল তা নিয়েও মতান্তর রয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মত হল– খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮ অব্দে জুলিয়াস সীযার (يوليوس قيصر) এবং মিসরের রাজা টলেমি ত্রয়োদশ (Ptolemy XIII ৪৭–৬২ খ্রিস্টপূর্ব)-এর মধ্যে যুদ্ধের সময় টলেমির সৈন্যরা সীযারের সৈন্যদের অবরুদ্ধ করে ফেললে সীযারের সৈন্যরা কূলে থাকা ১০১টা জাহাজে আগুন লাগিয়ে দেয়। এ সময় জাহাজগুলো জ্বলতে জ্বলতে সংলগ্ন এই গ্রন্থাগারে আগুন ধরে যায়। এ সময় প্রায় ৪০,০০০ গ্রন্থ পুড়ে যায় এবং প্রায় সম পরিমাণ বই সম্পূর্ণ পুড়ে না গেলেও পাঠের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও আরও ৩ বার আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি যুদ্ধ আর অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়। তার বর্ণনা নিম্নরূপ– (এক) একটি অগ্নিকাণ্ড ঘটে খ্রিষ্টপূর্ব ৮৯-৮৮ অব্দে। এ সময় অষ্টম টলেমি আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। এ সময়ে দেশে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় এবং লাইব্রেরির কিছু অংশে অগ্নিসংযোগ ঘটে। (দুই) আরেকটি অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে ২৭৩ খ্রিস্টাব্দে। এ সময় পলিমারের রাণী জেনেবিয়া সম্রাট অ্যারেলিয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে অ্যালেরিয়ান ও জেনেবিয়ার মাঝে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে অ্যারেলিয়ান লাইব্রেরিটির যে অংশ অক্ষত ছিল সেখানেও আগুন লাগিয়ে দেন। (তিন) আরেকটি অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে ৩৯১ খ্রিস্টাব্দে। যখন বিশপ থিওফিলস (ثيوفيلوس/ Theophilos) প্যাগানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তিনি প্যাগান মন্দির বন্ধের নির্দেশ দেন। প্যাগানরা তাতে অস্বীকৃতি জানালে থিওফিলস তাদের সকল মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করেন। তখন লাইব্রেরির যে অংশটুকু বিদ্যমান ছিল তাও ধ্বংস হয়। উল্লেখ্য,

আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন গ্রন্থাগারের সব গ্রন্থ এক স্থানে ছিল না, ছিল তিন জায়গায়, একটি মন্দিরেও কিছু গ্রন্থ ছিল। বিশেষত প্রধান গ্রন্থাগার পুড়ে যাওয়ার পর সেরাপিস (سيرابيس/ Serapis) মন্দিরই হয়ে উঠেছিল প্রধান গ্রন্থাগার। (তখনকার মিসরীয়রা সেরাপিসকে তাদের রোগমুক্তির দেবতা মনে করত।) থিওফিলসের নির্দেশে এ মন্দিরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার ধ্বংস নিয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর বিরুদ্ধে জঘন্ন মিথ্যাচার

কেউ কেউ বলেন, মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর আমলে যখন মিসর বিজিত হয়, তখন মিসরের গভর্ণরের দায়িত্বে ছিলেন সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা.)। সে সময় ইয়াহইয়া আল নাহাউঈ নামের এক জ্ঞানী লোক থাকত মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে। তিনি হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)কে কিছু দার্শনিক উক্তি শোনালেন আর আমর ইবনুল আস (রা.) খুশি হয়ে তাকে কিছু দিতে চাইলেন। নাহাউঈ তাঁর কাছ থেকে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির বইগুলো নিতে চাইলেন। কিন্তু আমর ইবনুল আস (রা.) তা করার আগে খলিফা ওমরের কাছে অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখেন। চিঠির উত্তরে খলিফা ওমর রা. লিখে পাঠান, 'বইপত্রগুলো যদি কুরআনের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তবে তো সেগুলো আমাদের দৃষ্টিতে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বিধায় সেগুলো অবশ্যই ধ্বংস করা চাই। আর বইপত্রগুলোতে যদি কুরআনের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কথা থেকেও থাকে, তবে সেগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাই বইগুলো ধ্বংস কর।' এরপর আমর ইবনুল আস (রা.) বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন এই গ্রন্থাগারটির বইয়ের খণ্ডগুলো আলেকজান্দ্রিয়া শহরের স্নানাগারে পাঠিয়ে দেন আর সেখানে পানি গরম করার জন্য এই বইগুলো জ্বালানো হয়। সবগুলো বই জ্বালিয়ে শেষ করতে ৬ মাস লেগেছিল।

এটা হল ইতিহাসে হযরত উমর (রা.)-এর নামে করা অন্যতম একটা মিথ্যাচার। ইসলাম বিদ্বেষী মহলে এই গল্পটি খুবই রসালোভাবে চর্চিত হয়ে থাকে। এই মিথ্যা ও কাল্পনিক গল্প বয়ান করে তারা মন্তব্যও জুড়ে দেয় যে, 'দেখো মুসলমানরা কত নীচু প্রজাতির, জ্ঞানচর্চার প্রতি তাদের কী অনীহা, বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগারটি ধ্বংস করে তারা মানবসভ্যতাকে কয়েকশ বছর পিছিয়ে দিয়েছে।

খলিফা ওমরের মৃত্যুর কমপক্ষে ৫০০ বছর পরে কয়েকজন খ্রিস্টান এ

www.maktabatulabrar.com

গল্পটা আবিষ্কার করেছে। মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কেবল খৃষ্টানগণ নয় হিন্দুগণও বারবার এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বাংলাভাষায় সম্ভবত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম এই কল্পকাহিনীটা আমদানী করেন। ঘটনাটা তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন "আরব সেনাপতি অমরু আলেকজানদ্রিয়া বিজয় করিয়া যখন খালিফ ওমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, আলেকজানদ্রিয়ার গ্রন্থশালার কী ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তখন খালিফা উত্তর দিলেন, গ্রন্থশালার গ্রন্থগুলি হয় কোরানের মতের অনুযায়ী, না হয় বিরুদ্ধ। যদি অনুরূপ হয় তো এক কোরান থাকিলেই যথেষ্ট, আর যদি বিরুদ্ধমত হয় তো গ্রন্থগুলি নিশ্চয়ই অনিষ্টকর।" (বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার, শ্রী প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা, ১৩৬৪)

নিম্নে এই মিথ্যাচারের ১০টি খণ্ডন পেশ করা হল।

১. সর্বপ্রথম কথা হল ইসলাম ও মুসলমানগণ বিদ্যানুরাগী, বিদ্যাবিদ্বেষী নয়। একমাত্র ইসলাম ধর্মেই জ্ঞানচর্চার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ইসলামে প্রত্যেকের উপর জ্ঞান শিক্ষাকে ফরয করে দেয়া হয়েছে। অন্য কোন ধর্মে জ্ঞানচর্চার প্রতি এরূপ তাগিদ তো নয়ই, উৎসাহ পর্যন্ত দেয়া হয়নি। বরং কোন কোন ধর্মে জ্ঞান চর্চার প্রতি রীতিমত অনুৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ গোষ্ঠি ব্যতীত অন্য কারও জন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার অধিকার পর্যন্ত রাখা হয়নি। এভাবে ঐ ধর্মে জ্ঞানচর্চাকে অনুৎসাহিত বরং সিংহভাগ লোকের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব যে ধর্মে জ্ঞান চর্চার এত গুরুত্ব ও সম্মান সে ধর্মের লোকেরা জ্ঞানের বাহক বই-পত্র ধ্বংস করতে পারে না। মুসলমানদের দ্বারা লাইব্রেরী জ্বালানোর কাজ হতেই পারে না।

২. যারা মুসলমান নয় তাদের দ্বারা লাইব্রেরি জ্বালানোর ঘটনা ইতিহাসে বহু ঘটেছে, কিন্তু মুসলমানদের দ্বারা তেমন কোন ঘটনা ঘটেছে বলে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য নেই। ৬৫৬ হিজরীর সফর মাসে হালাকু খাঁ কর্তৃক খলীফা মুসতা'সিম বিল্লাহকে পরাজিত করার পর বাগদাদের শাহী লাইব্রেরীকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। হালাকু খাঁর নির্দেশে বিশাল শাহী লাইব্রেরিটির সমুদয় কিতাব-পত্র ও পাণ্ডুলিপি দজলা নদীর গর্ভে ফেলে দেয়া হয়, যার ফলে বাঁধের মত হয়ে দজলা নদীর শ্রোত বন্ধ হয়ে যায় এবং হস্তলিখিত সেই সব গ্রন্থ ও কিতাব-পত্রের কালিতে দজলা নদীর পানি কাল বর্ণ ধারণ করে এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। এই তো ইং ২০০৩

সালের মে মাসে ইঙ্গ-মার্কিন হানাদার বাহিনী কর্তৃক ইরাকের রাজধানী বাগদাদ জবর দখলের অব্যবহিত পরেই প্রথমে যে কাজগুলো তারা করল তার মধ্যে একটা হল বাগদাদের সংগ্রহে থাকা হাজার হাজার বছরের পুরনো বই-পত্রগুলো ধ্বংস করে দিল। তার মধ্যে কিছু তারা নিজ মদদে লুটপাট হতে দিল, আর কিছু তারা জ্বালিয়ে দিল। এর বর্ণনা তো আমরা পত্র-পত্রিকায় নিজেরাই দেখলাম। এখনও হয়তো কারও কারও কাছে সেইসব পত্র-পত্রিকার কাটিং থাকতে পারে। কর্ডোভার গ্রন্থাগারে আলেকজান্দ্রিয়ার চেয়ে ছয় গুণ বেশি বই ছিল। কিন্তু সেসব বইয়ের একটিও মুসলমানরা ধ্বংস করেনি।

৩. কোন তথ্য ইসলামের প্রতিকূল হলেই কিংবা অনুকূল না হলেই, কিংবা অপ্রয়োজনীয় হলেই তা ধ্বংস করে দেয়ার নীতি ইসলামে নেই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কারও কারও কাছে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত লিখে রাখা ছিল। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নীতি বলে গেছেন তার সারকথা হল– ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের কোন বর্ণনা কুরআন সুন্নাহর অনুকূল হলে তা গ্রহণযোগ্য। আর কোন বর্ণনা কুরআন সুন্নাহর বর্ণনার বিপরীত হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়, আর কুরআন সুন্নাহর অনুকূলও নয় প্রতিকূল নয়- এমন হলে তাকে আমরা সত্যও জানব না মিথ্যাও বলব না। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত লেখা সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়ার নীতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেখে যাননি। তাহলে রসূলের খলিফা ওমর (রা.) তেমন নির্দেশ কীভাবে দিতে পারেন?

৪. এটা বিস্ময়ের কথা যে, মিসর জয় করার পর কায়রো গ্রন্থাগারের লক্ষ লক্ষ বইয়ের একটার গায়েও টাচ পর্যন্ত করা হল না, মিসরের দক্ষিণ সিনাইয়ে সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারির মধ্যে যে লাইব্রেরি রয়েছে তাতেও লক্ষাধিক হস্তলিখিত বই ও অন্যান্য বহু গ্রন্থ ছিল এবং এখনও রয়েছে সেগুলোর একটার গায়েও মুসলমানরা টাচ পর্যন্ত করল না, অথচ আলেকজান্দ্রিয়ার বইগুলো পুড়িয়ে দিল!

৫. বিখ্যাত ইসলামি ইতিহাসবিদদের কোনো বর্ণনাতেই এই ঘটনার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। আল ওয়াক্বিদি, আত তাবারি, ইবনুল আছীর, ইবনে আবদুল হাকাম, ইয়াকুত আল হামাবী প্রমুখ কেউই কখোনোই নিজেদের গ্রন্থে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেননি।

৬. মুসলমানদের মিসর বিজয়ের অব্যাবহিত পর তৎকালীন মিসরের দুইজন

www.maktabatulabrar.com

বিখ্যাত খৃষ্টান ঐতিহাসিক এলমাসিন ও ইউসটিসিয়াস যে ইতিহাস রচনা করেন তাতেও ঐ ঘটনার কোন উল্লেখ মাত্রও নেই। যদি মিসর বিজয়ের পর আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী জ্বালানোর মত ঘটনা ঘটে থাকত, তাহলে তারা তা উল্লেখ করে মুসলমানদের আহত করার সুযোগ নিশ্চয়ই হাতছাড়া করতেন না। বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট লেখক এম এন রায় (মানবেন্দ্র নাথ রায়) তাঁর "দি হিষ্টোরিক্যাল রোল অব ইসলাম" (অধ্যাপক আবুল হাই কর্তৃক ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান নামে বাংলায় অনুবাদিত, তৃতীয় সংস্করণ, ষ্টুডেন্ট ওয়েব, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৬৯) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন যে, মুসলমানদের আলেকজানদ্রিয়া গ্রন্থাগার জ্বালানোর কথিত ঘটনাটি ঘটেছিল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। অথচ তার প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায় চার পাঁচশো বছর পর একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী-তে খৃষ্টানদের রচিত কয়েকখানি গ্রন্থে। সেখানে ঘটনার যে ক্রুদ্ধ ও বিদ্বেষমূলক বিবরণ আছে তাতে নিরপেক্ষ পাঠকের মনে অতি সহজেই সন্দেহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মুসলমানদের মিসর বিজয়ের অব্যাবহিত পর তৎকালীন মিসরের দুইজন বিখ্যাত খৃষ্টান ঐতিহাসিক এলমাসিন ও ইউসটিসিয়াস যে ইতিহাস রচনা করেন সেখানে ঐ ঘটনার কোনও উল্লেখ মাত্রও নেই।

৭. হযরত ওমর (রা.)-এর আমলের পূর্বেই চারবার আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি যুদ্ধ আর অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়েছে। তারপরও কি খলিফা উমরের সময় আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি অবশিষ্ট ছিল? আর সেখানে এতগুলো বই ছিল যা জ্বালাতে ৬ মাস লেগেছিল? যে চারবার আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি যুদ্ধ আর অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়েছিল তার বর্ণনা পূর্বে পেশ করা হয়েছে।

৮. এভাবে চারবার ভয়াবহ আগুন লাগার পরও যদি আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে কোনো বই থেকেও থাকতো, তাহলে তো বাইজেন্টাইনরা মিসর ত্যাগ করার আগেই সেগুলো নিয়ে চলে যাওয়ার কথা।

৯. যদি হযরত ওমর (রা.) সত্যিই হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) কে নির্দেশ দিয়ে থাকতেন যে, 'সবগুলো বই ধ্বংস করে দাও', তাহলে তো আমর ইবনুল আস (রা.) সেই নির্দেশ পালনে মোটেও কালক্ষেপণ করতেন না, বরং সাথে সাথেই পুরো লাইব্রেরিতে আগুন লাগিয়ে দিতেন বা সব বই সাগরে ফেলে দিয়ে নষ্ট করে দিতে পারতেন। সেখানে তিনি কেন বইগুলো ধ্বংস করতে ছয় মাস লাগালেন?

১০. নন মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনাও উক্ত বর্ণনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। যেমন: নিম্নে ৩ জন নন মুসলিম ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি পেশ করা হল। (১) আমেরিকান ইতিহাসবিদ বার্নার্ড লুইস বলেন, The myth of the Arab destruction of the library of Alexandria is not supported by even a fabricated document। অর্থাৎ আরবদের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি ধ্বংসের কাহিনী একটি জাল দলিলপত্র দ্বারাও সমর্থিত হয় না। (Bernard Lewis, What Happened To The Ancient Library Of Alexandria,p. 215) (২) আলফ্রেড জে বাটলার বলেন, When one has deducted all the writings on vellum, how can it be seriously imagined that the remainder of the books would have kept the 4,000 bathfurnaces of Alexandria alive for 180 days ? The tale, as it stands, is ridiculous. অর্থাৎ বইগুলোর সংখ্যা এতবার হ্রাস পাওয়ার পরও কারো পক্ষে এটা কীভাবে ভাবা সম্ভব যে অবশিষ্ট বইগুলো ১৮০ দিন ধরে ৪০০০ স্নানাগারের চুলাকে জ্বালিয়ে রাখতে পারে? গল্পটি খুবই হাস্যকর দাঁড়ায়। (Alfred J. Butler, The Arab Conquest Of Egypt And The Last Thirty Years Of The Roman Dominion,p. 408) (৩) এডওয়ার্ড গিবন, যিনি তাঁর "দি ডিক্লাইন এন্ড ফল অব দি রোমান এমপায়ার" (মোসেস হাডাস সম্পাদিত ও ১৯৬২ সালে ফসেট ওয়ার্লড লাইব্রেরি, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ লন্ডন, ১৭৭৬) নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থে "মুহাম্মদ এক হাতে তরবারি এবং অপর হাতে কুরআন নিয়ে খৃষ্টধর্ম ও রোমের ধ্বংসস্তুপের উপর তাঁর সিংহাসন স্থাপন করেছিলেন বলে বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন", তিনিও কাহিনীটিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে রায় দিয়েছেন। ঐ একই গ্রন্থে তিনি বলেছেন, কাহিনী-টি আদৌ সত্য হতে পারে না। কারণ, ওমরের এই কঠিন দণ্ডাদেশ বিবেকবান আলেমদের বিশুদ্ধ সনাতন নীতিবাক্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

অতএব মুসলিম ও নন-মুসলিম সবগুলো সোর্স এবং নিরপেক্ষ যুক্তি ও বুদ্ধি-বিবেক একত্র করলে এটা সহজেই বুঝা যায় যে, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রে-রি ধ্বংসের জন্য হযরত ওমর (রা.) মোটেই দায়ী নন।

আলেকজান্দ্রিয়ার বর্তমান গ্রন্থাগার 'বিবলিওথেকা আলেকজান্দ্রিনা'

১৭/৪/১৯ বুধবার দুপুর ৩টায় আমরা আলেকজান্দ্রিয়ার নতুন গ্রন্থাগার দর্শনে গেলাম। প্রবেশ টিকেটের মূল্য ৭০ পাউন্ড। ধ্বংস হয়ে যাওয়া

আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন গ্রন্থাগারের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য ২০০২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মিসর সরকার জাতিসংঘের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করে এই আলেকজান্দ্রিয়া নতুন গ্রন্থাগার। প্রাচীন গ্রন্থাগার যেখানে ছিল তারই পাশে এটি নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালে আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়, সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির পুনর্নির্মাণ করা হবে এবং এজন্য তারা প্রাচীন লাইব্রেরিটির কাছাকাছি একটি স্থান নির্বাচন করেন। মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ইউনেস্কো এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে থাকে। এরপর ১৯৯৫ সালে লাইব্রেরিটির নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং এটি নির্মাণ করতে খরচ হয় ২২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আনুষ্ঠানিকভাবে লাইব্রেরিটি উদ্বোধন করা হয় ১৬ অক্টোবর, ২০০২ সালে। এর নাম দেয়া হয় 'বিবলিওথেকা আলেকজান্দ্রিনা' (Bibliotheca Alexandrina)। 'বিবলিওথেকা' শব্দটি গ্রন্থাদির সংকলন, গ্রন্থাদির তলিকা ও লাইব্রেরি (مكتبة) অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

'বিবলিওথেকা আলেকজান্দ্রিনা' ভূমধ্যসাগরের একেবারে পাড়ে অবস্থিত। বার থেকেই এর নয়নাভিরাম সৌন্দর্য দর্শকদের আকৃষ্ট করে। এটি সমুদ্রের দিক থেকে দেখলে মনে হবে একটি সূর্যঘড়ি। এর দেয়াল তৈরি করা হয়েছে ধূসর বর্ণের আসওয়ান গ্রানাইট দিয়ে, যার গায়ে খোদাই করা রয়েছে বিশ্বের বিদ্যমান কিংবা বিলুপ্তপ্রায় বহু ভাষার বর্ণমালা। বাংলা ভাষার বর্ণগুলে-াও রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার লোকেরা ওখানে খোঁজে দেখি তাদের ভাষার বর্ণমালা দেখতে পাওয়া যায় কি না। গ্রন্থাগারটির পাশেই রয়েছে একটি থিয়েটার ভবন, একটি ঐতিহাসিক যাদুঘর ও কনফারেন্স হল।

মূল গ্রন্থাগারের মধ্যে আছে ৮০ লাখ বই রাখার মতো শেলফের ব্যবস্থা। মূল পাঠকক্ষটি প্রায় ৭০ হাজার বর্গমিটারের, যা ১১টির মতো পিলারের ওপর অবস্থিত। মূল কমপ্লেক্সে একটি বিশাল কনফারেন্স সেন্টার, চারটি মিউজিয়াম, চারটি গ্যালারি, পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য ল্যাব আছে। মূল পাঠকক্ষের উপরে রয়েছে ৩২ মিটার দীর্ঘ কাচ দিয়ে ঘেরা ছাদ। ইন্টারনেট আর্কাইভে লাইব্রেরির পুস্তকাদি ও দলিলপত্রের অনুলিপি সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থাগার ভবনটি ১১ তলা বিশিষ্ট। এর ৪ তলা ভূগর্ভে আর ৭ তলা উপরে। সবগুলো তলা উপর-নিচ করে এমন প্রকৌশলী রীতিতে (গ্যালারি সিস্টেমে) তৈরি করা হয়েছে যে, উপর তলা থেকে নিচ তলা পর্যন্ত পুরোটাই এক নজরে দেখা যায়। প্রবেশ করেই শুরুতে দেখা যায় প্রাচীন যুগের নানান ধরনের মুদ্রণ যন্ত্র। শত শত নয় হাজারো বুক সেলফে সাজিয়ে রাখা বই-পত্র,

www.maktabatulabrar.com

যার অধিকাংশই আরবি ও ইংরেজি ভাষার। তবে ফরাশি, জার্মানী, ইটালী, স্প্যানিশসহ অন্য বিভিন্ন ভাষার বই-পুস্তকও রয়েছে। কিছু বিরল পুস্তকও সংগৃহীত হয়েছে। প্রতি স্তরের গ্যালারিতে বুক সেলফ ছাড়াও রয়েছে পর্যাপ্ত পড়ার টেবিল। প্রচুর সংখ্যক টেবিলে গবেষণা কিংবা অধ্যয়নপূর্বক নোট করার সুবিধার জন্য কম্পিউটারও রাখা আছে। তবে কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্য পাউন্ড গুণতে হয়।

আলেকজান্দ্রিয়ার বর্তমান গ্রন্থাগার 'বিবলিওথেকা আলেকজান্দ্রিনা'

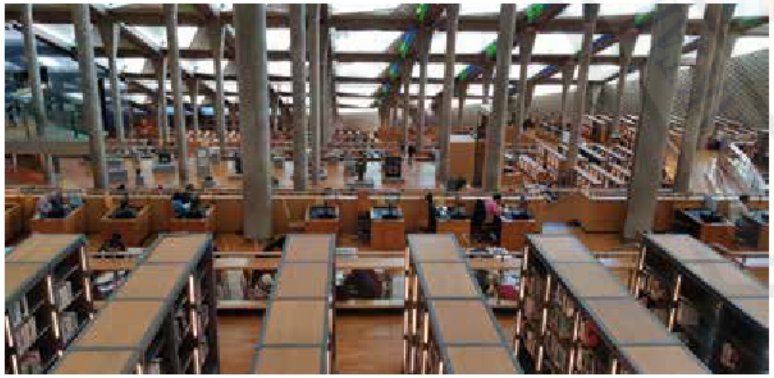

বিবলিওথেকা আলেকজান্দ্রিনা-এর ভিতরের দৃশ্য

কথিত দানিয়াল নবীর মসজিদ ও দানিয়াল নবীর কবর

আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার দর্শনের পর মসজিদুন্নবী দানিয়াল গমন করলাম। 'মসজিদুন্নবী দানিয়াল' বলাতেই এক টেক্সিওয়ালা আমাদেরকে

www.maktabatulabrar.com

'মসিজদুন্নবী দানিয়াল' লেখা এক মসজিদের সামনে গিয়ে নামাল। মসজিদটি আলেকজান্দ্রিয়া শহরের মাঝেই। মসজিদের মাঝখানে বাম দিকে একটা দর্জা দিয়ে বের হয়ে লাগোয়া একটা কাঠের ঘোরানো সিড়ি দিয়ে বেশ নিচে নেমে হযরত দানিয়াল আ.-এর কবর। পাশেই একটি কবর রয়েছে যাকে হযরত লুকমান হাকীমের কবর বলা হয়ে থাকে। মসজিদ থেকে বের হওয়ার এ দর্জাটি বন্ধ থাকে। দরজা খোলার জন্য খাদেমের খেদমত করতে হল। নিচের থেকে যিয়ারত সেরে উপরে এসে বের হওয়ার সময় দেখলাম খেদমত নেয়ার জন্য তিনি রীতিমত টিনের কৌটা হাতে নিয়ে দর্জা আলগে দাঁড়িয়ে আছেন।

এখানকার মসজিদকে আল্লাহর নবী দানিয়ালের মসজিদ ও উপরোক্ত কবরকে আল্লাহর নবী হযরত দানিয়াল (আ.)–এর কবর বলে যে পরিচিতি বা জনশ্রুতি রয়েছে তা ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত নয়। সহীহ রেওয়ায়েত থেকেও অনেকটা নিশ্চিতভাবে বুঝে আসে যে, হযরত দানিয়াল (আ.)-এর কবর এখানে নয় বরং ইরানের শূশ এলাকায়। নিচের আলোচনা পড়ুন।

মসজিদুন্নবী দানিয়াল

হযরত দানিয়াল (আ.) ও তাঁর প্রকৃত কবর

ইতিহাস ও সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতে হযরত দানিয়াল (আ.) ছিলেন বনী ইসরাঈলের নবী। তিনি বাবেল এলাকার নবী ছিলেন। তিনি ছিলেন

‘বুখতে নাস্‌সার’ (بختنصر/Nebuchadnezzar)-এর যুগে, যে বুখতে নাস্‌স-ার বায়তুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করেছিল, তাওরাতকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং বহু বনী ইসরাঈলকে হত্যা করেছিল এবং অনেক বনী ইসরাঈলকে বন্দি করে তার এলাকায় তথা বাবেলে (ব্যবিলনে) নিয়ে গিয়েছিল। এটা হল খ্রিস্টপূর্ব ৬০৫-এর ঘটনা। তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী বন্দিদের মধ্যে হযরত দানিয়া-লও ছিলেন। তিনি ছিলেন তখন যুবক। পরবর্তীতে বাবেলে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন।

হযরত দানিয়াল (আ.)-এর কবর কোথায় তা নিয়ে অনেক মত রয়েছে। যেমন:

১. তার কবর সমরকন্দে।
২. তার কবর ইরাকে।
৩. তার কবর ফিলিস্তীনে রমলা ও লুদ শহরের মাঝে।
৪. তার কবর আলেকজান্দ্রিয়ায়।
৫. তার কবর ইরানে শূশ এলাকায়।

হযরত দানিয়াল (আ.)-এর কবর কোথায়– এ সম্পর্কিত উপরোক্ত ৫টি মতের মধ্যে শেষোক্ত মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা একাধিক সহীহ রেওয়ায়াত দ্বারা পূর্ণ নিশ্চিতভাবে না হলেও প্রায় নিশ্চিতভাবে (অন্তত প্রবল ধারণার পর্যায়ে) জানা যায় যে, হযরত দানিয়াল (আ.)-এর কবর ‘তুছতার’ (تُستَر) -এর পাশে শূশ এলাকায়। তুছতার হচ্ছে ইরানের খুজিস্তান প্রদেশের আহওয়াজ (أهواز/Ahvaz) শহরের উত্তরে একটি শহর। তুছতারকে ফার্সিতে বলা হয় শুশতার (شوشتر/Shooshtar)। আর শূশ এলাকা আহওয়ায থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ১১৫ কিলোমিটার এবং শুশতার শহর থেকে পশ্চিমে ৮২ কিলোমিটার দূরে। শূশকে আরবিতে বলে সূস (سوس)।

নিম্নে দু’টো সহীহ রেওয়ায়েত উল্লেখ করছি, যা দ্বারা পূর্ণ নিশ্চিতভাবে না হলেও প্রায় নিশ্চিতভাবে (অন্তত প্রবল ধারণার পর্যায়ে) জানা যায় যে, হযরত দানিয়াল (আ.)-এর কবর ‘তুছতার’-এর পাশে শূশ (شوش/Shush) এলাকায়।

(١) عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُمْ لَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ ، قَالَ : وَجَدْنَا رَجُلاً أَنْفُهُ ذِرَاعٌ فِي التَّابُوتِ ، كَانُوا يَسْتَظْهِرُونَ ، أَوْ يَسْتَمْطِرُونَ بِهِ ، فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِذَلِكَ

www.maktabatulabrar.com

، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ هَذَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ ، وَالنَّارُ لاَ تَأْكُلُ الأَنْبِيَاءَ ، أَوْ الأَرْضُ لاَ تَأْكُلُ الأَنْبِيَاءَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ انْظُرْ أَنْتَ وَرَجُلٌ من أَصْحَابِكَ ، يَعْنِي أَصْحَابَ أَبِي مُوسَى ، فَادْفِنُوهُ فِي مَكَان لاَ يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرُكُمَا ، قَالَ : فَذَهَبْتُ أَنَا ، وَأَبُو مُوسَى فَدَفَنَّاهُ.

(رواه ابن أبي شيبة برقم ٣٤٥١١ . وقال ابن تيمية : إسناده صحيح.)

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) তুছতার বিজয় করা সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, আমরা যখন তুছতার বিজয় করলাম তখন একটি সিন্দুকে ভরা একজন মানুষ (-এর মরদেহ) পেলাম যার নাক এক হাত লম্বা (আরেকটি সহীহ রেওয়ায়েতের বর্ণনা মোতাবেক এক বিঘত লম্বা)। লোকেরা তার ওছীলা দিয়ে বিজয় প্রার্থনা করত কিংবা বৃষ্টির জন্য দুআ করত। তখন হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) এ ব্যাপারে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর কাছে লিখে পাঠান। ওমর (রা.) তার জবাবে লিখে পাঠান– ইনি কোন একজন নবী। আর আগুণ নবীদেরকে গ্রাস করতে পারে না কিংবা মাটি নবীদের (দেহ মোবারককে) গ্রাস করতে পারে না। ওমর (রা.) আবূ মূসা আশআরী (রা.)-এর নিকট আরও লিখে পাঠান– তুমি এবং তোমার সাথীদের মধ্যে একজন লক্ষ রেখো, তাকে এমন এক স্থানে দাফন করো যেন তোমরা দু’জন ব্যতীত আর কেউ তা জানতে না পারে। হযরত আনাস (রা.) বলেন, সেমতে আমি এবং আবূ মূসা গিয়ে তাকে দাফন করলাম। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হাদীছ নং ৩৪৫১১)

(2) عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ فَتْحَ تُسْتَرَ مَعَ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: فَأَصَبْنَا دَانْيَالَ بِالسُّوسِ ، قَالَ: فَكَانَ أَهْلُ السُّوسِ إِذَا أَسَنُّوا أَخْرَجُوهُ فَاسْتَسْقَوْا بِهِ ...(رواه ابن أبي شيبة برقم ٣٤٥١٠. وقال ابن تيمية : إسناده صحيح.)

অর্থাৎ, মুতাররিফ ইবনে মালিক বলেন, আমি (আবূ মূসা) আশআরীর সঙ্গে তুছতার বিজয়ের সময় ছিলাম। আমরা সূস (ফার্সিতে শূশ) এলাকায় দানিয়া-লকে পেয়েছিলাম। তিনি বলেন, সূস অধিবাসীরা দূর্ভিক্ষে পড়লে তার মরদেহ বের করে তার ওছীলায় বৃষ্টির জন্য দুআ করত।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত দু’টো রেওয়ায়েতের প্রথমটিতে তুছতার বিজয়ের সময় হযরত দানিয়ালের মোবারক মরদেহ পাওয়ার কথা এবং তাকে দাফন করার কথা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটিতে সেই মোবারক মরদেহ পাওয়ার স্থানটিও বর্ণিত হয়েছে। সে স্থানটি হল সূস, ফার্সিতে যাকে বলা হয় শূশ।

রয়ে গেল আলেকজান্দ্রিয়ায় যে কবরটি হযরত দানিয়াল (আ.)-এর দিকে সম্পৃক্ত সে সম্বন্ধে ফয়সালা। তো অনেক ঐতিহাসিকই এটা হযরত দানিয়াল নবীর কবর হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) আদ্দুরারুল কামিনা (الدرر الكامنة) গ্রন্থে বলেছেন,

الشيخ محمد دنيال الموصلي أحد شيوخ المذهب الشافعي قدم إلى الاسكندرية في نهاية القرن الثامن الهجرى واتخذ (مسجد الأسكندرية) كما كان يسمى حينئذ مكان لتدريس فيها اصول الدين وعلم الفرائض على نهج الشافعية حتى وفاته سنة ٨١٠ ه فدفن في المسجد وأصبح ضريحه مزارا للناس وبمرور الزمن اختلط الامر على العامة، فأصبح يطلق عليه مقام النبي دانيال.

অর্থাৎ, (ইনি দানিয়াল নবী নন বরং ইনি হলেন) আশ-শায়খ মুহাম্মাদ দানিয়াল আল-মাওসিলী (الشيخ محمد دنيال الموصلي)। তিনি শাফিয়ী মযহাব-এর একজন শায়েখ। তিনি হিজরী অষ্টম শতকের শেষ দিকে আলেকজান্দ্রিয়া আসেন এবং এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদে তিনি শাফিয়ী তরীকায় ইলমে ফারায়েয ও উসূলুদ্দীন-এর দরস প্রদান করতেন। ৮১০ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করলে এই মসজিদেই তাকে দাফন করা হয়। তার কবরটি মাযারে পরিণত হয়। আর কালক্রমে সাধারণ মানুষের কাছে দুই দানিয়াল (শায়খ দানিয়াল ও নবী দানিয়াল)-এর মধ্যে প্যাঁচ লেগে যায় এবং এটিকে নবী দানিয়ালের কবর বলা শুরু হয়।

কথিত দানিয়াল নবী ও লুকমান হাকীমের কবর (আলেকজান্দ্রিয়া)

হযরত লুকমান হাকীম ও তার কবর প্রসঙ্গ

হযরত লুকমান হাকীমের কথা কুরআনে কারীমের সূরা লুকমানে উল্লেখিত হয়েছে। তিনি হলেন লুকমান ইবনে বাউরা (لقمان بن باعوراء)। মনে

www.maktabatulabrar.com

করা হয় তিনি আল্লাহর নবী হযরত আউয়্যুব (আ.)-এর এক বোনের পুত্র (ভাগ্নে)। তিনি ছিলেন হযরত দাউদ (আ.)–এর সমসাময়িক। হযরত দাউদ (আ.) থেকে তিনি ইল্মও শিক্ষা করেছেন। তার জন্ম ও বসবাস ছিল নূবা/নূবিয়া এলাকায়। নূবা বা নূবিয়া (النوبة/Nubia) ছিল এক সময়ে দক্ষিণ মিসরের আসওয়ান ও সুদানের খার্তুম-এর মধ্যবর্তী এলাকার নাম। তাফসী-রের কিতাবের বর্ণনা মোতাবেক তিনি ছিলেন একজন গোলাম। কোনও কোনও বর্ণনা মোতাবেক তিনি ছিলেন কাঠমিস্ত্রী বা দর্জী কিংবা রাখাল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে হেকমত ও প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। ফলে তিনি অনেক মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিতে পরিণত হন। তার উপদেশ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা তাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছে। কুরআনে কারীমে সূরা লুকমানে তাঁর বেশ কিছু উপদেশ বাণী উল্লেখিত হয়েছে। মুসলমানদের নিকট তার উপদেশমালা অতি মূল্যবান বলে গণ্য। তার বহু উপদেশ বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে। তিনি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন। হযরত ইকরিমা (রহ.) তাকে নবী বললেও জুমহুরের মতে তিনি নবী ছিলেন না, বরং ছিলেন একজন ওলী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি।

হযরত লুকমান হাকীমের কবর কোথায় তা পূর্ণ নিশ্চয়তাসহকারে বলা যায় না। তবে আলেকজান্দ্রিয়ায় কথিত দানিয়াল নবীর কবরের পাশের যে কবরকে হযরত লুকমান হাকীমের কবর বলা হচ্ছে তা মোটেই কোন ঐতিহা-সিক দলীল দ্বারা সাব্যস্ত নয়। হযরত লুকমান হাকীমের কবর কোথায় তা নিয়ে অনেক মত থাকলেও এ জায়গার ব্যাপারে তেমন কোন মতও পাওয়া যায় না। সাধারণত হযরত লুকমান হাকীমের কবর কোথায় তা নিয়ে যেসব মত পাওয়া যায় সেগুলো হল:

১. তার কবর নূবা/নূবিয়া এলাকায়।
২. তার কবর ইয়ামানে।
৩. তার কবর তাবারিয়া হ্রদ বা গ্যালিলি সাগর (بحيرة طبريا/Sea of Galilee)-এর পূর্ব পাশে।
৪. তার কবর বেতেলহাম (بيت لحم)-এর সেই গর্তে যেখানে হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন, এটিই প্রসিদ্ধ মত।

৪. তার কবর হিযনাহ (حزنة/Heznah) গ্রামের আল-কুশাশ মহল্লায় (حي القشاش)। আল-বাহা বিশ্ববিদ্যালয় (جامعة الباحة)-এর প্রধান ডক্টর আহমদ ইবনে সায়ীদ কুশাশ আল-গামিদী বিভিন্ন কাহিনী ও ঘটনার ভিত্তিতে জোরালোভাবে এমতটিকে সমর্থন করেছেন। হিযনাহ হল সৌদি আরবের আল-বাহা প্রদেশের বালজুরাশি (بلجرشي/Baljurashi) মুহাফাজার অন্তর্গত একটি গ্রাম।

কথিত হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর কবর

তারপর আল-লাব্বান এলাকা (حي اللبان/El Labban)-এর আবুদ্দারদা সড়ক (شارع ابي الدرداء)-এর চৌরাস্তায় কথিত হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর কবর জিয়ারত করলাম। তার কবরের পাশে নাম না জানা আরও দুজন ব্যক্তির কবর রয়েছে। মাজারের দেখাশোনা করেন এমন এক ব্যক্তি জানালেন তারা দুজন হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এরই সঙ্গী ছিলেন।

আলেকজান্দ্রিয়ার লোকদের ধারণা হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর ওফাত আলেকজান্দ্রিয়াতেই হয়েছিল এবং এখানেই তাকে দাফন করা হয়। তাঁর মরদেহ এখানেই। এখানে কবরের সঙ্গে বড় আকারের একটি বোর্ডে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) সম্পর্কে যে বিবরণ ও পরিচিতি লেখা আছে তাতে রয়েছে وفاته : توفي في الإسكندرية بمصر سنة ٣٢ هجريا في خلافة عثمان بن عفان অর্থাৎ, ৩২ হিজরিতে হযরত উছমান ইবনে আফফান (রা.)-এর খেলাফত আমলে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়াতে তাঁর ওফাত হয়। কিন্তু নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের বর্ণনা মোতাবেক হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর ওফাত হয় সিরিয়ার দামেস্কে এবং দামেস্কেই তার কবর রয়েছে । পরবর্তী শিরোনামের লেখা পড়ুন।

কথিত আবুদ্দারদার মাজার (আলেকজান্দ্রিয়া)

হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

www.maktabatulabrar.com

হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর নাম উওয়াইমির (মতান্তরে আমির)। তার পিতা যায়দ ইবনে কায়স। তিনি খাযরাজ গোত্রের আনসারী সাহাবী। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় যে কয়জন সাহাবী পুরো কুরআন একত্র করেছিলেন হযরত আবুদ্দারদা (রা.) তাদের একজন। তিনি মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তার বীরত্বের কাহিনীও রয়েছে। হযরত আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে মিসর বিজয়ের প্রাক্কালে যখন নাবলিউন দূর্গ (حصن نابليون) দখল করা হয় তখন তার নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আবুদ্দারদা (রা.)। তারপর ২১ হিজরী মোতাবেক ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের অভিযানেও তিনি শরীক ছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় জানা যায় এখন আলেকজান্দ্রিয়ার যেখানে হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর কবর বলে পরিচয় দেয়া হচ্ছে এর পাশে তিনি ফেকাহ ও হাদীছের দরস প্রদান করেছেন। কিছুদিন পর তিনি ফুছতাত চলে যান। পরে হযরত মুআবিয়া (রা.) তাকে দামেস্কের কাজী তথা বিচারক নিয়োগ করেন। এটা ছিল হযরত উছমান (রা.)-এর খেলাফত আমলে যখন হযরত মুআবিয়া (রা.) শামের গভর্ণর ছিলেন।

ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর বর্ণনা মোতাবেক তিনি ৩২ হিজরীতে হযরত উছমান (রা.)-এর খেলাফত আমলে সিরিয়ার দামেস্কে ইন্তেকাল করেন। (৩১, ৩৩ ও ৩৪ হিজরিতে ইন্তেকালের মতও রয়েছে।) দামেস্কের দূর্গের সাথে লাগোয়া একটি মসজিদে (যেটি দূর্গেরই অংশ বলে গণ্য) তাঁকে দাফন করা হয়।

বস্তুত আলেকজান্দ্রিয়ার আবুদ্দারদা সড়কের চৌরাস্তায় যে আবুদ্দারদার কবর বলা হয় তা প্রকৃতপক্ষে সাহাবী হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর কবর নয় বরং তা আবুদ্দারদা নামক একজন সুফীর কবর। অনেকের মতে সূফী আবুদ্দারদার লাশ এখানে দাফন হয়নি বরং এখানে তার নামে একটি প্রতীকী কবর বানানো হয়েছে।

মসজিদে আবুল আব্বাস আল-মুরসী গমন

তারপর আলেকজান্দ্রিয়ার সর্ববৃহৎ মসজিদ মসজিদে আবুল আব্বাস আল-মুরসী (مسجد أبو العباس المرسي) গমন। মসজিদটি রা'সুত্তীন এলাকায় (حي رأس ا لتين)। এই মসজিদের সামনের ডান দিকের নিচে আন্ডারগ্রাউন্ডে আবুল আব্বাস ও তার দুই পুত্রের কবর রয়েছে। এই আবুল আব্বাস হচ্ছেন তাসাওউফের শাযিলিয়্যা তরীকার মূল ব্যক্তিত্ব ইমাম আবুল হাসান

আশ্-শাযিলীর খাস খলীফা। আবুল আব্বাস আল-মুরসীর মাধ্যমেই আলেকজান্দ্রিয়া এলাকায় শাযিলিয়্যা তরীকার বিস্তৃতি ঘটেছে। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত জীবনী পেশ করা হল।

মসজিদে আবুল আব্বাস আল-মুরসী

আবুল আব্বাস আল-মুরসী-র সংক্ষিপ্ত জীবনী

(৬১৬–৬৮৫হি.)

আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে উমার আল-খাযরাজী, আল-আনসারী। তার বংশ হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ আল-আনসারী (রা.)–এর সংগে মিলিত হয়। ৬১৬ হিজরি মোতাবেক ১২১৯ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের মুরসিয়া নামক একটি বড় শহরে তাঁর জন্ম হয়। এজন্য তাকে মুরসী বলা হয়।

আবুল আব্বাস মুরসী অল্প বয়সেই হেফজে কুরআন সম্পন্ন করেন। নিজ এলাকাতেই উসূলে ফিক্‌হ ইত্যাদি পড়াশোনা করেন। ৬৪০ হিজরিতে যখন আবুল আব্বাস মুরসীর বয়স ২৪ বছর, তিনি পিতার সঙ্গে হজ্জে রওয়ানা হন। তার ভাই এবং মাতাও একসঙ্গে ছিলেন। তারা আলজেরিয়ার পথে জাহাজে আরোহণ করেন। তিউনিসের কাছে এসে জাহাজটি ডুবে যায়। আবুল আব্বাস ও তার ভাই ব্যতীত জাহাজের সকলেই মারা যায়। তখন তারা দু'জন স্থলপথে তিউনিসে চলে যান। তিউনিসে গিয়ে তার ভাই ব্যবসা

www.maktabatulabrar.com

করতে থাকেন এবং তিনি মানুষকে কুরআন কিতাব ইত্যাদি শিক্ষা দেয়ার কাজে লিপ্ত থাকেন। তিউনিসে থাকাবস্থায় তিনি স্বপ্নে হযরত আবুল হাসান শাযিলীকে দেখেন এবং তার সুহবতে যাওয়ার ইংগিত পান। সেমতে তিনি তার সুহবতে গমন করেন। তারপর এক সময় তারা উভয়ে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় গমন করেন। সেখানে তারা দাওয়াত ও সুলূকের কাজ করতে থাকেন। আবুল আব্বাস আল-মুরসী তার শায়খ আবুল হাসান আশ-শাযিলী[১] থেকেই ফিকহ ও তাসাওউফ শিখেছেন এবং ফিকহ ও তাসাওউফের মাঝে সমন্বয় করে চলা শিখেছেন।

তিনি ৬৮৫ হিজরিতে আলেকজান্দ্রিয়ায় ইন্তেকাল করেন এবং তাকে রা'সুত্তীন এলাকায় দাফন করা হয়। পরবর্তীতে তার কবরের পাশে মসজিদে আবুল আব্বাস আল-মুরসী নির্মাণ করা হয়।

বূসীরীর মাজারে গমন

এই মসজিদে আবুল আব্বাসকে সামনে রেখে দাঁড়ালে বাম দিকে বূসিরী-র মাযার। উল্লেখ্য, বূসীরী নামক দু'জন মনীষী রয়েছেন। যথা:

বূসীরী ১: মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ ইবনে হাম্মাদ আল-বূসীরী। তার জন্ম ৬০৮ হিজরি মোতাবেক ১২১৩ খ্রিস্টাব্দ এবং ওফাত ৬৯৬ হিজরি মোতাবেক ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দ। তিনি শাযিলিয়্যা তরীকার তাসাওউফপন্থী ছিলেন। আবুল হাসান আশ-শাযিলীর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় একটি গ্রন্থ লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গ্রন্থটির নাম আল-কাওয়াকিবুদ্দুররিয়্যাহ ফী মাদ্‌হি খায়রিল বারিয়্যাহ (□□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□)। গ্রন্থটি 'ক্বাসীদাতুল ব ু র দ া হ '

১. এই আবুল আব্বাস আশ-শাযিলী হচ্ছেন তাসাওউফের শাযিলিয়্যা তরীকা (الطريقة الشاذلية)-এর মূল ব্যক্তিত্ব ইমাম আবুল হাসান আশ্‌-শাযিলী। তার জন্মসন ৫৭১ হিজরি। তিনি জীবনে দীর্ঘ সময় তিউনিসে ফিক্‌হ ও তাসাওউফ চর্চা করেন। পরে আলেকজান্দ্রিয়ায় চলে আসেন। সেখান থেকে ৬৫৬ হিজরিতে হজ্জে গমন কালে পথিমধ্যে মিসরের 'আল-বাহরুল আহমার' নামক মুহাফাজা (গভর্ণরেট)-এর ওয়াদি হুমাইছারাহ (ادي حميثرة□/Humaithara Town) নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। স্থানটি উপকূলীয় শহর মারসা আলাম (مرسى علم/Marsa Alam) থেকে দক্ষিণে ১৫০ কিলো-মটার দূরে। ওয়াদি হুমাইছারাতেই তার কবর ও তার নামে একটি মসজিদ (مسجد أبو الحسن الشاذلي) রয়েছে।

(قصيدة البردة) নামে প্রসিদ্ধ। এখানে আমরা যে মাজার সম্বন্ধে আলোচনা করছি এটি এই মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ ইবনে হাম্মাদ আল-বূসীরীর মাজার।

বূসীরী ২: শিহাবুদ্দীন আল-বূসীরী। তিনি মুহাদ্দিস হিসেবে খ্যাত। তিনি শাফিয়ী মাযহাব অনুসারী একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি হাফেজ ইবনে হাজার আল-আসকালানী ও আব্দুর রহীম আল-ইরাকী-র খাস শাগরেদ। তিনি স্বনামধন্য বেশ কিছু গ্রন্থের রচয়িতা। তার রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা নিম্নরূপ–

- فوائد المنتقى لزوائد البيهقي.
- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه.
- تحفة الحبيب للحبيب بالزوائد في الترغيب والترهيب.
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة.
- مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة.
- جزء في أحاديث الحجامة.
- رفع الشك باليقين في تبيين حال المختلطين.
- زوائد نوادر الأصول.

শিহাবুদ্দীন আল-বূসীরী কায়রোতে বাস করতেন। তার জন্ম ৭৬২ হিজরী এবং ওফাত ৮৩৯ হিজরী।

মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ আল-বূসীরী-এর মাজার

www.maktabatulabrar.com

হযরত হুসাইন রা.-এর পুত্র যাইনুল আবেদীনের আওলাদের কয়েকটি কবর

পূর্বে বলা হয়েছে মসজিদে আবুল আব্বাসকে সামনে রেখে দাঁড়ালে বাম দিকে বূসিরী-র মাজার। আর ডান দিকে একটি মসজিদ দেখা যায় যার মুখে বাম পাশে একটি ঘরের মধ্যে হযরত হুসাইন রা.-এর পুত্র যাইনুল আবেদীনের আওলাদের ১২টি কবর রয়েছে। ঘরটির চতুর্দিকে ঐ ১২ জনের নাম লেখা আছে। আওলাদে রসূলের কবর, জেয়ারত করতে মনে চাইল। বাইরে দাঁড়িয়েই যিয়ারত সেরে চলে আসতে চাইলাম। কিন্তু মাজারের তত্ত্বধায়ক ভেতরে যাওয়ার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করায় ভেতরে প্রবেশ করলাম। ভেতরে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি কেন তা শুরুতে বুঝে উঠতে পারিনি। যিয়ারত শেষে বের হওয়ার সময় তা বুঝতে পারলাম, যখন মাজারেরই একজন আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে কাঠের একটা বাক্সকে ঢোলের ন্যায় বাজাতে শুরু করল। শুধু বাজানো নয় সাথে নাচনও। সেই বাক্সে কিছু ছাড়ার পরই আমাদের বের হওয়ার পথ ছেড়ে দেয়া হল।

ভূমধ্যসাগরের পাড়ে কিছুক্ষণ

ভূমধ্যসাগর হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশ ও ইউরোপ মহাদেশের মাঝের একটি সাগর। চতুর্দিকে ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত তথা ভূমির মধ্যে অবস্থিত বিধায় তাকে বলা হয় ভূমধ্যসাগর। ভূমধ্যসাগরকে আরবিতে বলা হয় আল-বাহরুল মুতাওয়াস্সিত (البحر المتوسط) বা আল-বাহরুল আবইয়ায আল-মুতাওয়াস্সিত (البحر الأبيض المتوسط)। প্রাচীন যুগে আরবরা বলত বাহরুর রূম (بحر الروم) অথবা আল-বাহরুশ-শামী (البحر الشامي)। সাগরটির পরিমাপ ২,৫০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। সর্বোচ্চ গভীরতা ৫,২৫৭ মিটার। গড় গভীরতা ১,৫০০ মিটার। উপকূলের দৈর্ঘ ৪৬,০০০ কিলোমিটার। সাগরটির সঙ্গে আটলান্টিক মহাসাগরের সংযোগ হয়েছে জাবালে তারেক বা জিব্রালটার (جبل طارق/Gibraltar) প্রণালী দিয়ে। জাবালে তারেকের এই সংযোগস্থলে প্রস্থ মাত্র ১৪ কিলোমিটার।

কায়তবাই-এর দূর্গ দেখার পর কিছুক্ষণ ভূমধ্যসাগরের পাড়ে বসে কী আর দেখব বড় বড় ঢেউ কূলে আছড়ে পড়ার দৃশ্য দেখলাম। যতটুকু দূরে নজর যায় তাকিয়ে থাকলাম। সগরটির বিশালতা অনুভব করার চেষ্টা করলাম। কুদরতের মহিমা বুঝার চেষ্টা করলাম।

ভূমধ্যসাগর

আলেকজান্দ্রিয়ার আরও কিছু যা অনেকে দেখে থাকেন

আমরা আলেকজান্দ্রিয়ায় যা কিছু দেখলাম এর বাইরেও আরও কিছু ঐতিহাসিক জিনিস রয়েছে, যা অনেকে দেখে থাকেন কিন্তু আমরা তা দেখিনি অথবা বলা যায় আমাদের মধ্যে সেগুলো দেখার তেমন আগ্রহই হয়নি। আসলে আলেমদের দেখার চাহিদা আর গর-আলেমদের দেখার চাহিদায় তো ভিন্নতা রয়েছেই। তাই আলেমরা যা দেখতে আগ্রহী হন, গর-আলেমগণ সেগুলো দেখতে আগ্রহী হন না। আবার আলেমরা যা দেখতে আগ্রহী হন না গর-আলেমরা তা-ই দেখার জন্য পাগল। তেমন অ-দেখা কয়েকটি জিনিস হল–

- **গ্রেইকো-রোমান মিউজিয়াম (Graeco roman museum)**

এই মিউজিয়াম বা জাদুঘরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এতে বিভিন্ন দেশ এবং ঐতিহাসিক সাম্রাজ্য থেকে ব্যাপক মুদ্রার সংগ্রহ রাখা আছে। এগুলোর মধ্যে বেশ কিছু মুদ্রা খ্রিষ্টপূর্ব ৬৩০ শতকের প্রাচীন। এই মুদ্রাগুলো কালানুক্রমিক-ভাবে সাজানো রয়েছে। মুদ্রা ছাড়াও মিউজিয়ামটিতে প্রাচীন মূল্যবান কিছু সামগ্রীও রয়েছে। রয়েছে দু'টি মস্তিষ্কবিহীন স্ফিংক্স (গ্রীক পুরাণে উল্লিখিত নারীর মুখ ও সিংহের দেহবিশিষ্ট ডানাওয়ালা দানবি), মমি ইত্যাদি।

www.maktabatulabrar.com

গ্রেইকো-রোমান মিউজিয়াম

- **আমূদুস সিওয়ারী (عمود السواري)**

আমূদুস সিওয়ারীকে ইংরেজিতে বলা হয় Pompey's Pillar (পম্পেই-এর স্তম্ভ)। পম্পেই-এর স্তম্ভ হল একটি নিকষিত চাকচিক্যময় লাল গ্রানাইট পাথরের তৈরি স্তম্ভ। রোমানরা এটি সম্রাট ডিউক্লেটিয়ান (دقلديانوس/Diocletian)-এর স্মৃতিকে স্থায়ী করে রাখার জন্য বানিয়েছিল। এটি সেরাপিয়ম মন্দির (معبد السيرابيوم/Temple of Serapeum) ধ্বংসাবশেষ দ্বারা বেষ্টিত। ২৭ মিটার উচ্চতার সঙ্গে দু'টো স্ফিংক্স মূর্তির পাশে উপস্থাপিত রয়েছে। স্তম্ভটি সম্রাট ডিউক্লেটিয়ানের সম্মানে ২৯৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। সম্রাট ডিউক্লেটিয়ান, জুলিয়াস সীযার-এর হাতে পরাজয়ের পর মিসরে পালিয়ে যান। ৪৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল এবং কথিত রয়েছে যে তাঁর দেহাবশেষ এখানে সমাধিস্থ করা হয়।

পম্পেই-এর স্তম্ভ

- কূমুশ-শূকাফা-র কবরস্থান (مقابر كوم الشقافة)

ইংরেজিতে বলা হয় Catacombs of el Shoqafa। এটি হচ্ছে কূমুশ-শূকাফা (كوم الشقافة) এলাকায় অবস্থিত একটি রোমান সমাধি বা কবরস্থান। এটি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রাচীন বৃহৎ কবরস্থান।

কূমুশ-শূকাফা-এর কবরস্থান

- আলেকজান্দ্রিয়া জাতীয় জাদুঘর (متحف الإسكندرية القومي/ Alexandria Natoinal Meuseum)

এতে রয়েছে আলেকজান্দ্রিয়ার ইতিহাসে অতিবাহিত বহু যুগের ঐতিহাসিক নিদর্শনের ১৮০০ আইটেম। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২ অব্দে এটি নির্মাণ করা হয়। এটি তরীকুল হুর্‌রিয়া তথা আল-হুর্‌রিয়া সড়কে অবস্থিত।

আলেকজান্দ্রিয়া জাতীয় জাদুঘর

www.maktabatulabrar.com

- মাতাহাফু কাফাফীস (متحف كفافيس/ Cavafy Museum)

মাতাহাফু কাফাফীস বা ক্যাভাফি জাদুঘর। এটি গ্রীক কবি কনস্ট্যান্টিন কাফাফীস (মৃত ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ)-এর সংগ্রহসমৃদ্ধ একটি জাদুঘর।

ক্যাভাফি জাদুঘর

- রা'সুত্ তীন রাজ প্রাসাদ (قصر رأس التين/Ras el Tin Palace)

এটি ভূমধ্যসাগরের পাড়ে অবস্থিত। এটি মিসরে বিদ্যমান সর্বপ্রাচীন রাজপ্রাসাদগুলোর একটি। ১৮৪৭ সালে রাজপ্রাসাদটি উদ্বোধন করা হয়েছিল। এটি ছিল মুহাম্মাদ আলী পাশার যুগে চলমান প্রেসিডেন্টের একটি সরকারী বাসভবন।

রা'সুত্ তীন প্রাসাদ

• আলেকজান্দ্রিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রাচীন ইমারত ও ধ্বংসাবশেষ।

রোমান সাম্রাজ্যের একটি স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ

কায়তবাই-এর দুর্গ দর্শন শেষে ট্রেনযোগে কায়রো প্রত্যাবর্তন।

আল-ফাইয়ূমে যা কিছু দেখা হল

১৮/৪/১৯ বৃহস্পতিবার

দুপুর দেড়টায় আল-ফাইয়ূম রওয়ানা হলাম। উদ্দেশ্য বুহায়রা কারূন ও কসরে কারূন দর্শন করা। আল-ফাইয়ূম (الفيوم/Faiyum) হচ্ছে কায়রো থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে ১০০ কিলোমিটার দূরে ৬টি শহর বিশিষ্ট একটি মুহাফাজা। আল-ফাইয়ূম একটি গভর্নরশাসিত শহর আর মিসরের পরিভাষায় গভর্নরশাসিত কোন শহরকে বলা হয় মুহাফাজা (□□□□□□/Governo-rate)।

বুহায়রা কারূন দর্শন

আল-ফাইয়ূমে বুহায়রা কারূন বা (Qarun Lake/بحيرة قارون) বা কারূন লেক অবস্থিত। আরবিতে বলা হয় বুহায়রা কারূন (□□□□□ □□□□□) বা বিরকাতু কারূন (بركة قارون)। ইংরেজিতে বলা হয় Qarun Lake। বাংলায় বলা যায় কারূন হ্রদ। এটি একটি সুদীর্ঘ হ্রদ। মিসরের সবচেয়ে বড় হ্রদ। হ্রদটি আল-ফাইয়ূম (الفيوم/Faiyum) শহর থেকে ২৭ কিলোমিটার উত্তরে। আর পূর্বে বলা হয়েছে আল-ফাইয়ূম শহরটি কায়রো থেকে ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। হ্রদটির পরিমাপ ১,২৭০ থেকে ১,৭০০ বর্গ কিলোমিটার।

www.maktabatulabrar.com

কুরআনে কারীমে যে কারূনের কথা উল্লেখিত হয়েছে –যে ছিল হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সময় ফেরআউনের মন্ত্রী এবং কুরআনে কারীমের বর্ণনা মোতাবেক যে ছিল প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক, এত ধন-সম্পদের মালিক যে তার ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত তালাগুলোর চাবি বহন করতে শক্তিশালী একদল লোকও ক্লান্ত হয়ে পড়ত। সে অংহকার করেছিল এবং উদ্ধত হয়েছিল, আল্লাহর নাফরমানী ও জুলুম করেছিল। অবশেষে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাকে তার ধন-সম্পদসহ ভূমিতে ধ্বসিয়ে দিয়েছিলেন। এই বর্ণনা সম্বলিত কয়েকটি আয়াত নিম্নরূপ–

□نَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ.

অর্থাৎ, নিশ্চয় কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। অনন্তর সে তাদের সামনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল। আর আমি তাকে এ পরিমাণ ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম যে, তার চাবিগুলো একদল শক্তিশালী লোকের জন্য অবশ্যই গুরুভার হত। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, তুমি অতি উল্লসিত হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অতি উল্লাসীদের ভালবাসেন না। (সূরা ক্বাসাস: ৭৬)

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ.

অর্থাৎ, পরিণামে আমি তাকে (কারূনকে) ও তার বাড়িকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম। তখন তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যারা আল্লাহর মোকাবে-লায় তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সেও আত্মরক্ষায় সক্ষমদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না (সূরা ক্বাসাস: ৭৮)

অনেকের বিশ্বাস আয়াতসমূহে বর্ণিত কারূনকে এখানেই ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাকে ধ্বসানোর স্থানই হচ্ছে বুহায়রা কারূন বা কারূন হ্রদ। কিন্তু এই বিশ্বাসের পক্ষে কোন শক্তিশালী দলীল বা ঐতিহাসিক কোন জোরালো প্রমাণ নেই। এর বিপরীতে অনেকে বলেন, বুহায়রা কারূন একটি প্রাকৃতিক হ্রদ। প্রাকৃতিকভাবেই এটির সৃষ্টি। নীল নদের উপকূল ছেপে ওঠা পানির উচ্ছাসের ফলেই এই হ্রদের সৃষ্টি। ফারাওদের যুগেও এই হ্রদ তথা বুহায়রা কারূন ছিল। তখন তার নাম ছিল বুহায়রা বারূন, পরে বারূন শব্দের স্থলে কারূন শব্দের ব্যবহার হয়ে নাম হয়ে দাঁড়ায় বুহায়রা কারূন। এই বিবরণের পক্ষেও জোরালো কোন ঐতিহাসিক দলীল-প্রমাণ নেই। প্রকৃত বিষয় আল্লাহ তাআলাই ভাল অবগত আছেন। (والله أعلم بالصواب)

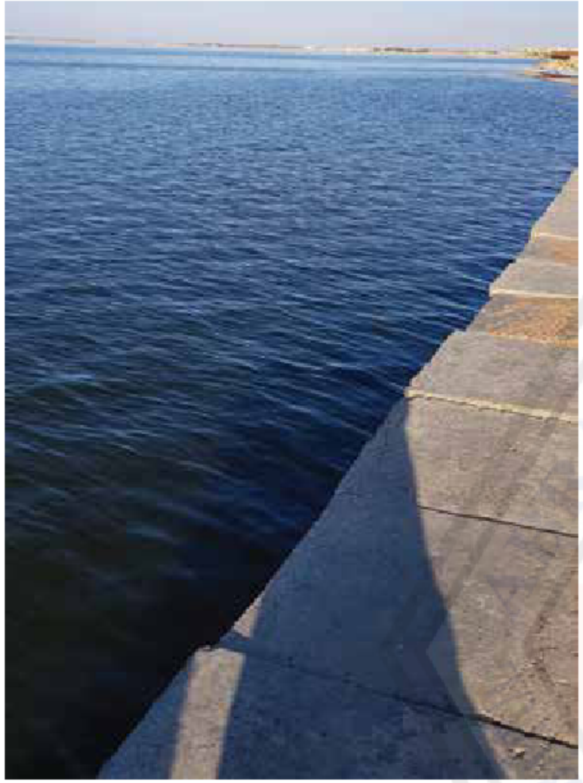

বুহায়রা কারূন

কসরে কারূন দর্শন

কাসরে কারূন (قصر قارون) অর্থ কারূনের প্রাসাদ। মিসরীয়দের উচ্চারণে 'আসরে আরূন'। এটি আল-ফাইয়ূম শহর থেকে ৬৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। এই প্রাসাদ থেকে বুহায়রা কারূন খুব বেশি দূরে নয়।

পূর্বের পরিচ্ছেদে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের যুগের কারূন সম্বন্ধে কিছুটা বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। সে ছিল বনী ইসরাঈলেরই লোক। কোন কোন বর্ণনামতে সে ছিল হযরত মূসা আলাইহিস সালামের চাচাতো ভাই। সে ছিল ফেরআউনের মন্ত্রী। বনী ইসরাঈলদের বিষয়ে দায়িত্ব ছিল তার। কুরআনে কারীমের বর্ণনা মোতাবেক সে ছিল প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক, এত ধন-সম্পদের মালিক যে তার ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত তালাগুলোর চাবি বহন করতে শক্তিশালী একদল লোকও ক্লান্ত হয়ে পড়ত। সে অংহকার করেছিল এবং উদ্ধত হয়েছিল, আল্লাহর নাফরমানী ও জুলুম

www.maktabatulabrar.com

করেছিল। অবশেষে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাকে তার ধন-সম্পদসহ ভূমিতে ধ্বসিয়ে দিয়েছিলেন।

এখন কারও কারও বিশ্বাস উপরোল্লিখিত কাসরে কারূন তথা কারূনের প্রাসাদ সেই কারূনেরই একটি প্রাসাদ। তার সমুদয় ধন-সম্পত্তি ও ঘর-বাড়িসহ তাকে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছিল কিন্তু হয়তো এই একটি প্রাসাদ মানুষের শিক্ষার জন্য অবশিষ্ট রাখা হয়েছিল। তবে এই বিশ্বাসের পক্ষে দলীল-প্রমাণ অনুপস্থিত। অপরদিকে কেউ কেউ বলেন, এটা প্রকৃতপক্ষে টলেমী নির্মিত একটি মা'বাদ (معبد بطليموس) তথা উপাশনালয়। একে 'কসরে কারূন' তথা কারূনের প্রাসাদ নাম দেয়া ভুল।

যাহোক কাসরে কারূন দেখতে এসেছি। প্রকৃত বিষয় যা-ই হোক একটা ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে অন্তত দেখে যাই। তা দূরে দেখে দেখব না কি ভিতরে ঢুকে কাছে গিয়ে দেখব? গেটে গিয়ে জানলাম ভিতরে প্রবেশের জন্য ৬০ পাউন্ড গুণতে হয়। ভাবলাম যদি বাস্তবিকই এটা সেই অভিশপ্ত কারূনের প্রাসাদ হয়ে থাকে, তাহলে তো নিঃসন্দেহে এটা বরকতহীন জায়গা। এমন বেবরকতী জায়গায় ঢুকব? তাও আবার এতগুলো পয়সার শ্রাদ্ধ করে! বিষয়টা নিয়ে খানিকটা খটকার মধ্যে পড়লাম। অবশেষে বিষয়টা সন্দেহপূর্ণ তাই ভেবে, আবার কখনও এ বিষয়ে লিখতে চাইলে সুবিধে হবে চিন্তা করে ঢোকারই সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা ভেতরে ঢুকলাম। অফিসিয়াল একজন লোক গাইড হিসেবে আমাদের সঙ্গী হলেন।

প্রাসাদটা ৩ তলা বিশিষ্ট। তার মধ্যে মূর্তী পূঁজার জন্য ভিন্ন ঘর, খাওয়ার জন্য ভিন্ন ঘর এবং সিন্দুক হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিশেষ স্টাইলের স্পেস রয়েছে। নিচ তলায় কারূনের সিংহাসনের স্থানের দুই পাশে গভীর অন্ধকার সুড়ং দেখা যায়, বলা হয় এটি হল বিপদের মুহূর্তে প্রাসাদ ত্যাগ করে শহরে বের হয়ে পড়ার গোপন রাস্তা। এ ছাড়াও যে কত ধরনের কক্ষ, সিড়ি ও সুড়ং রয়েছে তা রীতিমত মাথা ঘুলিয়ে দেয়। এত কঠিনভাবে পাথর দিয়ে নির্মিত যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এখনও অনেক মানুষ একসঙ্গে সিড়ি বেয়ে ছাদ পর্যন্ত ওঠা যায়। প্রাসাদের আশপাশে বেশ কিছু জায়গা জুড়ে আরও ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। আমাদের সঙ্গে গাইড হিসেবে থাকা অফিসিয়াল লোকটি এক সাইডের কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখিয়ে জানাল সেগুলো রোমান সাম্রাজ্যের নিদর্শন।

কসরে কারূন

কসরে কারূনের অভ্যন্তর

www.maktabatulabrar.com

ক্বারইয়াতু ইউসুফ প্রসঙ্গ

বুহায়রা কারূন থেকে কসরে কারূন যাওয়ার পথে ক্বারইয়াতু ইউসুফ আস-সিদ্দীক (قرية يوسف الصديق) তথা ইউসুফ সিদ্দীকের নগরী নামে একটি নগরীর সাইনবোর্ড ও তীরচিহ্ন দেখা যায়। নগরীটি বুহায়রা কারূন এলাকার পাশেই। আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আ.) কে ইউসুফ আস-সিদ্দীক বলা হত। তাই ক্বারইয়াতু ইউসুফ আস-সিদ্দীক তথা ইউসুফ সিদ্দীকের নগরী নাম দেখে অনেকেই মনে করে এই নগরী হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নগরী, নিশ্চয়ই এখানে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিদর্শনাবলি পাওয়া যাবে। বস্তুত তা নয়। মিসরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বসবাস কোথায় ছিল ঐতিহাসিক-গণ তা পূর্ণাঙ্গ নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। যে কয়েকটি স্থানের কথা তারা বলেছেন তার মধ্যে এই ক্বারইয়াতু ইউসুফ অন্তর্ভুক্ত নয়।

হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরের কোথায় বাস করতেন?

হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরের কোন এলাকায় বসবাস করতেন সে বিষয়ে আগের যুগের মুফাসসিরীন ও ঐতিহাসিকগণ তেমন কিছু উল্লেখ করে যাননি। আধুনিক ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ সে বিষয়টি উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন। এ পর্যন্ত আধুনিক ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ সে ব্যাপারে যতদূর পৌঁছেছেন তাতে বিষয়টা এখনও অবিসংবাদিত হয়নি। অর্থাৎ, এ বিষয়ে তাদের মধ্যে প্রচুর মতবিরোধ রয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের বিশেষ কয়েকটি মত নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. তিনি আল-ফাইয়ুমের 'কোম্ ওসিম' (كوم اوشيم/Kom Oshim) এলাকায় বসবাস করতেন। কোম ওসিম আল-ফাইয়ুম এলাকার উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত।

২. তিনি উকসুর (الأقصر) এলাকায় বসবাস করতেন। উকসুরকে লুকসুর (لقصر/Luxor)ও বলা হয়। এর প্রাচীন নাম ছিল তাইবা (طيبة)। লুকসুর বা উকসুর মিসরের দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি গভর্ণরশাসিত এলাকা (মুহাফ-জা)। এটি ফারাওদের আমলে এক সময় রাজধানী ছিল। লুকসুরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সময়কার শাসক আখেনাতুন (أخناتون/Ak-henaten) বা এখেনাতুন-এর অবস্থানস্থল চিহ্নিত রয়েছে।

৩. তিনি আসওয়ান (أسوان/Aswan)-এর ইদফু (ادفو/Edfu) অঞ্চলে বসবাস করতেন। ইদফু অঞ্চলটি আসওয়ান কেন্দ্রীয় শহর ও ইছনা (اسنا/Esna)-র মধ্যবর্তী নীল নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই ইদফু অঞ্চলের কাছে ইটের তৈরি কিছু স্থাপনা এখনও রয়েছে, যেগুলোর

ব্যাপারে প্রসিদ্ধ যে, দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ইউসুফ (আ.) এখানেই খাদ্যশস্য মজুদ রেখেছিলেন।

৪. তিনি মিসরের আশ-শারকিয়্যাহ গভর্ণরেট (محافظة الشرقية/Ash Sharqia Governorate) ও আল-ইসমাঈলিয়্যাহ গভর্ণরেট (محافظة الإسماعيلية/Al Ismailia Governorate)-এর মধ্যবর্তী জুশান (جوشن) বা জাসান (جاسان) ভূখণ্ডে বসবাস করতেন, যার বর্তমান নাম ওয়াদি তুমীলাত (وادي الطميلات/Wadi tumilat)। ওয়াদি তুমীলাত আশ-শারকিয়্যাহ গভর্ণরেটের যাগাযীগ (الزقازيق/Zagazig) অঞ্চলের পূর্ব থেকে আল-ইসমাঈলিয়্যাহ গভর্ণরেটের পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত একটি কৃষিবহুল অঞ্চল। আশ-শারকিয়্যাহ গভর্ণরেট কায়রো থেকে উত্তর-পূর্বে আর আল-ইসমাঈলিয়্যাহ গভর্ণরেট আশ-শারকিয়্যাহ গভর্ণরেটের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত।

৫. তিনি স্থায়ীভাবে নয় কিছুদিন আউন (أون/Iwnw) এলাকায় ছিলেন এবং সেটা আযীযে মিসর কিংবা যুলাইখার বাড়িও ছিল না। এখানে তিনি কিছুদিন শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেছেন। এখানে থাকা অবস্থায় তার নিকট ওহী আসে এবং তিনি নবুয়ত লাভ করেন। এখানে থাকা অবস্থায় তিনি আউন এলাকার বড় গণক কুতীফীর (قوطيفير)-এর কন্যা আসেনাত (أسنات/Asenath)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং মানসিয়া (منسيا) ও আফরাঈম (أفرايم) নামক তার দুই পুত্রের জন্ম হয়। (তাওরাতে এই বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়।) আউন এলাকা মিসরের একটি প্রাচীন এলাকা। এটি মাটির নিচে চাপা পড়েছে। কায়রো থেকে উত্তর-পূর্বে এবং আল-মার্জ (المرج/Al Marj) এলাকা থেকে দক্ষিণে আইন শামস (عين شمس/Ain Shams) এলাকার শহরতলিতে এবং আল-মাতারিয়্যা (المطرية/Al Matariyyah) পাহাড়সমূহের মাঝে ছিল আউন-এর অবস্থান। এটি বৃহত্তর কায়রোর অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় এর নাম ছিল হেলিওপলিস (هيليوبوليس/Heliopolis)। তার বর্তমান নাম আরব আল-হিস্ন (عرب الحصن) বা তাল্লুল হিস্ন (تل الحصن)। কায়রোর তাহরীর স্কয়ার থেকে গাড়ি যোগে এখানে যেতে সময় লাগে আধা ঘন্টা।

৬. তিনি বের-র‍্যামেসিস বা পি র‍্যামেসিস (بر رمسيس/Pi Ramesses) এলাকায় বসবাস করতেন। বের-র‍্যামেসিস বা পি র‍্যামেসিস আশ-শার-

www.maktabatulabrar.com

কিয়্যাহ গভর্ণরেট (محافظة الشرقية/Ash Sharqia Governorate)-এর একটি এলাকা। এটি কানতীর (قنتير/Qantir) এলাকা লাগোয়া দক্ষিণ পাশে।

সিনাই এলাকায় যা কিছু দেখা হল

২০/৪/২০১৯ শনিবার

তূরে সাইনা গমন

সকাল ৯টায় তূরে সাইনার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হলাম। এখানে তূর ও সাইনার কিছুটা পরিচয় পেশ করছি। প্রথমে সিনাই-এর পরিচয় তারপর তূর-এর পরিচয় দেয়া হচ্ছে।

সিনাই: সিনাই মিসরের উত্তর-পূর্বের একটি উপদ্বীপ। বাংলা ও ইংরেজিতে বলা হয় সিনাই আর আরবিতে বলা হয় সাইনা' (سَيناء/Sinai)। এই উপদ্বীপের উত্তরে ভূমধ্য সাগর, দক্ষিণে লোহিত সাগর, পূর্বে ফিলিস্তীনের গাযযা ও আকাবা উপসাগর এবং পশ্চিমে সুয়েজ উপসাগর ও সুয়েজ খাল। এক সময় সিনাই জনবসতীহীন মরু অঞ্চল থাকলেও বর্তমানে (২০১৯ সালে) সিনাই এলাকায় ২৪ লক্ষ লোকের বসবাস রয়েছে। এবং গোটা সিনাই এলাকা প্রশাসনিকভাবে কয়েক প্রদেশে বিভক্ত।

তূর: তূর (طور/El-tur) হচ্ছে দক্ষিণ সিনাই গভর্ণরেটের (محافظة جنوب سيناء)-এর রাজধানী। ঐতিহাসিক তূর পাহাড়ের নামে এর নামকরণ হয়ে থাকবে। এ শহরটি সুয়েজ খাল থেকে ২৭৫ কিলোমিটার এবং 'শারম আশ-শায়খ' (شرم الشيخ) থেকে উত্তর-পশ্চিমে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই শহরের কেন্দ্র থেকে উত্তর-পূর্বে ঐতিহাসিক তূর পাহাড় অবস্থিত। শহরের কেন্দ্র থেকে খুব দূরে না হলেও গাড়ি পথে অনেক ঘুরে যেতে হয় বলে দূরত্ব হয় ১৬৫ কিলোমিটার। সোজা পথ হলে আনুমানিক ৫০/৫৫ কিলোমিটার দূরত্ব হত। পাহাড়টিকে জাবালে মূসা (ঔধনধষ সড়ঁংধ)ও বলা হয়। পাহাড়টি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২২৯০ মিটার উঁচু।

উল্লেখ্য, কুরআনে কারীমে তূরে সাইনা'-এর পাশাপাশি 'তূরে সীনীন' শব্দেরও উল্লেখ এসেছে (وطور سينين)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কা'ব আহবার প্রমুখের মতে সিনাই আর সীনীন এক কথা। অতএব তূরে সীনীন দ্বারা জাবালে মূসাই উদ্দেশ্য। হযরত ইকরিমা বলেছেন, 'তূরে সীনীন'-এর 'তূর' দ্বারা পাহাড়ই উদ্দেশ্য, আর সীনীন অর্থ সুন্দর। কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদের মতে তূরে সীনীন দ্বারা মসজিদে মূসা উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, 'মসজিদে

মূসা' (قرية مسجد موسي/Moussa village mosque) মিসরের একটি নগরী, যা আল-জীযা গভর্ণরেটের অন্তর্গত, নীল নদের পূর্ব তীরে অবস্থিত।

তূরে সাইনার সফরসঙ্গী কে হবে তা নিয়ে একটু ঝামেলায়ই পড়লাম। আমার ছাত্রদের মধ্যে যাত্রাবাড়ি মাদরাসায় পড়া ওমর ফারূক, মাহমূদ মিল্‌কী, জাহিদ, ফরীদ আহমদ– ওদের সকলেরই এক দু'দিন পর পরীক্ষা। ওরা আন্তরিকভাবে গাইড হিসেবে আমার সাথে যাওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেউ যেতে পারল না। আমিই তাদেরকে পরীক্ষার পড়া বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে যেতে বারণ করলাম। ঢাকার ঢালকা নগর মাদ্রাসা থেকে ফারেগ হওয়া কুমিল্লা সদর দক্ষিণের ইকবাল হোসাইন নামক একজন আযহারের ফিকহে মুকারন বিভাগের মাস্টার্স ২য় বর্ষের ছাত্র –যে একবার ২০১২ সালে জামেয়া ইসলামিয়া তাঁতীবাজার মাদরাসায় আমার ভূগোল ও মানচিত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিল সে– আমার সঙ্গে যাওয়ায় আগ্রহী থাকায় এবং তার এখন কোন পরীক্ষা না থাকায় তাকে সঙ্গে নিয়েই রওয়ানা দিলাম। ১ঃ ৪০ মিনিটে কায়রো তরজমান নামক স্টেশন থেকে বাস রওয়ানা দিল। বাসকে মিসরে বলা হয় উতুবিস (أتوبيس)। আমরা উতুবিসে তূরে সাইনা রওয়ানা দিলাম। আরবি উতুবিস আর বাংলা বাস– চড়তে দুটোতেই মজা সমান। নামে ফারাক থাকলেও চড়ার স্বাদ-মজায় কোন ফারাক নেই। তবুও উতুবিসে চড়লাম বলেছি একারণে যে, চড়ার মজায় পার্থক্য না থাকলেও বলার মজায় তো পার্থক্য রয়েছেই। নিজস্ব ছোট গাড়িতে চলাচল করি বলার চেয়ে প্রাইভেট কারে চলাফেরা করি বলার মধ্যে কিন্তু মজা ও ইমেজের পার্থক্য রয়েছে। গিন্নীর ভাইকে ব্রাদার-ইন-ল বললে বেশ ভালই মজা ও ইমেজ বোধ হয়, শ্যালক বললে সেই মজা ইমেজ অনুপস্থিত হয়ে যায়, আর শালা বললে তো একেবারেই মাটি হয়ে যায়।

সোজা পথে নিরাপত্তা না থাকায় বহু ঘোরা পথে তূরে সাইনা যেতে হবে। তাই সুয়েজ শহরের প্রায় ১৯ কিলোমিটার উত্তর দিকে সংযোগ খালের তলের পাতাল পথ তথা টানেল দিয়ে পার হয়ে সিনাই এলাকায় প্রবেশ করলাম। এই টানেলটির নাম শহীদ আহমেদ হামদী টানেল (نفق الشهيد أحمد حمدي)। এই টানেলটি সুয়েজ এলাকা ও সিনাই এলাকার মাঝে সংযোগ সাধন করেছে। সিনাই এলাকায় প্রবেশ করার পর সুয়েজ উপসাগরের পাড়ের পথ দিয়ে রা'স সিদ্‌র (رأس سدر/Ras Sedr) হয়ে, রা'স মাতারমা (رأس مطارمة/Ras Matarma) হয়ে, আবূ যেনীমা (أبو زنيمة/Abu Zenima) হয়ে, রা'স আবূ রুদীস (Ras Abu Rudeis/رأس أبو رديس) পর্যন্ত গাড়ি পৌঁছল। আবূ রুদীস থেকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে পূর্ব দিকে একটা সড়ক গিয়েছে। এ সড়ক দিয়ে তূর পর্বত নিকটে। এ পথে তূর যেতে পারলে কায়রো থেকে তূর পর্বত পর্যন্ত দূরত্ব হত ৪৩০ কিলোমিটার। কিন্তু পথটি নিরাপদ নয়। পাহাড়ী দস্যু দ্বারা পর্যটকরা আক্রান্ত হয়। তাই মিসর সরকার এ পথে পর্যটকদের গমনাগমন বন্ধ করে দিয়েছে বিধায় আমাদেরকে আরও দক্ষিণ দিকের পথ হয়ে শারমুশ শেখ (شرم الشيخ/Sharm El-Sheikh) হয়ে তূর পর্বতের পূর্ব দিকে আকাবা উপসাগরের তীরবর্তী দাহাব (دهب/Dahab) শহরে যেতে হল। এভাবে প্রায় ২০০ কিলোমিটার পথ বেশি পাড়ি দিতে হল। শারম আশ শায়খ দিয়ে একটা রাস্তা সোজা উত্তর দিকে তূরে গিয়েছে। এ পথেও অনেকে তূর গমন করে থাকে, কিন্তু আমরা যে হোটেলের মাধ্যমে তূর গমনের প্যাকেজ নিয়েছিলাম সেটি দাহাব এলাকায় হওয়ায় আমাদেরকে দাহাব যেতে হল। শারমুশ শায়খ থেকে সোজা উত্তরের পথ দিয়ে তূর পর্বত যেতে পারলে কায়রো থেকে দূরত্ব হত ৭৪০ কিলোমিটার।

www.maktabatulabrar.com

মাজমাউল বাহরাইন

শারমুশ শেখ গিয়ে মনে হল এখানেই অনতিদূরে মাজমাউল বাহরাইন। মাজমাউল বাইরাইন অর্থ দুই সাগরের সংগমস্থল। এই মাজমাউল বাহরাইন তথা দুই সাগরের সংগমস্থলে হযরত মূসা (আ.) ও খিযির (আ.)-এর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কুরআনে কারীমে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। স্থানটি কোথায় তা নিয়ে অনেক মত রয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি মত নিম্নরূপ:

১. অধিকাংশ তাফসীরের কিতাবে প্রাচীন মুফাসসিরগণের উক্তি এই বর্ণিত হয়েছে যে, মাজমাউল বাহরাইন তথা দুই সাগরের সংগমস্থল বলে পারস্য উপসাগর (بحر فارس) ও রূম সাগর (بحر الروم) তথা ভূমধ্য সাগর-এর সংগমস্থলকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এই সংগম কোথায় কীভাবে হয়েছে তা বোধগম্য নয়। উল্লেখ্য, আরবিতে ভূমধ্য সাগরকে রূম সাগর (بحر الروم)ও বলা হয়। আবার البحر الأبيض المتوسط ও বলা হয়।

২. একমতে মাজমাউল বাইরাইন তথা দুই সাগরের সংগমস্থল বলে ইরাকের দক্ষিণ-পূর্বে ফুরাত নদী ও পারস্য উপসাগরের সংগমস্থলকে বুঝানো হয়েছে। এমতটিও দু'টো কারণে সঠিক নয়। (এক) কেননা,

এখানে নদী ও সাগরের সংগম হয়েছে, অথচ মাজমাউল বাহরাইন অর্থ দুই সাগরের সংগমস্থল। (দুই) হাদীছের বর্ণনা (বর্ণনা পরে উল্লেখ করা হচ্ছে) থেকে বুঝা যায় এক রাত ও ১ দিনের দূরত্ব অতিক্রম করার আগেই ছিল মাজমাউল বাহরাইন। আর সেখানেই হযরত খিযর (আ.)-এর সঙ্গে হযরত মূসা (আ.)-এর সাক্ষাত হয়। আর হযরত মূসা (আ.) রওনা দিয়েছিলেন সিনাই এলাকা থেকে। তাহলে সাক্ষাতের স্থান ফুরাত নদী ও পারস্য উপসাগরের সংগমস্থল কীভাবে হতে পারে? সীনাই এলাকা থেকে ফুরাত নদী ও পারস্য উপসাগরের সংগমস্থল পর্যন্ত দুই হাজার কিলোমিটারের উপরে দূরত্ব, এক রাত এক দিনে কি এত পথ অতিক্রম করা যায়? পূর্বে উল্লেখিত হাদীছের বর্ণনা লক্ষ করুন। বোখারী শরীফে ৪৭২৪ নং হাদীছে উল্লেখ হয়েছে,

فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا . قَالَ وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَا الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ ... فَقَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا قَالَ رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ.

অর্থাৎ, তারা উভয়ে (পাথরের চাঁইয়ের কাছে বিশ্রাম নেয়ার পর) তাদের এক রাত ও এক দিনের অবশিষ্টটুকু সামনে অগ্রসর হল। পরবর্তী দিন সকালে মূসা তার যুবক খাদেমকে বলল, নাস্তা আন, এই সফরে আমরা বেশ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি। ... খাদেম বলল, আচ্ছা দেখুন তো ঐ বিরাট প্রস্তরখণ্ডের কাছে যখন বিশ্রাম নিয়েছিলাম, তখন মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে রাস্তা করে নিয়ে তা দিয়ে চলে যায়, কিন্তু আমি আপনাকে তা বলতে ভুলে যাই। শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। তখন মূসা বলল, আমরা তো ঐ স্থানটিরই তালাশে ছিলাম। অতঃপর তারা উভয়ে তাদের পায়ের নিশানা অনুসরণ করে উল্টো দিকে ফিরে গেল। অবশেষে সেই পাথরটির নিকট পৌঁছে গেল। (সেখানেই খিযরের সাক্ষাৎ পেল।) এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যেখানে তারা খিযরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন সেটা এক রাত ও এক দিনের চেয়ে কম দূরত্বের পথ ছিল। অতএব সিনাই থেকে ১ রাত ও ১ দিনের দূরত্ব অতিক্রম করার আগেই ছিল মাজমাউল বাহরাইন। তাহলে দাজলা ফুরাত ও পারস্য উপসাগরের সংগমস্থল যা দুই হাজার কিলোমিটারের চেয়ে দূরত্বে তা

www.maktabatulabrar.com

কীকরে মাজমাউল বাহরাইন হতে পারে? এক রাত ও এক দিনে কি দুই হাজার কিলোমিটারের চেয়ে বেশি পথ অতিক্রম করা যায়? যদি কেউ বলেন, হতে পারে সাধারণভাবে পায়ে হেঁটে নয় বরং অলৌকিকভাবে তারা অল্প সময়ে সেখানে পৌঁছেছিলেন, তাহলে বলব, সেটা কুরআন বিরোধী বক্তব্য। কেননা কুরআনে উল্লেখ আছে- মূসা (আ.) বলেছিলেন, لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا অর্থাৎ, এই সফরে আমরা বেশ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি। আর স্বাভাবিক-ভাবে পায়ে হেঁটে গেলেই তো কষ্ট হতে পারে, অলৌকিকভাবে গেলে তো কষ্টের সম্মুখীন হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তারা যখন কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন, বুঝা গেল যাওয়াটা স্বাভাবিকভাবে হেঁটেই সম্পন্ন হয়েছিল।

৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর মতে আইলা বা বর্তমান আকাবাই হল সেই স্থান। তাহলে মেনে নিতে হবে অতীতে আকাবার সংগে ভূমধ্য সাগরের কোন সংযোগ ছিল। নতুবা 'দুই সাগরের সংগমস্থল' কথাটি প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু অতীতে কখনও এমন সংযোগ থাকার বিষয়টা পরিজ্ঞাত নয়। আর বর্তমানে তো নেইই।

৪. বিংশ শতাব্দির মাঝের দিকে মিসরের সিনাই এলাকার ঐতিহাসিক বিষয়াদি অনুসন্ধান, গবেষণা ও প্রচারের লক্ষে গঠিত সংস্থা (البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء)-এর প্রধান ডক্টর আব্দুর রহীম রাইহান (الدكتور عبد الرحيم ريحان) তার সংস্থার অনুসন্ধান ও গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কথা বলেছেন যে, সিনাই এলাকার দক্ষিণে রা'সু মুহাম্মাদ (رأس محمد) নামক এলাকার পাশে 'শার্ম আশ-শায়েখ' (Sharm El Sheikh/شرم الشيخ) নামক শহর অবস্থিত। এ শহরটি সিনাইয়ের দক্ষিণে লোহিত সাগরের কূলে অবস্থিত। এই শহরেরই সমুদ্র উপকূলে সুয়েজ উপসাগর ও আকাবা উপসাগরের সংগমস্থল রয়েছে। এটিই কুরআনে বর্ণিত মাজমাউল বাহরাইন তথা দুই সাগরের সংগমস্থল। ডক্টর আব্দুর রহীম রাইহান স্যাটেলাইটের মাধ্যমে স্থানটি চিহ্নিত হওয়ার দাবি করেছেন এবং বলেছেন, সেখানে স্যাটে-লাইটের মাধ্যমে একটি বিশাল পাথরখণ্ডের সন্ধানও মিলেছে। উল্লেখ্য, কুরআনে কারীমে হযরত খিযিরের সাক্ষাতে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে হযরত মূসা (আ.)-এর একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ডের নিকট আরাম গ্রহণের কথা এবং সেখানে মূসা (আ.)-এর খাদেম (ইউশা'। যিনি পরবর্তীতে নবুয়ত লাভ করেন)-এর নিকট রক্ষিত থলে থেকে মাছ বের হয়ে সমুদ্রে সুড়ংগ পথ করে চলে যাওয়ার কথা এবং সেখানে হযরত খিয্‌রের সাক্ষাত

পাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : সূরা কাহফের ৬০–৬৫ আয়াত-সমূহ।)

সুয়েজ উপসাগর দর্শন

সিনাই অঞ্চলে প্রবেশের পর থেকে শারম আশ-শায়খ পর্যন্ত পুরো পথটাই প্রায় সুয়েজ উপসাগর ঘেষে। ফলে বারবার সুয়েজ উপসাগর নজরে পড়ল আর মনে আসতে থাকল এটি সেই উপসাগর যার কোন এক স্থান দিয়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাইলসহ আল্লাহর কুদরতে পানি ফাঁক হয়ে যে রাস্তা বের হয়েছিল তা দিয়ে পার হয়েছিলেন এবং ফেরআউন ও তার দলবল থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। আর ফেরআউন ও তার দলবলের হয়েছিল সলিল সমাধি। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও বনী ইসরাইলের পার হওয়ার স্থানটি কোথায় সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পেশ করা হল।

হযরত মূসা আ. ও বনী ইসরাঈলের সমুদ্র পার হওয়ার স্থান

যেখানে আল্লাহর কুদরতে পানি ফাঁক হয়ে যায় এবং হযরত মূসা আ. বনী ইরসাঈলসহ পার হয়ে যান আর ফেরআউন তার দলবলসহ নিমজ্জিত হয় সে স্থানটি কোথায় এবং সেটা কি সমুদ্র না নদী এ নিয়ে মুফাসসিরীনে কেরামের দুই রকম মত দেখা যায়। কেউ কেউ বলেছেন, সেটা হচ্ছে নীল নদ (نهر النيل) আর কেউ কেউ বলেছেন, সেটা লোহিত সাগর (بحر القلزم/البحر الأحمر)। প্রথম মতটি সহীহ নয়। তাফসীরে রূহুল মাআনীতে البحر কিতাবের বরাতে বলা হয়েছে, "এটি ভুল"।

এ মতটি যে ভুল তার চারটা কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হল–

১. হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল যে নীল নদ পার হননি তার একটি প্রমাণ হল কুরআনে কারীমের বর্ণনা। কুরআনে কারীমে এ ঘটনা বলতে গিয়ে বহু আয়াতে البحر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর البحر শব্দটি যদিও কেউ কেউ নদী অর্থেও ব্যবহার করেছেন তবে সাধারণত এর প্রয়োগ নদী অর্থে নয় বরং সমুদ্র অর্থেই হয়ে থাকে। যাহোক হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল সমুদ্র পার হয়েছিলেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ الآية.

অর্থাৎ, আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। (সূরা আ'রাফ : ১৩৮)

এ আয়াতে 'সমুদ্র' শব্দের উল্লেখ এসেছে।

www.maktabatulabrar.com

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ.

অর্থাৎ, অতঃপর আমি মূসার নিকট ওহী প্রেরণ করলাম যে, তুমি তোমার লাটি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। ফলে তা (সমুদ্র) বিদীর্ণ হয়ে গেল। বস্তুত প্রত্যেক ভাগ বিশাল উঁচু পর্বত সদৃশ হয়ে গেল। (সূরা শুআরা : ৬৩)

এ আয়াতেও লক্ষণীয় যে, 'সমুদ্র' কথাটির উল্লেখ এসেছে। তদুপরি এ আয়াতে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল পানি ফাঁক হয়ে দুই পাশের দৃশ্য কেমন হয়েছিল তা বুঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক ভাগ বিশাল উঁচু পর্বত সদৃশ হয়ে গেল।" তাহলে এটা সমুদ্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সমুদ্রের পানি ফাঁক হয়ে রাস্তা বের হলে সেখানেই দুই পাশের পানি বিশাল উঁচু পর্বত সদৃশ হয়ে দাঁড়ায়। নদীর ক্ষেত্রে এমন হতে পারে না। বিশেষত যে নীল নদের কথা কেউ কেউ বলেছেন, সেই নীল নদের গড় গভীরতা ৮–১১ মিটার তথা সাড়ে নয় মিটার। অতএব সেখানে পানি ফাঁক হলে দুই পাশে পানির উচ্চতা সাড়ে নয় মিটার বা তার কাছাকাছি হবে। এতটুকু উচ্চতার পানির স্তূপকে 'বিশাল উঁচু পর্বত সদৃশ' বলা যায় না।

উল্লেখ্য, ফেরআউন ও তার দলবল নিমজ্জিত হওয়ার বর্ণনায় একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (সূরা তাহা : ৭৮) এখানে الْيَمِّ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ফেরআউন ও দলবলকে নিমজ্জিত করার বর্ণনা সম্বলিত আরও কয়েকটি আয়াতেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ শব্দটি সমুদ্র ও নদী উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ফেরআউন ও দলবলকে নিমজ্জিত করার বর্ণনায় ব্যবহৃত এ শব্দটিকে নদী অর্থে গ্রহণ করা যাবে না এ কারণে যে, তাহলে অন্য অনেকগুলো আয়াতে বর্ণিত সমুদ্র কথাটির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়াবে। সমুদ্র শব্দ ব্যবহৃত হওয়া আয়াতগুলোর সঙ্গে সমন্বয় রক্ষার প্রয়োজনে এখানেও الْيَمِّ শব্দটিকে সমুদ্র অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। সেমতে আয়াতের অর্থ হবে– অতঃপর ফেরআউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করল। তখন সমুদ্রের যে (ভয়াল) জিনিস তাদেরকে আচ্ছন্ন করার তা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে নিল।

২. হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল যে নীল নদ পার হননি তার আর একটি প্রমাণ হল– ফেরআউন ও বনী ইসরাঈলের বসবাস ছিল মিসরের লুকসুর (لقصر/Loxur) অঞ্চলে (৩৫.২৫ উ: ৩৩.৩২ পূ:)। একে উকসুর (أقصر)ও বলা হয়, আবার আরবিতে মা'রিফা (معرف) প্রয়োগে আল-উকসুর

(الأقصر)ও লেখা হয়। এ অঞ্চলটি মিসরের রাজধানী কায়রো (قاهرة) থেকে ৬৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং আসওয়ান (أسوان) প্রদেশ থেকে ২২০ কিলোমিটার উত্তরে নীল নদের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল এখান থেকেই রওয়ানা হয়েছিলেন। গন্তব্য ছিল বনী ইসরাঈলের আদি নিবাস শাম দেশ। আর লুকসুর থেকে উত্তর দিকে সিনাই এলাকা পার হয়ে শাম দেশ। আর লুকসুর থেকে সিনাই এলাকার মধ্যে নীল নদের অন্তরায় নেই। তাই নীল নদ পার হওয়ার প্রশ্ন আসে না। পশ্চিম দিকে যাওয়ার উদ্দেশ্য থাকলে নীল নদ পার হওয়ার প্রশ্ন ছিল।

৩. কুরআনে কারীমের বর্ণনা মোতাবেক (দ্র. সূরা শুআরা : ৫২) হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতের বেলায় রওয়ানা হয়েছিলেন। আর ফেরআউন পরবর্তী সকালে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল এবং পার হওয়ার আগেই ফেরআউন তার দলবলসহ তাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল (দ্র. সূরা শুআরা : ৬০–৬১)। আবার ফেরআউনের প্রাসাদ ছিল নীল নদেরই পূর্ব তীরে একেবারেই নদী সংলগ্ন, (যা কুরআনে কারীমের সূরা যুখরুফের ৫১ নং দ্বারা প্রমাণিত) আর এরই আশে পাশে ছিল বনী ইসরাঈলের অবস্থান। তাহলে এখন নীল নদই যদি পার হওয়ার ছিল তাহলে তো সকালের অনেক আগেই পার হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কেননা তাদের বসবাস তো ছিল নীল নদেরই উপকূলে। তাহলে পার হওয়ার আগেই ফেরআউনের দলবলসহ সেখানে পৌছার কথা সংগতিপূর্ণ নয়।

৪. কুরআনে কারীমের সূরা আ'রাফের ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল সমুদ্র পার হওয়ার পর এক সম্প্রদায়কে মূর্তি-পূজায় রত দেখে তাদের জন্য সেরূপ মূর্তি নির্ধারণ করে দেয়ার আবেদন করেছিল। বর্ণনায় বুঝা যায় এরূপ মূর্তি সম্বন্ধে পূর্বে তারা অবগত ছিল না। নতুন ধরনের মূর্তি দেখেই তাদের মনে সেরূপ মূর্তি-উপাসনার খাহেশ জেগেছিল। এখন যদি নীল নদ পার হয়েই বিষয়টি ঘটে থাকবে তাহলে নতুন মূর্তি দেখার প্রশ্নই উঠে না, তারা তো এই নদীরই অপর পারে বসবাস করেছিল, তাহলে এপারের মূর্তি সম্বন্ধে তাদের পূর্বেই অবগত থাকার কথা।

যাহোক হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল নীল নদ নয় বরং লোহিত সাগর পার হয়েছিলেন। এখন রয়ে গেল লোহিত সাগরের কোন্ স্থান দিয়ে পার হয়েছিলেন? এর সহজ সমাধান হল যেহেতু তারা পার হয়ে সিনাই এলাকায় পৌঁছেছিলেন, তাই মিসর ও সিনাইয়ের মাঝে লোহিত সাগরের যে দীর্ঘ অঞ্চল পড়ে তারই কোন এক স্থান দিয়েই পার হয়েছিলেন। আর সেটা

www.maktabatulabrar.com

হল লোহিত সাগরেরই অংশ সুয়েজ উপসাগর (خليج سويس)। এই সুয়েজ উপসাগরেরই যে কোন একটি স্থান দিয়ে তারা পার হয়েছিলেন। আর নির্দিষ্ট করে বলা যে, সুয়েজ উপসাগরের ঠিক কোন্ স্থানটি দিয়ে পার হয়েছিলেন, সেটা বলা কঠিন। প্রাচীন মুহাদ্দিসীন ও মুফাসসিরীন থেকে এ ব্যাপারে তেমন বক্তব্য পাওয়া যায় না। আধুনিক কালের মিসরীয় গবেষণগণ এ ব্যাপারে গবেষণা ও তদন্ত করে কিছু বলার চেষ্টা করছেন, তবে তাদের বক্তব্যেও পরস্পর বিরোধ রয়েছে। কেউ বলছেন, মিসরের লোহিত সাগরের উপকূলীয় 'আল-বাহরুল আহমার' গভর্নরেটের রা'স গারেব (رأس غارب/Ras Ghareb) বরাবর স্থান দিয়ে পার হয়েছিলেন। তারা বলছেন, আধুনিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই বরাবর সাগরের তলে প্রচুর সংখ্যক মানুষের মাথার খুলি ও অস্ত্রশস্ত্রের ধ্বংশাবশেষ পাওয়া গেছে, যা এখানে ফেরআউনের সশস্ত্র বাহিনীর ডুবে মরার প্রমাণ বহন করে। কেউ কেউ সুয়েজ শহর থেকেও উত্তর দিকের কোন স্থান দিয়ে (যেখানে এখন সুয়েজ সাগর নেই) পার হওয়ার কথা বলছেন। তাহলে ফেরআইনের ডুবে মরার সে যুগে সে পর্যন্ত সুয়েজ সাগরের অংশ প্রলম্বিত ছিল বলতে হয়। এই মতের প্রবক্তাগণ তেমনই বলেছেন। যাহোক এ ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন।

দাহাব শহরের গিমি হোটেলে গমন

প্রায় ১২ ঘণ্টা উতুবিস সফরে দাহাব শহরে পৌঁছা হল। মাঝখানে অনেক চেকিং, অনেক তল্লাশী হল। শহীদ আহমেদ হাম্‌দী টানেলের পূর্ব থেকে শুরু করে রা'স সিদ্‌র, রা'স মাতারমা, আবূ যেনীমা, রা'স আবূ রুদীস, তূর শহর, শারম আশ-শেখ প্রভৃতি ১০ দশ জায়গায় পুলিশ চেকিং ও তল্লাশী হল। প্রত্যেকটা চেকিং পয়েন্টে যেন যুদ্ধাবস্থা। ভারি অস্ত্রশস্ত্রসহ মিলিটারিদের অবস্থান। যেন একটু কিছু ঘটলেই ধমাধম গুলি চালানো হবে। আসলে মিসর সরকারের কাছে উত্তর সিনাই এলাকায় –যা কিনা ইসরাঈলের সাথে বর্ডার এলাকা এবং স্পর্শকাতর এলাকা– দেশদ্রোহী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটছে মর্মে রিপোর্ট থাকায় এতসব চেকিং- তল্লাশী, এতসব সতর্কতা।

যাহোক রাত একটায় দাহাব শহরে পৌঁছা হল। চেকিং তল্লাশীর নির্যাতন থেকে রক্ষা পেয়ে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। গিমী হোটেলে থাকা হল। আরবিতে নামটি এভাবে লেখা আছে الفندق الذمي (আল-ফুনদুক আয-যিম্মী-)। আর ইংরেজিতে লেখা আছে Hotel Gimi। হোটেলের গেটে বাইরে রিসিপশনের জন্য লোক দাঁড়িয়ে ছিল। ভিতরে প্রবেশের পর হোটেলের নাম

থেকে নেক-ফালী (সুলক্ষণ) গ্রহণ করে আমি আরবিতে বললাম, হোটেলটির নাম যিম্মী। যিম্মী শব্দটি যিম্মা থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ দায় গ্রহণ। অতএব আপনাদের হোটেলে কেউ প্রবেশ করলেই সে আপনাদের দায়-দায়িত্বে এসে যায় এবং নিরাপদ হয়ে ওঠে– ঠিক কি না? আমার এই ব্যাখ্যায় তারা বেশ আপ্লুত হল।

২১/৪/২০১৯ রবিবার

আকাবা উপসাগর দর্শন

আকাবা উপসাগর (خليج العقبة/Gulf of Aqaba) সিনাই এলাকার পূর্বে এবং সৌদি আরবের দক্ষিণ অঞ্চলগুলোর পশ্চিমে। এর দৈর্ঘ ১৬০ কিলোমিটার। সর্বোচ্চ প্রশস্থতা ২৪ কিলোমিটার। সর্বোচ্চ গভীরতা ১৮৫০ মিটার।

সারা দিন গিমী হোটেলে বিশ্রাম নিলাম। হোটেলটি এই আকাবা উপসাগরের তীরে অবস্থিত। বিকেল বেলা সাগরের পাড়ে বহুদূর পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে সাগরের ঢেউগুলো কূলে আছড়ে পড়ার এবং সেই ঢেউয়ের মধ্যে কূলের কাছাকাছি জেলেদের মাছ ধরার মনোরম দৃশ্য উপভোগ করলাম। সাগরের ওপারে সৌদি আরবের মাদইয়ান এলাকার উপকূলীয় পাহাড়-পর্বত ও বিভিন্ন স্থাপনা আবছা নজরে আসছিল। 'আকাবা' নামটি শুনলেই কুরআনে কারীমে বর্ণিত একটি ঘটনা স্মরণে আসে। আজ তো আকাবা নাম শোনা নয় খোলা চোখেই তা দেখছি। কুরআনে কারীমে বর্ণিত সেই ঘটনাটা বলছি–

আকাবা উপসাগর-এর উত্তর প্রান্তে 'আকাবা' (العقبة) নামক একটি জনপদ রয়েছে। জনপদটি বর্তমানে জর্দানের দক্ষিণাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই জনপদের নামের ভিত্তিতেই এই উপসাগরের নামকরণ হয়েছে 'আকাবা উপসাগর'। জনপদটির প্রাচীন নাম ছিল 'আইলা' (أيلة)। এই আইলাতেই হযরত দাঊদ (আ.)-এর যমানায় কিছু বনী ইসরাঈল শনিবার মাছ শিকার করার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় শুকর ও বানরে পরিণত হয়েছিল। ঘটনাটি সূরা আ'রাফের ১৬৩ নং আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.

অর্থাৎ, আর তুমি তাদেরকে সেই জনপদের (অধিবাসীদের) অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যা সাগর-তীরে অবস্থিত ছিল। যখন তারা শনিবার সম্বন্ধে সীমালংঘন করছিল –যখন তাদের শনিবার দিন তাদের (সমুদ্রের) মৎসগুলো আত্মপ্রকাশ করে তাদের নিকট আসত, আর যেদিন শনিবার দিবস না হত

www.maktabatulabrar.com

তাদের নিকট আসত না। এমনিভাবে আমি তাদের পরীক্ষা নেই, যেহেতু তারা আদেশ লংঘন করত।

ঘটনার বিবরণ এরূপ– হযরত দাঊদ (আ.)-এর যুগে আইলা নামক জনপদে বসবাসকারী ইয়াহুদীদের প্রতি নির্দেশ ছিল শনিবার মৎস শিকার না করার। পরীক্ষা স্বরূপ শনিবারে সাগরে প্রচুর মাছ দেখা দিত। (শনিবার দিন ছিল তাদের সাপ্তাহিক কর্ম বিরতির দিন।) অন্যান্য দিনে দেখা যেত না। (যেদিনগুলোতে তারা কাজ কর্মে লিপ্ত হত। আর তা হল শনিবার ছাড়া অন্যান্য দিন।) শনিবারে মাছের প্রাচুর্য্য দেখে তারা লোভ সংবরণ করতে পারত না। তারা সাগর তীরে বহু হাউজ খনন করে নালী কেটে নদীর সাথে যুক্ত করে দিত এবং শনিবার মাছ তাড়িয়ে হাউযের ভিতরে এনে নালী বন্ধ করে দিত এবং পরবর্তী দিন শিকার করত। এরূপ প্রহসনমূলকভাবে আল্লাহর বিধান লংঘন করায় তাদের উপর শাস্তি আপতিত হয়। তাদেরকে শুকর ও বানরে পরিণত করা হয় এবং এই রূপান্তরিত অবস্থায় তিন দিন থাকার পর তারা সবাই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী আমাদের যুগের বানর ও শুকরগুলো সেই রূপান্তরিত ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের বংশ নয় বরং শুকর ও বানর এ ঘটনার পূর্বেও পৃথিবীতে ছিল এবং পরেও রয়েছে।

২২/৪/২০১৯ সোমবার

তূর পর্বত ও সেন্ট ক্যাথরিন

সিনাই এক বিশাল বিস্তৃত অঞ্চল। অঞ্চলটিকে প্রশাসনিকভাবে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে তূর পর্বত যে এলাকায় অবস্থিত সে এলাকাটির নাম সেন্ট ক্যাথরিন (Saint Catherine)। আরবি উচ্চারণে বলা হয় সান্ত্ কাত্রিন (سانت كاترين)। এই সেন্ট ক্যাথরিন এলাকাটি দক্ষিণ সিনাইয়ের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। সেন্ট ক্যাথরিন অঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৬০০ মিটার উঁচু বড় বড় পর্বত ঘেরা একটি অঞ্চল। শীতের মওসুমে গোটা এলাকা সাদা বরফের আস্তরে ঢাকা পড়ে এক মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করে।

তূর পর্বত থেকে দক্ষিণ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে কিছুদূরে সেন্ট ক্যাথরিন নামে একটি পর্বত (جبل سانت كاترين) রয়েছে। এ পর্বতটির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৬২৯ মিটার। এটি সিনাই এলাকার সবচেয়ে উঁচু পর্বত। এই পর্বতের নামেই গোটা এলাকার নামকরণ হয়েছে সেন্ট ক্যাথরিন। তূর পর্বতের পাদদেশে সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারি নামে একটি মঠ বা আশ্রমও রয়েছে, যার উল্লেখ পরে আসছে। তূর পর্বতের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২২৮৫ মিটার।

তূর পর্বতকে আরবিতে বলা হয় জাবালুত তূর (جبل الطور) বা জাবালে মূসা (جبل موسى), মিসরীয়দের উচ্চারণে গাবালে তূর বা গাবালে মূসা। ইংরেজিতে বলা হয় Mount sinai বা Mount Musa। উল্লেখ্য, অনেকেই সেন্ট ক্যাথরিন, সেন্ট ক্যাথরিন পর্বত ও সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারি–এই তিনটির মাঝে পার্থক্য করতে না পেরে সব ঘুলিয়ে ফেলেন।

তূর পর্বত খোলা জায়গায় একটি একক পর্বত– এমন নয়। বরং বহুসংখ্যক ঘন সন্নিবিষ্ট পর্বতরাজির মাঝে একটি পর্বত। ফলে চূড়া ব্যতীত গোটা তূরকে যেমন স্বতন্ত্রভাবে দেখা যায় না তেমনি গোটা তূরের স্বতন্ত্র ছবিও তোলা যায় না। একমাত্র উপর থেকে অর্থাৎ, হেলিকপ্টার বা প্লেন থেকে পুরো চূড়ার ছবি তোলা সম্ভব। অনেক পর্বতের মাঝে হওয়ার কারণে অনেক পর্বতের আশপাশ ঘুরে ঘুরে তূর পর্বতে আরোহণ করতে হয়। যেখান থেকে উপরের দিকে চড়া শুরু হয় তূরের টিকিটিও দেখা যায় না। কয়েক কিলোমিটার ওঠার পর তূরের চূড়ার দেখা পাওয়া যায়। এভাবে সাত কিলোমিটার উপরমুখী পাহাড়ী পথ হেঁটে তূরের উপরিভাগের একটা স্তরে আরোহণ করতে হয়। এই স্তরের উপরিভাগে রয়েছে আরও বেশ কিছু উঁচু চূড়া। এই চূড়ায় আরোহণ করার জন্য পর্বত কেটে কেটে ৭৫০টি খাড়া সিঁড়ি বানানো হয়েছে। এটুকু আরোহণ করা আরও কষ্টকর। উপরে বানানো হয়েছে ছোট্ট একটি মসজিদ ও ছোট্ট একটি গীর্জা। অনেকে বলে থাকে মসজিদটি ফাতেমী খেলাফতের সময়ে বানানো হয়েছে। সেই স্থানটিও চিহ্নিত রয়েছে যেখানে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ইবাদত করেছিলেন। উল্লেখ্য, হযরত মূসা আলাইহিস সাল্লাম ৪০ দিন তূর পর্বতে ইতিকাফ করেছিলেন। তারপর তিনি তাওরাত কিতাব প্রাপ্ত হন।

তূর পর্বত

www.maktabatulabrar.com

তূর পাহাড় সম্বন্ধে দু'টো ভ্রান্তির অপনোদন

(১) অনেকে মনে করে যে পাহাড়টি আল্লাহর নূরের তাজাল্লিতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিলো সেটি তুর পাহাড়। কিন্তু তা সঠিক নয়। আল্লাহর তাজাল্লিতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া সে পাহাড়টি তূর পাহাড় থেকে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত অন্য একটি পাহাড়। কেউ কেউ বলেন, তূর পাহাড়ই আল্লাহর তাজাল্লীতে জ্বলেছিল। এ মত সঠিক মনে হয় না। কারণ, তূর পাহাড়ে জ্বলে যাওয়ার কোন আলামত দেখা যায় না। গোটা তূর পাহাড়ই চূড়াসহ অক্ষতই দেখা যায়।

(২) অনেকে মনে করে আল্লাহর তাজাল্লিতে তূর পাহাড় জ্বলে সুরমায় পরিণত হয়েছে। তারা মনে করে আল্লাহর নূরের তাজাল্লিতে ভস্মীভূত তুর পাহাড় থেকেই সুরমার উৎপত্তি ও ব্যবহার। মিসর সফরে যাওয়ার সময় একজন উম্মী মানুষ তো আমার কাছে আব্দারই করে বসেছিল– মিসরে যাচ্ছেন, তূর পাহাড়ে গেলে আমার জন্য একটু সুরমা নিয়ে আসবেন। বস্তুত তুর পাহাড়ের সাথে সুরমার কোনো সম্পর্ক নেই। সুরমা তূর পাহাড়ের পাথর নয়, বরং সুরমা একটি খণিজ দ্রব্য, যার মূল উপাদান হলো লিড ও সালফাইড, যা চূর্ণ করে সুরমা তৈরী করা হয়।

সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারি, পবিত্র তুওয়া উপত্যকা ও উল্লিকা বৃক্ষ

তূর পর্বতে আরোহণের পথ রয়েছে দুই দিক থেকে। সহজ পথ যেটি দিয়ে সাধারণত সকলে তূরে আরোহণ করেন সেটি হল তূর পর্বতের উত্তর দিকের পথ। হযরত হারূন (আ.)-এর কবরকে বাম হাতে রেখে কিছুদূর দক্ষিণে অগ্রসর হলে সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারি। এর পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে ধীরে ধীরে উপরে অগ্রসর হয়ে তূরে আরোহণের যে পথ সেটিই হচ্ছে উত্তর দিকের পথ। যেখান থেকে তূরের উদ্দেশ্যে উপর দিকে আরোহণ শুরু হয়, সে জায়গাটি দুই দিকের পর্বতের মাঝে একটি উপত্যকা। এখানে তূরের দিকে (দক্ষিণ দিকে) মুখ করে দাঁড়ালে ডান দিক হল কুরআনে উল্লেখিত সেই ডান দিকের উপত্যকা (الوادى الأيمن)– পবিত্র তুওয়া উপত্যকা (الوادى المقدس طوى)। সেখানে বর্তমানে রয়েছে সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারি। (دَيْر سانت كاترين/Saint Catherine's Monastery)। মন্যাস্টারি বলা হয় সন্ন্যাসীদের মঠ বা সন্ন্যাসীদের আশ্রমকে। এই মন্যাস্টারির মধ্যে একটি গাছ রয়েছে। গাছটি লতা জাতীয় গাছের ন্যায়। গাছটিকে বলা হয় আশ-শাজারাতুল উল্লিকা (الشجرة العليقة) বা আশ-শাজারাতুল উল্লাইকা, যার অর্থ করা

যায় ঝুলন্ত গাছ। গাছটির গোড়া গির্জার মধ্যে আর লতার ন্যায় শাখা-প্রশাখা গির্জার বাইরে। ফলে বাইরের অংশ ঝুলন্তই মনে হয়। বাইরের অংশ নিচের দিকে দেয়াল দিয়ে বেষ্টনী করে রাখা হয়েছে। বলা হয় এটি সেই গাছ হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বিবিসহ মাদইয়ান থেকে মিসরে আসার পথে যেখানে আগুন দেখে জ্বলন্ত অঙ্গার সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন আর নিকটে আসার পর এই গাছ থেকেই আল্লাহ তাআলা তাকে ডেকে বলেন, হে মূসা! আমি আল্লাহ, জগৎসমূহের প্রতিপালক ...। হাজার হাজার বছর পার হওয়া সত্ত্বেও এই গাছটি এখনও জীবিত। গোটা সিনাই এলাকায় এরকম আর একটি গাছও পাওয়া যায় না। এর পাতাও ঝরে পড়ে না। এই গাছ থেকে এরকম গাছও আর বানানো সম্ভব হয় না। খ্রিস্টানরা বিভিন্ন দেশে এর শাখা নিয়ে এরকম আরও গাছ বানানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। সিনাই অঞ্চলের ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ নিয়ে গবেষণা ও তার তাত্ত্বিক প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে গঠিত সংস্থা (البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء)-এর প্রধান ডক্টর আব্দুর রহীম রায়হান তদন্ত সাপেক্ষে নিশ্চিত হয়েছেন যে, এটিই কুরআনে উল্লেখিত সেই বৃক্ষ। অতএব এই স্থানটিই হচ্ছে কুরআনে উল্লেখিত সেই ডান দিকের উপত্যকা (الوادى الأيمن)– পবিত্র তুওয়া উপত্যকা (الوادى المقدس طوى)। এ ব্যাপারে কুরআনের সূরা ক্বাসাসের বর্ণনা নিম্নরূপ–

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٢٩) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٣٠)

অর্থাৎ, অতঃপর মূসা যখন সে মেয়াদ (শুআয়ব [আ.]-এর কাছে থাকার মেয়াদ) পূর্ণ করল এবং সে তাঁর পরিবার নিয়ে যাত্রা করল, তখন সে তূর পর্বতের দিক থেকে এক প্রকার আগুন (-এর মত আলো) দেখতে পেল। সে তার পরিজনবর্গকে বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি এক প্রকার আগুন দেখতে পেয়েছি, সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো সংবাদ অথবা আগুনের একটা জ্বলন্ত কয়লা আনতে পারি। যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। (২৯) অতঃপর যখন সে (মূসা) তার (আগুনের) কাছে পৌঁছল, তখন সেই উপত্যকার ডান দিক থেকে সেই বরকতময় স্থানে এক বৃক্ষ থেকে আহবান করা হল যে, হে মূসা! নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, সমগ্র জগতের প্রতিপালক। (৩০)

সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারি পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম মন্যাস্টারি। এর

www.maktabatulabrar.com

মধ্যে রয়েছে একটি গির্জা, যা খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতকে সম্রাট কন্স্টান্টিন (قسطنطين/ Constantine) কিংবা তার মাতা হেলেনা (هيلانة/Helena) আশ- শাজারাতুল উল্লিকার নিকট নির্মাণ করেছিলেন। গির্জাটিকে বলা হয় পবিত্র উল্লিকা গির্জা (كنيسة العليقة المقدسة)। পরবর্তীতে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে পূর্ব রোমক সাম্রাজ্য (বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য)-এর সম্রাট জাস্টিনিয়ান (جستنيان/ Justinian) এখানে একটি বড় গির্জা নির্মাণ করেন, যার নাম দেন কানীসাতুত্তাজাল্লী (كنيسة التجلي)। তিনি পূর্বের গির্জাটিকে এই গির্জার অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারিতে বিভিন্ন ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক ডকুমেন্টস, বহু হাতে লেখা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সমৃদ্ধ একটি পাঠাগারও রয়েছে। ভ্যাটিক্যান পাঠাগারের পর এটি দ্বিতীয় পাঠাগার যেখানে সবচেয়ে বেশি পাণ্ডুলিপি ও হস্তলিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ রয়েছে। এতে ৬ হাজার পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ রয়েছে। তার মধ্যে খ্রিস্টীয় ৪র্থ, ৫ম ও ষষ্ঠ শতকের লেখা বহু পাণ্ডুলিপিও রয়েছে। রয়েছে কয়েক হাজার গ্রন্থ। মন্যাস্টারিতে একটি ছোট্ট মসজিদও রয়েছে। মসজিদটি ফাতিমী খলীফা আমের বিআহকামিল্লাহ ৫০০ হিজরি মোতাবেক ১১০৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন। একই স্থানে গির্জা ও মসজিদ– মিসরীয়দের ধর্মীয় সহনশীলতার ঐতিহাসিক প্রমাণ বৈ কি। যদিও প্রাচ্যবিদদের কেউ কেউ এটাকে মুসলিম আধিপত্যবাদের একটা প্রয়োগ বলে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু আধিপত্যবাদের প্রয়োগই যদি হত, তাহলে তো গির্জা আর দাঁড়িয়ে থাকত না, শুয়ে পড়ত।

খ্রিস্টীয় নবম শতক থেকে সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারি (دَيْر سانت كاترين/- Saint Catherine's Monastery) নামটির প্রয়োগ শুরু হয়। বলা হয়, ক্যাথরিন নামক এক মহিয়সী নারী ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার এক শাসকের কন্যা। খ্রিস্টীয় আমলের শুরুর দিকে তার পরিবারের মধ্যে একমাত্র তিনিই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। শাসক পিতা তাকে ধর্মান্তরিত করার সব রকম প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তাকে নির্যাতন করার নির্দেশ দেয়। নির্যাতনে ক্যথরিন মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর ফেরেশতারা তার লাশ তুলে নিয়ে গোপন করে রাখে। ৫০০ বছর পর এখন যে পাহাড়কে ক্যাথরিন পর্বত বলা হয়, সেই পর্বতের চূড়ায় তার লাশের সন্ধান পাওয়া যায় আর তার পাদদেশে এই সেন্ট ক্যাথরিন মান্যাস্ট্রারি অবস্থিত বিধায় তার নামানুসারে নামকরণ করা হয় সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারি। ক্যাথরিনের আবাসভূমি আলেকজান্দ্রিয়াতেও এই নামের একটি মন্যাস্টারি রয়েছে।

সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারি ও পবিত্র তুওয়া উপত্যকা

সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারিতে গির্জা ও মসজিদের পাশাপাশি অবস্থান

শাজারাতুল উল্লিকা বা উল্লিকা বৃক্ষ

www.maktabatulabrar.com

তূর পর্বতে আরোহণের প্রস্তুতি

দাহাব শহরের গিমি হোটেলের প্যাকেজ অনুসারে হোটেল থেকে রাত ১০টায় তূরের উদ্দেশ্যে যাত্রা হল। গঠিত হল ১৩ জন পর্যটক নিয়ে একটি দল। পরে যোগ হয়েছিল একজন গাইড। রাত ১টায় তূরের পাদদেশে পৌঁছা হল।

তূর পর্বত এলাকায় প্রায় সারা বছরই শীত থাকে। পূর্ণ শীতের মওসুমে তো এলাকাটি রীতিমত বরফের আস্তরে ঢাকা পড়ে। পর্বতটি অনেক উঁচু হওয়ায় উপরের দিকে ঠাণ্ডা অনেক বেশি। এজন্য পূর্বেই হালকা ছোয়েটার, পায়ের মোজা, মাথার রোমাল ইত্যাদি সামান্য কিছু ব্যবস্থা রেখেছিলাম। হোটেল কর্তৃপক্ষের পরামর্শ মোতাবেক পাহাড়ী পথ পাড়ি দেয়ার জন্য আবশ্যিক হিসেবে উপযোগী জুতোও পায়ে লাগানো হয়েছিল। যেন এক বিশেষ অভিযানে বের হওয়া আর কি। প্রথমে ভেবেছিলাম আমি তো শীতে-কাবু লোক নই, শীত প্রতিরোধের খুব বেশি ব্যবস্থা বোধ করি আমার জন্য প্রযোজ্য নয়। তাই অন্যদের তুলনায় শীত প্রতিরোধের ব্যবস্থা আমি একটু কমই রেখেছিলাম। যেখান থেকে তূর পর্বতে আরোহণ শুরু হয় সেখানে বহু লোক হাত মোজা, বিভিন্ন রকম উলের পোশাক ইত্যাদি বিক্রি করছে দেখেছিলাম, সেদিকেও তেমন ভ্রুক্ষেপ করিনি। তখনও ঐ একই ভাবনা ছিল আমি তো আর শীতে কাবু লোক নই। কিন্তু উপরে ওঠার পর আমার শীতে-কাবু-নই গর্ব খুব করুণভাবে বিনীত হয়েছিল। আসলে কোন বিষয়েই গর্ব করতে নেই। হাড়-কাপানো হিমেল বায়ু স্মরণে রাখার মত। মাঝে মধ্যে বড় বড় পাথরের চাকার আড়ালে আশ্রয় নিয়েও সে বায়ুর কবল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন তো এপ্রিল মাস, তারপরও শীতে রীতিমত পেটের নাড়িভুড়ি হার্ট পর্যন্ত কাপতে শুরু করেছিল। ওঠার পথে মাঝে মাঝে রয়েছে চা নাস্তার ক্যাফেটারিয়া বা দোকান। এক পর্যায়ে এরকম একটা ক্যাফেটারিয়ায় ঢুকে চা পান করেও শরীর গরম হচ্ছিল না। ঠাণ্ডায় শরীরের এমনও বেহাল অবস্থা হয় জীবনে কখনও তা বাস্তবে উপলব্ধি করিনি। অবেশেষে দোকানীর কাছ থেকে একটা কম্বল চেয়ে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ জড়িয়ে থেকে কাপুনির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। দোকানী বলেছিল, এতটুকু ঠাণ্ডাতেই আপনি কাবু হয়ে গেলেন, প্রচণ্ড শীতের মৌসুমে যখন গুড়ি গুড়ি বরফ পড়ে তখনও অনেক মানুষ এই পর্বতে আরোহণ করে। তখন তাদের অবস্থা এমন হয় যে, মাথা, মুখ, শরীর সব সাদা বরফের গুড়িতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

শীতের মওসুমে বরফে আচ্ছন্ন সেন্ট ক্যাথরিন এলাকা

তূর পর্বতে আরোহণ

পূর্বে সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এটি তূর পর্বতের উত্তর দিকে। এই মন্যাস্টারিকে ডান হাতে রেখে সামনের দিকে (দক্ষিণ দিকে) তূর পর্বতের উদ্দেশ্যে উপরে আরোহণ শুরু হয়। তূর পর্বতে সকলেই পায়ে হেঁটে উপর পর্যন্ত উঠতে পারে না। প্রায় সাত কিলোমিটার হাঁটার পথ, তারপরও রয়েছে পাহাড় ভেঙ্গে উপর দিকে ওঠার অভ্যাসের প্রশ্ন। এজন্য পল্লিবাসীরা উট নিয়ে প্রস্তুত থাকে, ১০০ পাউন্ড দিলে উটের পিঠে চড়িয়ে উপর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

আমরা তূরের উদ্দেশ্যে আরোহণ শুরু করলাম। আমাদের টীমের সকলেই ছিল নওজোয়ান, একমাত্র আমিই ছিলাম সকলের মধ্যে বেশি বয়সী। এ সময় আমার বয়স ৫৮ বছর ৭ মাস। একজন উট চালক শুরু থেকে আমার পিছু নিল এই ভেবে যে, আমি হয়তো ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত উটে চড়তে বাধ্য হব। প্রথমবার সে যখন আমাকে উটে চড়ার অফার দিয়েছিল আমি স্পষ্টতই তাকে বলেছিলাম, আমি উটের পিঠে স্থির থাকতে পারি না। (পিরামিডের কাছে উটের পিঠে চড়ে আবার নেমে যাওয়ার লজ্জা তো স্মরণেই ছিল।) কিন্তু সে হাল ছাড়ল না, আমার পিছে পিছে উট টেনে

www.maktabatulabrar.com

নিয়ে চলছিল আর কিছুক্ষণ পরপরই আমার কানের কাছে এসে বলছিল, "গার্‌রিব আল-গামাল"। সঠিক উচ্চারণের আরবি ছিল 'জার্‌রিব আল-জামাল' (جَرِّبِ الْجَمَل অর্থাৎ, উটের পিঠে আরোহণ করে পরীক্ষা করেই দেখ স্থির থাকতে পার কি না।) মিসরীয়দের উচ্চারণে জীম 'গ'-এর উচ্চারণে চলে আসে, তাই হয়ে গেছে গাররিব আল-গামাল। মাঝে মাঝে ইংরেজিতে বলছিল, "ক্যামেল গুদ" (মূল ইংরেজি হল Camel good [ক্যামেল গুড] অর্থাৎ, উট তো চমৎকার বাহন! আরবরা ইংরেজি D কে 'দ' উচ্চারণ করে, তাই গুড হয়ে গেছে গুদ।) এভাবে উট চালকটি 'গার্‌রিব আল-গামাল' এবং 'ক্যামেল গুদ' বলে ঘ্যানর ঘ্যানর করতে করতে আনুমানিক ৩ কিলোমিটার পথ আমার সাথে পাড়ি দিল। তারপরও যখন আমাকে বাগাতে পারল না, তখন আমার পিছু ত্যাগ করল। ভাবলাম যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। কিন্তু না, একটু পরই দেখলাম একই সুর করতে করতে আরেকজন আমার পিছু নিয়েছে। ভাবলাম এটা কি তাহলে ঢাকার পকেটমারদের মত ব্যাপার। শুনেছি ঢাকার পটেকমারদের একেক জনের এরিয়া নির্ধারিত আছে। সেই এরিয়ার মধ্যে কোন টার্গেটিকৃত ব্যক্তির পকেট মারতে সক্ষম না হলে আর টার্গেটিকৃত ব্যক্তি বাস মিনিবাস প্রভৃতি গাড়িতে তার এরিয়া পার হয়ে যেতে থাকলে পরের এরিয়ার কোন পকেটমারের হাতে টার্গেটিকৃত ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়। বিনিময়ে ঐ পরেরজন থেকে কিছু পার্সেন্টিজ খসিয়ে নেয়।

তূর পর্বত থেকে সূর্য উদয়ের দৃশ্য অবলোকন

সূর্য উদয়ের দৃশ্য দেখার বর্ণনা দেয়ার পূর্বে কয়েকটি কথা বলে নেই। **এক.** সূর্য উদয়ের মুহূর্তে ৩ মিনিট সময় নিষিদ্ধ সময়। এ সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ। **দুই.** সূর্যের চাকতির উপর প্রান্ত দিগন্তের উপরে আসা শুরু হলেই সূর্য উদয়ের সময় ধরা হয়। আর সূর্যের চাকতির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত কোন বিন্দু পার হতে সময় লাগে ২ মিনিট ৮ সেকেন্ড। অতএব সূর্য উদয়ের শুরু থেকে উদয় পূর্ণ হতে সময় লাগে ২ মিনিট ৮ সেকেন্ড। এই পুরো ২ মিনিট ৮ সেকেন্ড সময়ই হচ্ছে নিষিদ্ধ সময়। সাধারণত মানুষ সেকেন্ডকে হিসেবে আনতে অভ্যস্ত নয়, তদুপরি সতর্কতার বিষয়ও রয়েছে। তাই সূর্য উদয়কালীন ৩ মিনিট পরিমাণ সময়কে নিষিদ্ধ সময় বলা হয়ে থাকে। আর **তিন.** সূর্য উদয়ের পর যতক্ষণ তার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় সে সময়টা উদয়ের হুকুমে। সে সময় কোন নামায পড়া জায়েয নয়। এ সময়টা হল মাকরূহ সময়। কথাটিকে এভাবেও বলা যায় যে, সূর্য উদয়ের পর

যতক্ষণ তার আলো এতটা প্রখর না হয় যে, তার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না, ততক্ষণ কোন নামায পড়া জায়েয নয়। যখন তার আলো এতটা প্রখর হয়ে ওঠে যে, তার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে যায় না তখন নামায পড়া যায় এবং তখনই ইশরাকের সময় শুরু হয়। এই তাকিয়ে থাকা যায় বা যায় না– এটা আকাশ স্বাভাবিক মেঘমুক্ত থাকার সময়ে বিবেচ্য। এ হচ্ছে সূর্য উদয়ের পর কতক্ষণ নামায পড়া যায় না সে ব্যাপারে একটি মূলনীতি এবং এটিই প্রকৃত মূলনীতি। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের কেউ কেউ বলেছেন, সূর্য উদয়ের পর সূর্য এক নেযা তথা ৬ হাত উঁচুতে উঠার আগ পর্যন্ত কোন নামায পড়া জায়েয নয়, তারপর থেকে জায়েয। মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী সাহেব সরেজমিনে পরীক্ষা করে দেখেছেন কোন কোন অঞ্চলে বা কোন কোন মওসুমে সূর্য উদয়ের ৯ মিনিট পর, আবার কোন কোন অঞ্চলে বা কোন কোন মওসুমে সূর্য উদয়ের ১০ কিংবা ১২ মিনিট পর এ সময় হয়ে থাকে। সতর্কতার জন্য এই ১২ মিনিটকে গ্রহণ করা ভাল। আমারা তূর পর্বত থেকে সূর্য উদয়ের সময় দু'টো বিষয়ই যাচাই করলাম। একটা হল– সূর্যের চাকতির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত কোন বিন্দু পার হতে সময় লাগে ২ মিনিট ৮ সেকেন্ড। দ্বিতীয়টা হল– সূর্য উদয়ের ১০/১২ মিনিট পরই সূর্যের আলো এতটুকু তেজ হয়ে যায় যে, তার দিকে আর দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। দেখা মতেও ১২ মিনিট পর এ সময় হয়ে যায়। তাই সূর্য উদয়ের পর ১২ মিনিট পর্যন্ত অর্থাৎ, সূর্য ৩ ডিগ্রী উপরে ওঠা পর্যন্ত মাকরূহ সময় এবং তার পর থেকেই ইশরাকের ওয়াক্ত শুরু ধরা যায়।

তূর পর্বত থেকে অবতরণ ও দু'জন ইয়াহুদীর সাক্ষাত

সূর্য একটু তেজ হওয়ার পর নিচে নামতে শুরু করলাম। নামছি তো নামছি পথ যেন আর শেষ হচ্ছে না। ওঠার সময় জযবা সেই সাথে অন্ধকারও ছিল বিধায় পথের দূরত্ব বুঝেও না বুঝার মত ছিল। কিন্তু নামার সময় তো দিনের আলোতে কীভাবে পথ এঁকে বেঁকে কত দূরে এগিয়ে গেছে তা সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। নামার সময় এক পর্যায়ে বড় দাড়িওয়ালা, আবা পরিহিত, দারুন ফর্সা দু'জন লোক দেখলাম। আমি সালাম দিতে উদ্যত হলাম। কিন্তু সঙ্গী ইকবাল হোসাইন সালাম দিতে যাচ্ছি টের পেয়ে বলল, হুজূর! এরা বোধ হয় ইয়াহুদী। আমি আগেও জানতাম শুধু মুসলমানরাই নয় তূর পর্বত দর্শনে ইয়াহুদী খ্রিস্টানরাও এসে থাকে। হযরত মূসা আলাইহিস

www.maktabatulabrar.com

সালাম তো তাদেরও নবী। আর তূর পর্বত হযরত মূসা আলাইহিস সালামেরই স্মৃতি বিজড়িত স্থান। আমাদের টীমের দু'একজনের ব্যাপারেও আমার ধারণা হয়েছিল তারা মুসলমান নয়, সম্ভবত খ্রিস্টান। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে আবার কোন্ ফ্যাকড়ায় পড়ি তাই জিজ্ঞাসা করিনি। এবার তো সাক্ষাত ইয়াহুদীর দর্শন পেয়ে গেলাম। তারা আসলেই ইয়াহুদী কি না যাচাই করার জন্য একেবারে তাদের কাছে ঘেষে এলাম। মুখোমুখী হলাম দেখি তারা সালাম দেয় কি না। কিন্তু না শুধু মুখোমুখি নয় চোখাচোখি হওয়া সত্ত্বেও তারা সালাম দিল না। কিছুটা স্পষ্ট হল বৈকি? আরেকটু আগে বেড়ে আরও স্পষ্ট হল যখন দেখলাম তাদের একজন দিব্যি দাঁড়িয়ে পেশাব সম্পন্ন করল আর ঢিলা-কুলুখের ধারেও গেল না, পানি ব্যবহার তো নয়ই।

হযরত হারূন আলাইহিস সালাম-এর কবর যিয়ারত

তূর পর্বত থেকে নিচে নেমে হযরত হারূন আলাইহিস সালাম-এর কবর যিয়ারত করলাম। সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারিকে পেছনে রেখে সামনের দিকে তাকালেই একটু দূরে রাস্তার ডান পাশে (মন্যাস্টারির দিকে যাওয়ার সময় বাম পাশে) একটি উঁচু টিলার উপর একটা গির্জা ও তার পাশে হযরত হারূন আলাইহিস সালামের কবর দেখা যায়। কবরটি এমনভাবে বাঁধানো মনে হয় যেন কোন কূপের পাড় গোল করে বাঁধানো হয়েছে।

তবে এটি হযরত হারূন আলাইহিস সালামের কবর তা নিশ্চিত নয়। কেননা হযরত হারূন আলাহিস সালামের কবর আরও দুই জায়গায় থাকার দাবি করা হয়। (১) তার কবর দিয়ার বাকির শহরের এইল (ايبل) এলাকায়। দিয়ার বাকির (ديار بكر/Diyarbakir) তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের একটি বৃহৎ শহর (২) জর্দানের পেট্রা শহরের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের চূড়ায়। 'পেট্রা' (بترا/Petra) জর্দানের রাজধানী আম্মান থেকে ২১৬ কিলোমিটার দক্ষিণে মাআন (معان/Ma'an) প্রদেশের অন্তর্গত একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক শহর। এই শহরটির প্রাচীন নাম ছিল রাকীম, রোমান সাম্রাজ্য যার নাম পরিবর্তন করে নাম রাখে পেট্রা।

তাহলে হযরত হারূন আলাইহিস সালামের কবর কোথায় তা নিয়ে মোট ৩টি মত পাওয়া যাচ্ছে। যথা: সেন্ট ক্যাথরিনে, দিয়ার বাকিরে ও পেট্রায়। আর এই ৩টি মতের কোনটিই শক্তিশালী দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। যদিও উক্ত তিন জায়গার সবখানেই স্থানীয়দের বিশ্বাস হযরত হারূন আলাইহিস সালামের কবর সেখানেই। যেমন আমরা সেন্ট ক্যাথরিনের যেখানে হযরত

হারূন আলাইহিস সালামের কবর সেখানের একজন প্রবীণ লোকের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি খুব জোরালোভাবেই বললেন, আমাদের বাপ-দাদাদের আমল থেকে এই বিশ্বাস চলে আসছে যে, এটা নিশ্চিতই হযরত হারূন আলাইহিস সালামের কবর। والله اعلم

বাম পাশে হযরত হারূন (আ.)-এর কবর (সেন্ট ক্যাথরিন)

হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের কবর যিয়ারত

তারপর একটা টেক্সিযোগে হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের কবরে গেলাম ও তার কবর যিয়ারত করলাম। সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারির কাছ থেকে গাড়ি নিয়ে হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের কবর পর্যন্ত যেতে ১০/১২ মিনিট সময় লাগল। রাস্তার পাশে একটু উঁচু জায়গায় একটা কবরস্থান। এরই উঁচু অংশে হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের কবর। রোডের পাশে সাইনবোর্ডে আরবিতে লেখা আছে مقام النبي صالح।

হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের কবর কোথায় তা নিয়ে এত মত রয়েছে যে, সেগুলোর কোন একটির সঠিক হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা কোনো একটি মতও শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। সেরূপ কয়েকটি মত নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. সেন্ট ক্যাথরিনে।
২. ইয়ামানের হাজরামাউত (حضرموت) শহরে।
৩. ফিলিস্তীনের রামলা (الرملة/Ramla) শহরে। রামলা শহরটি আল-কুদ্স থেকে ৩৮ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে।
৪. ফিলিস্তীনের রামাল্লাহ (رام الله/Ramallah) শহরের কারইয়াতুন্নাবিয়্যি

সালিহ (قرية النبي صالح)-য়ে। রামাল্লাহ জেরুজালেম থেকে ১০ কিলোমিট-ার উত্তরে।
৫. সৌদি আরবের হিজ্‌র (حجر) এলাকায়। হিজ্‌র হচ্ছে সৌদি আরবের মদীনা প্রদেশের একটি এলাকা। মদীনার কেন্দ্র থেকে আল-উলা প্রায় ৩০০ কি. মি. দূরে। আর আল-উলা থেকে হিজ্‌র উত্তর-পূর্বে ২২ কিলো-মিটার দূরত্বে অবস্থিত। হিজ্‌র (২৬.৪৭ উ: ৩৭.৫৩ পূ:)-এর বর্তমান নাম 'মাদাইনে সালেহ' (مدائن صالح)।
৬. ইরাকের নাজাফ শহরে। সেখানে একটি ঘরের মধ্যেই হযরত হূদ ও সালেহ (আ.) উভয়ের কবর রয়েছে বলা হয়। নাজাফ (النجف/Najaf) শহরটি বাগদাদ থেকে ১৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে। নাজাফকে নাজাফ আল-আশরাফ (النجف الأشرف)ও বলা হয়।

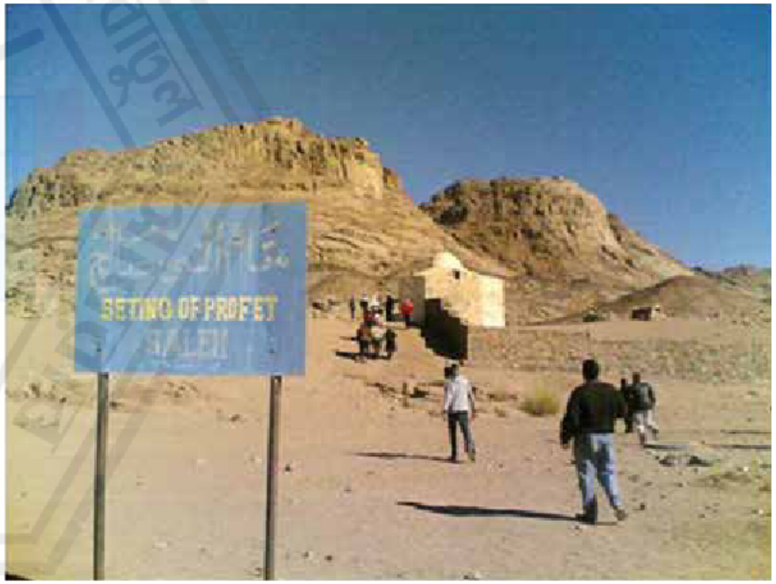

কথিত হযরত সালেহ (আ.)-এর কবর (সেন্ট ক্যাথরিন)

সিনাই এলাকায় যয়তুনের বাগান

সিনাই এলাকায় যয়তুনের উৎপাদন খুব ভাল হয়। কুরআনে কারীমের বর্ণনা থেকেও এটি প্রমাণিত। সূরা তীনে বলা হয়েছে, শপথ আঞ্জীর, যায়তুন ও সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পাহাড়ের। এখানে 'সিনাই প্রান্তরের' কথাটির সাথে যায়তুনের উল্লেখ থেকে অনুমিত হয় সিনাই এলাকার সঙ্গে যায়তুন উৎপাদ-

www.maktabatulabrar.com

নর বিশেষ একটা ব্যাপার রয়েছে। বস্তুত সিনাই এলাকায় যায়তুনের উৎপাদন খুব ভাল হয়। পাহাড় পর্বতের ফাঁকে ফাঁকে যায়তুনের কত সুন্দর বাগান দেখা যায়।

যায়তুন গাছ

সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারির মধ্যে একটি যায়তুনের গাছ

দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে বাস যোগে কায়রো প্রত্যাবর্তন। রাত ৯টায়

www.maktabatulabrar.com

কায়রো পৌঁছই।

উয়ূনে মূসা ও বনী ইসরাঈলের সেই ১২টি ঝর্ণা

উয়ূন (عيون) শব্দটি আরবি عين শব্দের বহুবচন। উয়ূন অর্থ ঝর্ণাসমূহ। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলসহ অলৌকিকভাবে তৈরি হওয়া সামুদ্রিক পথ পাড়ি দিয়ে সিনাই এলাকায় পৌছেন। ঘটনাটি প্রসিদ্ধ। সিনাই এলাকায় থাকার সময় একদা পানির সংকট দেখা দেয়ায় বনী ইসরাঈল হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে পানির জন্য আবেদন জানায়। তিনি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক পাথরে আঘাত করলে পাথর থেকে ১২টি ঝর্ণা বের হয়। বনী ইসরাঈলের ১২ গোত্রের জন্য ছিল ১২টি ঝর্ণনা। এই আঙ্গিকেই এলাকার নাম হয়েছে 'উয়ূনে মূসা'।

কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে–

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

অর্থাৎ, আর (স্মরণ কর,) যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল। তখন আমি বললাম, 'তুমি তোমার লাঠি দ্বারা ঐ পাথরটায় আঘাত কর। (পাথরটায় আঘাত করতেই) তৎক্ষণাত সেখান থেকে সবেগে প্রবাহিত হল ১২টি ঝর্ণা। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান জেনে নিল। (আমি বললাম,) আল্লাহ প্রদত্ত রিযক থেকে খাও, পান কর। আর বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হয়ে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়িও না। (সূরা বাকারা: ৬০)

এ ঘটনাটি তীহ প্রান্তরে ঘটেছিল। বনী ইসরাঈল সেখানে পিপাসার্ত হয়ে পানি চাইল। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নিকট দুআ করলেন। আল্লাহর অপার মহিমায় লাঠির আঘাতে একটি পাথর থেকে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হল। হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর বার পুত্র থেকে বারটি গোত্র বিস্তৃত হয়েছিল। তাই প্রত্যেক গোত্রের জন্য পৃথক ঝর্ণা দেয়া হল। উল্লেখ্য, এখানে فَانْفَجَرَتْ বা সবেগে প্রবাহিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর সূরা আ'রাফে فَانْبَجَسَتْ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ হল অল্প অল্প পানি বের হওয়া। হযরত ইমাম রাযী (রহ.) বলেছেন, হতে পারে প্রয়োজনের মুহূর্তে সবেগে বের হত আর প্রয়োজন ফুরিয়ে এলে অল্প অল্প বের হত। (মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলবী)

সিনাই অঞ্চলের ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ নিয়ে গবেষণা ও তার তাত্ত্বিক প্রচার

প্রসারের লক্ষে গঠিত সংস্থা (البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء)-এর প্রধান ডক্টর আব্দুর রহীম রায়হানসহ সাম্প্রতিক কালের মিসরীয় গবেষকদের অনেকের মতে এই ১২ ঝর্ণা 'উয়ূনে মূসা' এলাকায় অবস্থিত। এলাকাটি সিনাইয়ে অবস্থিত। প্রশাসনিকভাবে এলাকাটি সুয়েজ গভর্ণরেট (محافظة سويس)-এর অধীন। উয়ূনে মূসা এলাকাটি (منطقة عيون موسى) সুয়েজ শহর থেকে পূর্ব দিকে ২৫ কিলোমিটার, শহীদ আহমেদ হাম্‌দী টানেল থেকে ৬০ কিলোমিটার এবং কায়রো থেকে ১৬৫ কিলোমিটার দূরে। টানেল পার হওয়ার পর সুয়েজ উপসাগরের কূল ঘেষে যে রাস্তা দক্ষিণ দিকে রা'স সিদর, শারমুশ শায়খ ইত্যাদি এলাকার দিকে গিয়েছে এই রাস্তায় রা'স সিদ্‌র পর্যন্ত পথের মাঝামাঝিরও আগে দক্ষিণ দিকে যাওয়ার সময় সড়কের ডান দিকে (পশ্চিম দিকে) উয়ূনে মূসা এলাকাটি অবস্থিত। এখানে কয়েকটি ঝর্ণা রয়েছে (মূলত অগভীর কূপ রয়েছে। সম্ভবত পানি উঠতে উঠতে এক সময় কূপের রূপ ধারণ করেছে।), এগুলোকেই কুরআনে উল্লেখিত সেই ঝর্ণা বলা হচ্ছে। পুরো ১২টি ঝর্ণা দেখা যায় না। ৪টি ঝর্ণা দেখা যায়, বাকিগুলো হয়তো কালক্রমে ধুলোবালিতে চাপা পড়েছে। ডক্টর আব্দুর রহীম রায়হান সাহেব তদন্ত সাপেক্ষে নিশ্চিত হয়েছেন যে, এই এলাকাটিই কুরআনে উল্লেখিত সেই ১২টি ঝর্ণার এলাকা। তিনি বলেছেন, কয়েকটি ঝর্ণা হয়তো কালক্রমে ধুলোবালিতে চাপা পড়েছে। খনন করলে সেগুলো বের হবে। নিউ ইয়র্কের কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড সাইন্স-এর ডিন ফিলিপ মেয়ারসন (فيليب مايرسون/Philip Mayerson মৃত ১৩ এপ্রিল ২০১৬) কর্তৃক পরিচালিত এক আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সুয়েজ অঞ্চল থেকে উয়ূনে মূসা অঞ্চল পর্যন্ত এক সময় প্রচণ্ড অনুর্বর ও পানি সংকটের অঞ্চল ছিল। এ গেল কুরআনে উল্লেখিত সেই ১২টি ঝর্ণা কোথায় তা নিয়ে একটি মত।

কুরআনে উল্লেখিত সেই ১২টি ঝর্ণা কোথায় তা নিয়ে আরও একটি মত হল সেগুলো সেন্ট ক্যাথরিন এলাকার একটি পাহাড়ে, যেখানে একটি পাহাড়ের সাথে লাগোয়া বিরাট এক পাথরখণ্ডের গায়ে এখনও অনেকগুলো ফাটল দেখা যায়। ফাটলগুলো স্পষ্ট। পাথরটার মাঝে কিছুটা ভেঙ্গে যাওয়ার পুরো ১২টা ফাটল গণনা করা যায় না, তবে ১২টার অনুমান লাভ করা যায়। নিম্নে তার চিত্র দেখুন।

www.maktabatulabrar.com

কুরআনে উল্লেখিত সেই ১২টি ঝর্ণা কোথায় তা নিয়ে উল্লেখিত উপরোক্ত দুই মতের কোনটিই কুরআনের বক্তব্য ও মুফাসসিরীনে কেরামের বক্তব্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। কেননা কুরআনে ঝর্ণা কিসের থেকে বের হয়েছিল তা ব্যাক্ত করতে গিয়ে الْحَجَرَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা পাথরখণ্ডের অর্থই প্রদান করে (জমিনের অর্থ নয়)। ইরশাদ হয়েছে, اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ (অর্থাৎ, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরখণ্ডে আঘাত কর।) আর মুফাসসিরীনে কেরামের উক্তি থেকে প্রমাণিত যে, একটি নির্দিষ্ট পাথরখণ্ড থেকে ১২টি ঝর্ণা ফুটে বের হয়েছিল এবং সে পাথরখণ্ডটি নিজেদের সঙ্গে বহনযোগ্য ছিল।

এখন দেখুন কেন উপরোক্ত দুই মতের কোনটিই কুরআনের বক্তব্য ও মুফাসসিরীনে কেরামের বক্তব্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। প্রথম মতে অর্থাৎ ড. আব্দুর রহীম রায়হানের বক্তব্যে একটি নির্দিষ্ট পাথরখণ্ড থেকে নয় বরং একটি জমিন বা এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে ১২টি ঝর্ণা বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর একটি এলাকা তো নিজেদের সঙ্গে বহনযোগ্য নয়। আর দ্বিতীয় মতে সেন্ট ক্যাথরিনের যে পাহাড়ে ১২টি ঝর্ণার কথা বলা হয়েছে, সেখানে পাহাড়ের এক বিশাল অংশে ১২টি ঝর্ণা থাকার দাবি করা হয়েছে, যাকে কোনোক্রমেই একটি পাথরখণ্ড বলা যায় না বরং পাহাড়ের অংশ বিধায় পাহাড় বলা যায়। আর পাহাড় বা পাহাড়ের বিশাল অংশ বহনযোগ্যও নয়।

এখন রয়ে গেল মুফাসসিরীনে কেরামের সেসব উক্তি কি যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একটি পাথরে (জমিনে নয়) আঘাত করতে বলা হয়েছিল। এবং সেটি ছিল একটি নির্দিষ্ট পাথরখণ্ড যা থেকে ১২টি ঝর্ণা ফুটে বের

হয়েছিল এবং সে পাথরখণ্ডটি নিজেদের সঙ্গে বহনযোগ্য ছিল। লক্ষ করুন–

তাফসীরে ইবনে আবী হাতিমে বলা হয়েছে,

فَأُمِرَ بِحَجَرٍ أَنْ يَضْرِبَهُ بِعَصَاهُ.

অর্থাৎ, তাকে একটি পাথরে আঘাত করতে বলা হয়েছে।

তাফসীরুন্নাসাফীতে বলা হয়েছে,

واللام للعهد والإشارة إلى حجر معلوم، فقد روي أنه حجر طوري.

অর্থাৎ, الحجر শব্দের ال বর্ণ নির্দিষ্টতা বুঝানোর জন্য এবং নির্দিষ্ট একটি পাথরখণ্ডের দিকে ইশারা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বর্ণিত আছে– সেটি তূর পাহাড়ের একটি পাথর।

আদ্দুররুল মানছূরে বলা হয়েছে,

فأمر بحجر أن يضربه وكان حجرا طورانيا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه.

অর্থাৎ, তাকে একটা পাথরে আঘাত করতে বলা হল। সেটা ছিল তূর পাহাড়ের একটি পাথর, যেটিকে তারা নিজেদের সঙ্গে বহন করত। যখন কোথাও অবতরণ করত মূসা (আ.) তার লাঠি দ্বারা তাতে আঘাত করতেন।

তাফসীরে আবিস সুউদে বলা হয়েছে,

روى انه كان حجرا طوريا ... او كان حجرا اهبطه الله تعالى مع آدم عليه السلام من الجنة ووقع الى شعيب عليه السلام فأعطاه موسى عليه السلام مع العصا او كان هو الحجر الذي فر بثوبه حين وضعه عليه ليغتسل وبراه الله تعالى به عما رموه به من الأدرة فأشار اليه جبريل عليه السلام ان يحمله او كان حجرا من الحجارة وهو الأظهر في الحجة.

অর্থাৎ, বর্ণিত আছে যে, সেটি তূর পাহাড়ের একটি পাথর। ... অথবা সেটি এমন একটি পাথর যা আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.)-এর সঙ্গে জান্নাত থেকে নামিয়েছিলেন। পাথরটি হযরত শুআয়ব (আ.) পর্যন্ত পৌঁছে। তিনি সেটি লাটিসহ মূসা (আ.)কে প্রদান করেন। কিংবা সেটি ছিল ঐ পাথর যা তার কাপড়সহ ভেগেছিল যখন তিনি গোসল করার জন্য সেটির উপর নিজের কাপড় রেখে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা সেই পাথর দ্বারা তাঁর প্রতি লোকেরা অণ্ডকোষ ফোলা থাকার যে দোষ আরোপ করেছিল তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেছিলেন। অতঃপর জিবরাঈল (আ.) তাকে সেই পাথর সঙ্গে বহন করে নেয়ার ইংগিত করেছিলেন। অথবা সেটি ছিল সাধারণ একটি

www.maktabatulabrar.com

পাথর। এটিই দলীলে বেশি স্পষ্ট।

তাফসীরে ইবনে কাছীরে বলা হয়েছে,

وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجيري الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا.

অর্থাৎ, তিনি (মূসা আ.) তোমাদের জন্য বের করেছিলেন সেই পাথর যা তিনি তোমাদের সঙ্গে বহন করতেন আর আমি তা থেকে তোমাদের জন্য ১২টি ঝর্ণা বের করেছিলাম।

তাফসীরে রূহুল মাআনীতে বলা হয়েছে,

وقيل : حجر أخذ من قعر البحر خفيف يشبه رأس الآدمي كان يضعه في مخلاته، فإذا احتاج للماء ضربه.

অর্থাৎ, বলা হয় সেটি ছিল মানুষের মাথার সাইজের হালকা এমন একটি পাথরখণ্ড যা সমুদ্রের গভীর থেকে আহরণ করা হয়েছিল। তিনি সেটি তার থলের মধ্যে রাখতেন, যখন পানির প্রয়োজন হত তাতে আঘাত করতেন।

তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে,

وهو الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل رُخَام أو كَذَّانٌ فضربه.

অর্থাৎ, সেটি ছিল সেই পাথর যা তার কাপড় নিয়ে ভেগেছিল, হালকা, চতুর্কোণ বিশিষ্ট, মানুষের মাথার সাইজের, মার্বেল পাথর বা নরম ধরনের পাথর। তিনি সেটিতে (পানির জন্য) আঘাত করতেন।

উপরোক্ত তাফসীর গ্রন্থগুলো ছাড়াও তাফসীরে বায়জাবী, আইসারুত্তাফাসীর, আল-ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাবিল আযীয, সামারকান্দী-র বাহরুল উলূম প্রভৃতিতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

সারকথা– মুফাসসিরীনে কেরামের উপরোক্ত বক্তব্যসমূহে পাথরটি কোন্ পাথর ছিল তা নিয়ে বিভিন্ন মত দেখা গেলেও সকলের বক্তব্য থেকে একটি বিষয়ে ঐক্যমত বের হয়ে এসেছে, আর তা হল যেখান থেকে ঝর্ণা বের হয়েছিল তা ছিল একটি পাথরখণ্ড, কোন বিস্তৃত জমিন বা পাহাড় নয়[১]। অতএব উয়ূনে মূসা এলাকা বা সেন্ট ক্যাথরিন এলাকার পাহাড়কে ১২টি

১. একমাত্র হুসাইন আয-যাহাবী 'আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরীন' গ্রন্থে বলেছেন, الحجر কোন স্থানের নাম পানির জন্য যে স্থানে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। জুমহুর মুফাসসিরের বিপরীতে হুসাইন যাহাবীর একার কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তিনি তার এ উক্তির পক্ষে কোন দলীলও পেশ করেননি। الحجر কোন স্থানের নাম তাও উল্লেখ করেননি।

ঝর্ণার স্থান বলা এই ঐক্যমত বিরোধী। তদুপরি কুরআনে ঝর্ণা কিসের থেকে

বের হয়েছিল তা ব্যাক্ত করতে গিয়ে যে الْحَجَرُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তারও বিরোধী। والله اعلم بالصواب

লুকসুরে যা কিছু দেখার রয়েছে

লুকসুর (لقصر/Loxur) মিসরের একটি গভর্ণরেট। একে উকসুর (أقصر)ও বলা হয়, আবার আরবিতে মা'রিফা (معرفه) প্রয়োগে আল-উকসুর (الأقصر)ও লেখা হয়। এ অঞ্চলটি মিসরের রাজধানী কায়রো (قاهره) থেকে ৬৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং আসওয়ান (أسوان) গভর্ণরেট থেকে ২২০ কিলোমিটার উত্তরে নীল নদের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এই লুকসুরে বেশ কিছু দেখার রয়েছে। যেমন:

- মা'বাদুল কারনাক (معبد الكرنك/Karnak Temple Complex)

এটিকে الكرنك (কারনাক) বা مجمع معابد الكرنك ও বলা হয়। এটিকে ফারাওদের যুগের মিসরের সর্ববৃহৎ ট্যাম্পল কমপ্লেক্স গণ্য করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে কয়েকটি উপাশনালয়, স্থাপনা ও স্তম্ভ। একটা উপাশনালয়ের ছাদের নিচে প্রচুর প্রাচীন যুগের নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। কমপ্লেক্সটি বানানো হয়েছে আমুন দেবতা (آمون), তার স্ত্রী মূত দেবতা (موت) ও তাদের পুত্র খোনসু (Khonsu/خونسو)-এর উপাশনার জন্য। কমপ্লেক্সের আওতায় প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন উপাশনালয় রয়েছে। কমপ্লেক্সটি লুকসুরের নীল নদের পূর্বতীরে অবস্থিত।

মা'বাদুল কারনাক

- ওয়াদিল মুলূক (وادي الملوك/Valley of the Kings)

ওয়াদিল মুলূক (وادي الملوك) অর্থ রাজাদের উপত্যকা। ওয়াদিল মুলূক লুকসুরের মুখোমুখি নীল নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি এলাকা। এখানে প্রাচীন মিসরীয়রা কীভাবে রাজরাজড়াদেরকে পরকালের জন্য প্রস্তুত করে কবর দিত সেরকম কবরের নমুনা দেখা যায়। এখানে প্রাচীন যুগের এরকম ১২০টি কবর রয়েছে। কবরগুলো ফেরআউনী সম্রাট ও রাজপরিবারের লোকদের জন্য যে স্টাইলে কবর বানানো হত সেই স্টাইলের। বস্তুত ওয়াদিল মুলূক রাজাদের কবরের রাজ্য।

ওয়াদিল মুলূক

- ওয়াদিল মালিকাত (وادي الملكات/ Valley of the Queens)

ওয়াদিল মুলূক-এর পাশে ওয়াদিল মালিকাত। ওয়াদি (□□□□) অর্থ উপত্যকা, আর মালিকাত (الملكات) অর্থ রাণীগণ। অতএব ওয়াদিল মালিকাত (وادي الملكات) অর্থ রাণীদের উপত্যকা অর্থাৎ রাণীদের কবরের উপত্যকা। এখানে রাজরাণীদের বা রাজা-রাণীদের ঘটিষ্ট নারীদেরকে কীভাবে কবর দেয়া হত এরকম কবরের নমুনা রয়েছে। এখানে র‍্যামেসিস-২ এর সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সুন্দরী স্ত্রী নেফেরতারি (نفرتاري/ Nefer-tari)-এর কবর রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

ওয়াদিল মালিকাত

- মা'বাদু হাবূ (معبد هابو/Medinet Habu)

'মা'বাদু হাবূ' অর্থ হাবু-র উপাশনালয়। হাবূ লুকসুরের একটি শহর। শহরটি লুকসুরের পশ্চিম প্রান্তে। ফেরআউন র‍্যামেসিস-৩ আমূন দেবতার সম্মানে এই উপাশনালয়টি নির্মাণ করেছিল। একে র‍্যামেসিস-৩ এর উপাশনালয় (معبد رمسيس الثالث)ও বলা হয়। উপাশনালয়টির আরও কয়েকটি নাম রয়েছে।

মা'বাদু হাবূ

- মা'বাদু হাতশেপসুত (معبد حتشبسوت/Temple of Hatshepsut)

www.maktabatulabrar.com

এ উপাশনালয়টি প্রাচীন মিসরের অষ্টাদশ রাজবংশের আমলে নির্মিত। ৩ তলা বিশিষ্ট এ উপাশনালয়টি প্রাচীন মিসরের সবচেয়ে বড় ও প্রসিদ্ধ উপাশনালয়। ৩৫০০ বছর পূর্বে রাণী হাতশেপসুত এটি নির্মাণ করেছিলেন। উপাশনালয়টি লুকসুরের নীল নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

মা'বাদু হাতশেপসুত

- মা'বাদুল উকসুর (معبد الأقصر/Luxor Temple)

মা'বাদুল উকসুর অর্থ উকসুর-এর উপাশনালয়। এটি আমূন দেবতা ও তার পরিবারের সদস্যদের সম্মানে নির্মিত একটি উপাশনালয়। প্রাচীন যুগের মিসরীয় ১৮ ও ১৯তম রাজবংশের শাসনামলে এটি নির্মিত।

মা'বাদুল উকসুর

- মাতহাফুল উকসুর (متحف الأقصر/ Luxor Museum)

মাতহাফুল উকসুর অর্থ উকসুরের জাদুঘর (লুকসুরের জাদুঘর)। এ জাদুঘরে ৪ হাজার বছর আগের ফেরআউনী যুগ থেকে শুরু করে ইসলামী যুগ পর্যন্ত অনেক সময়ের অনেক সংগ্রহ রয়েছে। জাদুঘরটি উকসুর শহরের কেন্দ্রে নীল নদের কার্ণিসে অবস্থিত। ১৯৭৫ সালে মিসরীয় নেতা আনওয়ার সাদাত এটি উদ্বোধন করেছিলেন।

মাতহাফুল উকসুর

উপরোক্ত স্থান ও বিষয়াবলি ছাড়াও লুকসুরে আধুনিক যুগের পার্ক ইত্যাদি অনেক কিছু দেখার রয়েছে, যেগুলোর সঙ্গে ইতিহাস ঐতিহ্যের কোনই সম্পর্ক নেই।

আসওয়ানে যা কিছু দেখার রয়েছে

আসওয়ান (أسوان/Aswan) পূর্বে বর্ণিত লুকসুর থেকে ২২০ কিলোমিটার এবং রাজধানী কায়রো থেকে ৭৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে নীল নদের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি গভর্ণরেট বা গভর্ণর শাসিত অঞ্চল। এই আসওয়ানে বেশ কিছু দেখার রয়েছে। যেমন:

- মাতহাফুন্ নূবা (متحف النوبة/Nubian Museum)

এটি আসওয়ানের ইউনেস্কো এলাকার একটি জাদুঘর। এ জাদুঘরে প্রাচীর মিসরীয়দের বিশেষত প্রাচীন নূবীদের নিদর্শনাদি রয়েছে। 'নূবী' বলা হয় নূবা বা নূবিয়া এলাকার অধিবাসীদের। নূবা বা নূবিয়া (النوبة/Nubia) ছিল এক সময়ে দক্ষিণ মিসরের আসওয়ান ও সুদানের খার্তূম-এর মধ্যবর্তী এলাকার নাম।

www.maktabatulabrar.com

মাতহাফুন্ নূবা

- জাযীরাতু ইলেফ্যান্টিন (جزيرة الفنتين/Elephantine Island) ও মা'বাদুল আসওয়ান

জাযীরাতু ইলেফ্যান্টিন অর্থ ইলেফ্যান্টিন দ্বীপ। এটি আসওয়ানের নীল নদের একটি দ্বীপ এবং আসওয়ান কেন্দ্রীয় শহরের একটি অংশ। এখানে প্রাচীন যুগের অনেক উপাশনালয় (معبد) বিশেষত আসওয়ানের প্রসিদ্ধ উপাশনালয় মা'বাদুল আসওয়ান (معبد الأسوان) রয়েছে। এখানে অনেকে নীল নদের পানি প্রবাহ ও পানির পরিমাণ পরিমাপ করার প্রতিষ্ঠান মিক্বইয়াসুন্নীল (مقياس النيل)ও দর্শন করে থাকে।

জাযীরাতু ইলেফ্যান্টিন

- মাতহাফু আসওয়ান (متحف أسوان/ Aswan Museum)

মাতহাফু আসওয়ান বা আসওয়ানের জাদুঘর। এটি পূর্বের পরিচ্ছেদে উল্লেখিত ইলেফ্যান্টিন দ্বীপে অবস্থিত। এতে ইলেফ্যান্টিন দ্বীপের কিছু প্রাচীন নিদর্শন ও নূবীদের কিছু প্রাচীন নিদর্শন রয়েছে। নূবী কাদেরকে বলা হয় তার পরিচয় এক পরিচ্ছেদ পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

মাতহাফুল আসওয়ান

- দরীহুল আগাখান (ضريح الآغاخان/Mausoleum of Aga Khan)

দরীহুল আগাখান অর্থ আগাখানের সমাধি। এই আগাখান হচ্ছে আগাখান-৩ সুলতান মুহাম্মাদ শাহ (মৃত: ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দ)। শিয়াদের ইসমাঈলীয়া গ্রুপের মধ্যে নিজারী গোত্র হচ্ছে সর্ববৃহৎ গোত্র। 'আগাখান' হচ্ছে এই গোত্রের ইমামদের একটি বংশগত উপাধী। আলোচ্য আগাখান এই নিজারী গোত্রেরই ৪৮তম ইমাম ছিলেন। নীল নদের পশ্চিম পাশে এই সমাধি অবস্থিত। সুলতান নিজের জীবনেই সমাধিটি বানিয়েছিলেন। বানিয়েছিলেন প্রাচীন ফাতিমী যুগের স্টাইলে।

দরীহুল আগাখান

- মসজিদুত্ ত্বাবিয়া (مسجد الطابية/El Tabia Mosque)

www.maktabatulabrar.com

মসজিদটি আসওয়ানের সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ। মসজিদটি একটি উঁচু টিলার উপর নির্মিত। চতুর্দিকে সুন্দর গাছপালা দ্বারা বেষ্টিত, যার মধ্যে দুষ্প্রাপ্য গাছপালাও রয়েছে। মসজিদের ভেতরে ও বাইরে মামলূক যুগের স্টাইলে ডিজাইন ও নকশা রয়েছে।

মাসজিদুত্ ত্বাবিয়া

- মা'বাদু কোম ওমবু (معبد كوم امبو/Temple of Kom Ombo)

মা'বাদু কোম ওমবু হচ্ছে আসওয়ানের কোম ওমবু শহরের একটি প্রাচীন উপাশনালয়। টলেমি-৬ ফিলোমেটর (فيلومترو/Philometor)-এর যুগে এটি বানানো হয়েছিল। পরে রোমান শাসনামলে কিছু সংযোজন সাধন পূর্বক সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়। উপাশনালয়টি বানানো হয়েছিল প্রাচীন মিসরীয়দের সোবেক (سوبيك/Sobek) ও হোরুস (حورس/Horus) নামক দেবতাদের উপাশনার জন্য। কোম ওমবু আসওয়ান কেন্দ্রীয় শহর থেকে ৯৭ কিলোমিটার উত্তরে।

মা'বাদু কোম ওমবু

- হযরত ইউসুফ (আ.)-এর খাদ্যগুদাম

আসওয়ানের ইদফু শহরের ২০ কিলোমিটার উত্তরে ইটের তৈরি কিছু স্থাপনা দেখা যায়, যেগুলোর ব্যাপারে অনেকে বলে যে, দুর্ভিক্ষের সময় বণ্টনের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণের জন্য হযরত ইউসুফ (আ.) এখানেই খাদ্যশস্য মজুদ রেখেছিলেন। তবে এটি দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। ইদফু অঞ্চলটি আসওয়ান কেন্দ্রীয় শহর ও ইছনা (إسنا/Esna)-র মধ্যবর্তী নীল নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

উপরোক্ত স্থান ও বিষয়াবলি ছাড়াও আসওয়ানে আধুনিক যুগের অনেক কিছু দেখার রয়েছে, যেগুলোর সঙ্গে ইতিহাস ঐতিহ্যের কোনই সম্পর্ক নেই বা তেমন উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক নেই।

২৫/৪/২০১৯ বৃহস্পতিবার

দেশে প্রত্যাবর্তন

২৫/৪/২০১৯ বৃহস্পতিবার সকাল ৯ : ৩০ মিনিটে সাউদিয়া এয়ার-লাইন্স যোগে কায়রো থেকে রওয়ানা এবং জেদ্দায় ৩ ঘণ্টা ট্রানজিট হয়ে ২৬/৪/২০১৯ তারিখ শুক্রবার রাত ১ : ৩০ মিনিটে ঢাকায় পৌছা হয়। সমাপ্ত হয় মিসরের সফর।

এ গ্রন্থে যতগুলো জায়গার নাম উল্লেখিত হয়েছে তার তালিকা

www.maktabatulabrar.com

জায়গার নাম	পৃষ্ঠা	জায়গার নাম	পৃষ্ঠা
মিসর	১৩	ইজিপ্ট	১৮
ইজিপতুস	১৮	ইজিত্তু	১৯
হাদইয়াতুন্ নীল	১৮	কেমিত	১৭
লুকসুর	৩৫, ১৭৬	মিলামবুদিস	১৭
আসওয়ান	২১১	মিতযারাইম	১৭
কায়রো	১৩	সাইনা	১৭৮
আল-আরদাইন	১৮	তূরে সাইনা	১৭৮
বাংকাইন	১৮	আলেকজান্দ্রিয়া	১৪৩
গীযা	১৩৪	মারসা আলাম	১৬৪
সাক্‌র কুরাইশ	২২, ২৫	জাবালুল মুকাত্তাম	২৫
হাইয়াল কানাদি	২২	কেল্লা সালাহ উদ্দীন	৫৯
জায়গার নাম	**পৃষ্ঠা**	**জায়গার নাম**	**পৃষ্ঠা**
ক্বারাফা	৩১	আস-সাইয়্যিদা আয়েশা এলাকা	৬২
ক্বারাফাতুশ শাফিয়ী	৩১	মানশিয়াতুন নাসির	৩১
ফুছতাত	৩৫	আভারিস	৩৫
মেনেফ	৩৫	পি র‍্যামেসিস	৩৬
তুন্‌সী এলাকা	১২৪	রাক্কা	২০৮
এহ্‌নাসিয়া	৩৫	বের-র‍্যামেসিস	৩৬
লিশ্‌ত	৩৫	আশ-শারকিয়্যাহ	৩৬
তেল্লুদ দাবআ	৩৫	তানিস	৩৬
তেল্লুর রোবা’	৩৫	সান আল-হাগার	৩৬
মেনদেস	৩৫	আল-মানসুরা	৩৬
সেবেন্নিতোস	৩৬	মেন নেফের	৩৫
মেমফিস	৩৫	মিত রাহিনা	৩৫
বেনি সুয়েফ	৩৫	বাসাতীন	২৫
আল-আইয়াত	৩৫	তাইবা	৩৫
আল-মিন্‌ইয়া	৩৫	আসকালান	৪০
হেরাক্লিয়োপোলিস	৩৫	গাযা	৪০
ব্যবিলন দুর্গ	১০২	আল-কালইয়ুবিয়্যাহ	৫৪
মার গিরগিস	১০২	আল-গারবিয়্যা	৩৬
আল-কাতায়ে’	৩৭	কাবেস	৪৯
কিলআতুল কাব্‌শ	৩৭	ক্বলক্বাশানদাহ	৫৪
তাহরীর স্কয়ার	৬৪	তাঞ্জানিয়া	৭৭
সুদান	৭৭	কঙ্গো	৭৭
দক্ষিণ সুদান	৭৭	রুয়ান্ডা	৭৭
ইথিওপিয়া	৭৭	কেনিয়া	৭৭
উগান্ডা	৭৭	বুরুন্ডি	৭৭
শ্বেত নীল নদ	৭৭	খার্তুম	৭৭
নীলাভ নীল নদ	৭৭	রিপন জলপ্রপাত	৭৭
ভিক্টোরিয়া হ্রদ	৭৭	কাগেরিয়া নদী	৭৮
তানা হ্রদ	৭৭	গেযিরা আইসল্যান্ড	৮০
হুসায়ন এলাকা	৮৩	ফেজ	৮৪
আইনতাব	৯০	মানইয়াল আর-রওযা	৯৮
জায়গার নাম	**পৃষ্ঠা**	**জায়গার নাম**	**পৃষ্ঠা**
আলেপ্পো	৯০	জাযীরাতুর রওযা	৯৮

মানশিয়াতুল বাক্কারী	৯৬	কাসরুশ শামা’	১০২
বাবুল ওয়াযীর	১০৭	বূশহর	১০৭
আল-কুদস	১০৯	রোদবার	১০৭
তূরে যাইতা	১০৯	মদীনাতু নাস্র	১০৯
বুরায়দা	১১০	ত্বহা	১১৬
হায়েল	১১০	বাবুল ক্বারাফা	১১৮
ফায়দ	১১০	আসয়ূত	১১৯
আল-গামালিয়া	১২৭	আস-সাইয়্যেদা যয়নাব এলাকা	১২৮
আল-বাদরাশীন	১৩০	সাক্কারাহ	১৩০
হেলওয়ান	১৩০	বাবেল	১৫৭
খুজিস্তান	১৫৭	আহওয়াজ	১৫৭
তুছতার	১৫৭	শুশ	১৫৭
শুশতার	১৫৭	হাইয়্যূল লাব্বান	১৬১
নূবা/নূবিয়া	১৬০	রা’সুত্তীন	১৭০
হিযনাহ	১৬১	আল-বাহরুল আহমার	১৬৪
আল-বাহা	১৬১	ওয়াদি হুমাইছারাহ	১৬৪
বালজুরাশি	১৬১	মারসা আলাম	১৬৪
কূমুশ-শূকাফা	১৬৯	কোম্ ওসিম	১৭৬
আল-ফাইয়ূম	১৭১	হাবূ	২০৯
বুহায়রা কারূন	১৭১	ইদফূ	১৭৬
বিরকাতু কারূন	১৭১	ইছনা	১৭৬
ক্বারইয়াতু ইউসুফ আস-সিদ্দীক	১৭৬	আশ-শারকিয়্যাহ মুহাফাজা	১৭৭
ওয়াদি তুমীলাত	১৭৭	আল-ইসমাঈলিয়্যা মুহাফাজা	১৭৭
যাগাযীগ	১৭৭	আল-মার্জ	১৭৭
জুশান বা জাসান	১৭৭	আইন শামস	১৭৭
আল-মাতারিয়্যা	১৭৭	আরব আল-হিস্ন	১৭৭
হেলিওপলিস	১৭৭	তাল্লুল হিস্ন	১৭৭
শারম আশ-শায়খ	১৮০	দাহাব	১৮০
রা’স সিদ্‌র	১৮০	ভূমধ্য সাগর	১৬৬
আবূ যেনীমা	১৮০	বাহরুর রূম	১৬৬
জায়গার নাম	**পৃষ্ঠা**	**জায়গার নাম**	**পৃষ্ঠা**
রা’স আবূ রুদীস	১৮০	ভূমধ্য সাগর	১৬৬

www.maktabatulabrar.com

রা’স মাতারমা	১৮০	আল-বাহরুল আহমার গভর্ণরেট	১৮৬
আকাবা উপসাগর	১৮৭	রা’স গারেব	১৮৬
সুয়েজ উপসাগর	১৮৩	আইলা	১৮৭
সেন্ট ক্যাথরিন	১৮৮	আকাবা	১৮৭
তুওয়া উপত্যকা	১৯০	দিয়ার বাকির	১৯৮
মাআন	১৯৮	পেট্রা	১৯৮
হাজরামাউত	১৯৮	রামলা	১৯৮
হিজ্‌র	২০০	রামাল্লা	১৯৯
আল-উলা	২০০	নাজাফ	২০০
মাদায়েনে সালেহ	২০০	নাজাফ আল-আশরাফ	২০০
উয়ূনে মূসা	২০২	ওয়াদিল মুলূক	২০৮
ইলেফ্যান্টিন দ্বীপ	২১২	ওয়াদিল মালিকাত	২০৮

পাঠকের পাতা

www.maktabatulabrar.com

মাকতাবাতুল আবরার কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিবেশিত
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

■ আহকামে যিন্দেগী
জীবনের সব রকমের বিধি-বিধান সম্বলিত একখানি অনবদ্য গ্রন্থ। একজন মুসলমানের ইসলামী যিন্দেগী পরিচালনার জন্য যত ধরনের বিষয় জানা একান্ত আবশ্যক, সংক্ষেপে সে সবকিছু এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ৩৩০/=

■ ফাযায়েলে যিন্দেগী
নির্ভরযোগ্য হাদীছ ও কুরআনের আলোকে রচিত জীবনের সব বিষয়ের ফাযায়েল সম্বলিত। ঘরে মসজিদে ও মজলিসে তালীমের উপযোগী। ফাযায়েল অধ্যায়ে গ্রহণযোগ্য নয় এমন কোন হাদীছ এ গ্রন্থে আনা হয়নি।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ৩৮০/=

■ ফিক্হুন নিছা
নারী জীবনের ব্যাপক বিধি-বিধান জানার জন্য। নারীদের সিলেবাস রূপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য। বিশেষ বিশেষ মাসআলার দলীল জানার জন্য। এবং মীরাছ, পর্দা, বহুবিবাহ, তারাবীহ কয় রাকআত ইত্যাদি যেসব বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনা রয়েছে, সেগুলোর দলীল ও যুক্তিভিত্তিক জবাব জানার জন্য।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ৩৮০/=

■ বয়ান ও খুতবা ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড
এ গ্রন্থে একজন ইমামের জন্য সারা বৎসর নিয়মিত বিষয়াদিসহ ইসলামের যাবতীয় বিষয় নিয়ে বয়ান করার মত সব ধরনের বয়ান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটা বয়ানের সাথে রয়েছে এক একটি আরবী খুতবা, যেটি পাঠ করা যেতে পারবে। ওয়ায়েজ ও মুবাল্লিগগণও এ গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নিতে পারবেন।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: (প্রতি খণ্ড) ৪৩০/=

■ আহকামে হজ্জ
এ গ্রন্থে সব প্রকার হজ্জ এবং উমরা ও যিয়ারতের মাসায়েল বর্তমান যুগের পেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে। হজ্জ ও যিয়ারত সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহের মানচিত্র এবং ছবিও সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ১৪০/=

www.maktabatulabrar.com

■ ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ
এ গ্রন্থে ইসলামের যাবতীয় সহীহ আকীদা এবং এ সব আকীদা থেকে বিচ্যুত বিভিন্ন বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে। দেশী বিদেশী, নতুন পুরাতন সব ধরনের ভ্রান্ত দল ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ৫০০/=

■ ইসলামী মনোবিজ্ঞান
এ গ্রন্থেই সর্বপ্রথম ইসলামী মনোবিজ্ঞানকে শাস্ত্র আকারে রূপ দেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে ইসলামী বিধি-বিধান ও নীতিমালার মনোবৈজ্ঞানিক কার্যকারিতা এবং ইসলামে মনোবিজ্ঞানের অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনা ও বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ২৪০/=

■ কথা সত্য মতলব খারাপ
রম্য রচনায় উগ্র আধুনিকতা এবং সুন্দর সুন্দর কথার মাধ্যমে বদ মতলব সিদ্ধি করা ও প্রতারণা করার অপপ্রয়াসের সমালোচনা।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ৯০/=

■ কুরআন হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের মানচিত্র
এক পৃষ্ঠার এ মানচিত্রে কুরআন হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসে বর্ণিত স্থানসমূহের বর্তমান অবস্থান ও বর্তমান নাম উলেখসহ সংশিষ্ট স্থানসমূহের প্রাচীন সীমানা ও বর্তমান সীমানা চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

প্রস্তুত: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ৭০/=

■ চশমার আয়না যেমন
পৃথিবীতে মতবাদের শেষ নেই। মত মতান্তরের অন্ত নেই। এই মত বিভিন্নতা বা মতবিরোধের মূলে রয়েছে কে কোন্ বিষয়কে কোন্ অ্যাঙ্গেলে দেখছেন, কে কোন্ বিষয়কে কোন্ দৃষ্টিভংগিতে বিচার করছেন সেটা। যার চশমার আয়না যেমন, তিনি সব কিছুকে দেখছেন তেমন। এ বিষয়টার উপরই একটি রম্য রচনার প্রয়াস হল "চশমার আয়না যেমন"।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ১৩০/=

■ **ভাষা ও সাহিত্য প্রশিক্ষণ**

এতে লেখালেখির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের বিষয়ের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। মৌলিক রচনার নিয়ম-নীতি ও অনুবাদের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে দিক নির্দেশনামূলক বিশদ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে এতে। বর্ণের নাম ও উচ্চারণ থেকে শুরু করে ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য সমালোচনা, কবিতা ও ছড়া রচনার নিয়ম-নীতি, সংবাদ, কলাম ও ফিচার লেখা এবং বাংলা ভাষার অলংকার ইত্যাদি সব বিষয়ের আলোচনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। বহুল ব্যবহৃত শব্দাবলীর উচ্চারণ সম্পর্কিত একটি তালিকাও সংযুক্ত করা হয়েছে। আর শেষে রয়েছে ভাষা ও সাহিত্য শিখতে আগ্রহী-দের জন্য এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক সিলেবাস।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
মূল্য: ২৪০/=

■ **যদি জীবন গড়তে চান**

শিশু-কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধ সকলের জীবন গড়ার পদ্ধতি। সুখী-সমৃদ্ধ, টেনশনমুক্ত, নিরাপদ, বরকতময় ও নূরানী জীবন গড়ার পদ্ধতি। সব বিষয়ে বিস্তারিত ও তথ্যভিত্তিক আলোচনায় সমৃদ্ধ, সকল বয়সের সবশ্রেণীর লোকদের জন্য প্রয়োজনীয় এক অনবদ্ধ গ্রন্থ।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
মূল্য: ২৯০/=

■ **তাফসীরে বুরহানুল কুরআন (১-৪ খণ্ড, পূর্ণ সেট)**

বৈশিষ্ট্যাবলি : ● তাহকীকী তরজমা। ● তরজমার বৈশিষ্ট্য বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় টীকা। ● প্রয়োজনীয় শানে নুযুল ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির উল্লেখ। ● প্রতি আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সংক্ষেপে নম্বরবদ্ধ করে উল্লেখ।

লেখক: বিশিষ্ট কয়েকজন আলেম কর্তৃক রচিত ও মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য : ১৩০০/=

■ **চার ইমাম**

ফিকহের চার ইমাম– ইমাম আবূ হানীফা রহ. ইমাম মালেক রহ, ইমাম শাফিঈ রহ. ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.–এর প্রামাণ্য জীবন কথা। লেখক দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হিন্দ একাডেমির তত্ত্বাবধায়ক মাওলানা কাজি আতহার মুবারক-পুরি রহ.। গ্রন্থটির প্রতিটি তথ্য নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স সমৃদ্ধ।

অনুবাদক: মাওলানা খন্দকার মনসুর আহমদ ও অন্যান্য।
সম্পাদনায়: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
মূল্য: ২৪০/=

www.maktabatulabrar.com

□ **الاستفادة بشرح سنن ابن ماجة**

এটি সুনানে ইবনে মাজা-র এক অনন্য শরাহ। আরবীতে রচিত এ শরাহর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

١. بيان من أخرج الحديث مسندًا غير ابن ماجة.
٢. كلام موجز حول أحوال الحديث ورواته.
٣. شرح المفردات.
٤. الشرح الإجمالي للحديث ليقرب معنى الحديث وغرضه إلى الأذهان.
٥. بيان المباحث المتعلقة بالحديث على المنهج التدريسي.
٦. بيان ما يستفاد من الحديث موجزًا.
٧. بيان مطابقة الحديث للترجمة.

গ্রন্থনায়: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
মূল্য: ১০০০/=

■ **চিন্তা- চেতনার ভুল**

এ গ্রন্থে মৌলিকভাবে জানা যাবে–

" চিন্তা-চেতনা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিষয়াদি।
" চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার গুরুত্ব।
" চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার উপায়।
" চিন্তা-চেতনার মৌলিক গলদসমূহ।
" চিন্তা-চেতনার ভুল কীভাবে মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায় তার বিবরণ।
" ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তথা জীবনের সব দিকে কি কি ভুল চিন্তা-চেতনা বিরাজ করছে তার বিবরণ।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
মূল্য: ২০০/=

■ **নফস ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা**

নফসের যত ধরনের ওয়াছওয়াছা হয়, মনের মধ্যে ঈমান ও ইসলাম সম্বন্ধে এবং ইসলামের বিভিন্ন আমল ও আখলাক সম্বন্ধে যত ধরনের কূট প্রশ্ন ও ওয়াছওয়াছা জাগে এ গ্রন্থে সেসব ওয়াছওয়াছা থেকে উত্তরণের কৌশল এবং সেসব প্রশ্নের প্রশান্তিমূলক জবাব শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
মূল্য: ২০০/=

বিশেষ নোট

১. উপরোল্লিখিত পুস্তকাদি ছাড়াও "মাকতাবাতুল আবরার" য়ে পাবেন 'মজলিসে দাওয়াতুল হক' ও 'মজলিসে ইলমী' যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসা কর্তৃক প্রকাশিত যাবতীয় বই-পুস্তক।

২. মাকতাবাতুল আবরার প্রকাশিত ও পরিবেশিত যাবতীয় বই-পুস্তক সমমূল্যে "আল-কুরআন পাবলিকেশন্স" (কিতাব মার্কেট, যাত্রাবাড়ি বড় মাদ্রাসা সংলগ্ন) থেকেও সংগ্রহ করা যায়।